প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৫৬

প্রকাশক
শিলাদিত্য সিংহরায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১২বি, সি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপন
লোকনাথ গ্রাফিক্স
৪২ বিডন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
বিনায়করাও মসোজী

অলঙ্করণ
গৌতম নন্দী

প্রুফ সংশোধন
রঞ্জন সরকার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেশন হাউস
সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা

ফর্মা মুদ্রণ
আশুতোষ লিথোগ্রাফিক্স
ছিদামমুদী লেন
কলকাতা

উপদেষ্টা
রবি দত্ত

জিন্নতবাসিনী জাহান-আরার স্মরণে

ঋণ স্বীকার

শান্তিনিকেতন কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষ বন্ধুবর বিনায়কবাও মসোজী প্রীতি ও বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটখানি এঁকে দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রেখেছেন।

অনুজপ্রতিম শ্রীমান কানাই সরকার এই পুস্তকের লিখন মুদ্রণ এবং প্রকাশক নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। এই পুস্তকের যে নিন্দা হবে সেটি নিরঙ্কুশ তাঁরই প্রাপ্য।

পুস্তকের শেষের কবিতাটি উদ্ধৃত করবার অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

পরিশেষে নিউ এজ পাবলিশার্সের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

গ্রন্থকার

দেশে বিদেশে

এক

চাঁদনী থেকে ন'সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালীর জন্য ইয়োরোপীয়ন থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত।

হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গি হেঁকে বলল, 'এটা ইয়োরোপীয়নদের জন্য।'

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, 'ইয়োরোপীয়ন তো কেউ নেই, চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।'

এক তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, 'বাঙলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরিজি শব্দের প্রাগ্দেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবী ইংরিজি হয়।' অর্থাৎ পয়লা সিলেব্‌লে অ্যাকসেন্ট দেওয়া খারাপ রান্নায় লঙ্কা ঠেসে দেওয়ার মত— সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাঙলায় এরি নাম গাঁক গাঁক করে ইংরিজি বলা। ফিরিঙ্গি তালতলার নেটিব, কাজেই আমার ইংরিজি শুনে ভারি খুশী হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল। কুলিকে ধমক দেবার ভার ওরি কাঁধে ছেড়ে দিলুম। ওদের বাপখুড়ো মাসীপিসী রেলে কাজ করে—কুলি শায়েস্তায় ওরা ওয়াকিফহাল।

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চুবসে আসছিল। এতদিন পাসপোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলুম, অন্য কিছু ভাববার ফুরসৎ পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হল সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনোচিত— মনে হল, আমি একা।

ফিরিঙ্গিটি লোক ভাল। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, 'এত মনমরা হলে কেন? গোয়িঙ ফার?'

দেখলুম বিলিতি কায়দা জানে। 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ' বলল না। আমি যেটুকু বিলিতি ভদ্রস্থতা শিখেছি তার চোদ্দ আনা এক পাদরী সায়েবের কাছ থেকে। সায়েব বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, 'গোয়িঙ ফার' বললে বাধে না, কারণ উত্তর দেবার ইচ্ছা না থাকলে 'ইয়েস' 'নো' যা খুশি বলতে পার— দুটোর যে কোনো একটাতেই উত্তর দেওয়া হয়ে যায়, আর ইচ্ছে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ' যেন ইলিসিয়াম রো'র প্রশ্ন—ফাঁকি দেবার জো নেই। তাই তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারি আরম্ভ হল। তাতে লাভও হল। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকাণ্ড এক চুবড়ি খুলে বলল, তার 'ফিয়াঁসে' নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরি করে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরোদস্তুর পল্টন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে আমিও কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিব বস্তু, হয়ত বড্ড বেশি ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হল সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন করে আ-লা-কার্ত ভোজন, যার যা খুশি খাবে।

সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল আমার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জমে যেতে লাগল। সেই শিককাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-গোস্ত। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে। এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরতে লাগল। এমন কি শিককাবাবের জায়গায় শামীকাবাব নয়, আলু-গোস্তের বদলে কপি-গোস্ত পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, 'ব্রাদার, আমার ফিয়াঁসে নেই, এসব জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে কেনা।'

একদম হুবহু একই স্বাদ। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমারও আবছা

আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গাব্দাগোব্দা ফিরিঙ্গি মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই কিনতে দেখেছি। ফিরিঙ্গিকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফির্যাসের একটা বর্ণনা দিতে, কিন্তু থেমে গেলুম। কি আর হবে বেচারীর সন্দেহ বাড়িয়ে—তার উপর দেখি বোতল থেকে কড়া গন্ধের কি একটা ঢকঢক করে মাঝে মাঝে গিলছে। বলা তো যায় না, ফিরিঙ্গির বাচ্চা—কখন রঙ বদলায়।

রাত ঘনিয়ে এল। ক্ষিদে ছিল না বলে পেট ভরে খাইনি, তাই ঘুম পাচ্ছিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি কাকজ্যোৎস্না। তবুও পষ্ট চোখে পড়ে এ বাঙলাদেশ নয়। সুপারি গাছ নেই, আম জামে ঘেরা ঠাসবুনুনির গ্রাম নেই, আছে শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া ঘরবাড়ি এখানে সেখানে। উঁচু পাড়িওয়ালা ইদারা থেকে তখনো জল তোলা চলছে—পুকুরের সন্ধান নেই। বাঙলাদেশের সোঁদা সোঁদা গন্ধ অনেকক্ষণ হল বন্ধ—দমকা হাওয়ায় পোড়া ধুলো মাঝে মাঝে চড়াৎ করে যেন থাবড়া মেরে যায়। এই আধা আলো অন্ধকারে যদি এদেশ এত কর্কশ তবে দিনের বেলা এর চেহারা না জানি কী রকম হবে। এই পশ্চিম, এই সুজলা সুফলা ভারতবর্ষ? না, তা তো নয়। বঙ্কিম যখন সপ্তকোটি কণ্ঠের উল্লেখ করেছেন তখন সুজলা-সুফলা শুধু বাঙলাদেশের জন্যই। ত্রিংশ কোটি বলে শুকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামস্করা করা কাষ্ঠরসিকতা। হঠাৎ দেখি পাড়ার হরেন ঘোষ দাঁড়িয়ে। এ্যাঁ? হাঁ! হরেনই তো! কী করে? মানে? আবার গাইছে 'ত্রিংশ কোটি, ত্রিংশ কোটি, কোটি কোটি—'

নাঃ, এতো চেকার সায়েব। টিকিট চেক করতে এসেছে। 'কোটি কোটি' নয়, 'টিকিট টিকিট' বলে চেঁচাচ্ছে। থার্ড ক্লাশ—ইয়োরোপীয়ন হলে কী হবে। রাত তেরটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে টিকিট চেক না করলে ও যে নিজেই ঘুমিয়ে পড়বে। ধড়মড় করে জেগে দেখি গাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছে। 'ইয়োরোপীয়ন কম্পার্টমেন্ট' দিশী বেশ ধারণ করেছে—বাক্স তোরঙ্গ প্যাটরা চাঙারি চতুর্দিকে ছড়ানো। ফিরিঙ্গি কখন কোথায় নেবে গিয়েছে টের পাইনি। তার খাবারের চাঙারিটা রেখে গিয়েছে—এক টুকরো চিরকুট লাগানো, তাতে লেখা 'গুড লাক ফর দি লঙ জার্নি।'

ফিরিঙ্গি হোক, সায়েব হোক, তবু তো কলকাতার লোক—তালতলার লোক। ঐ তালতলাতেই ইরানি হোটেলে কতদিন খেয়েছি, হিন্দু বন্ধুদের মোগলাই খানার কায়দাকানুন শিখিয়েছি, স্কোয়ারের পুকুরপাড়ে বসে সাঁতার কাটা দেখেছি, গোরা সেপাই আর ফিরিঙ্গিতে মেমসায়েব নিয়ে হাতাহাতিতে হাততালি দিয়েছি।

আর বাড়িয়ে বলব না। এই তালতলারই আমার এক দার্শনিক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে এমেটিন ইনজেকশন নিলে মানুষ নাকি হঠাৎ অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যায়, ইংরিজিতে যাকে বলে 'মডলিন'—তখন নাকি পাশের বাড়ির বিড়াল মারা গেলে মানুষ বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বিদেশে যাওয়া আর এমেটিন ইনজেকশন নেওয়া প্রায় একই জিনিস। কিন্তু উপস্থিত সে গবেষণা থাক—ভবিষ্যতে যে তার বিস্তর যোগাযোগ হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভোর কোথায় হল মনে নেই। জুন মাসের গরম পশ্চিমে গৌরচন্দ্রিকা করে নামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে টেরচা হয়ে গাড়িতে ঢোকে আর বাকি দিনটা কী রকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয়। শুনেছি পশ্চিমের ওস্তাদরা নাকি বিলম্বিত একতালে বেশিক্ষণ গান গাওয়া পছন্দ করেন না, দ্রুত তেতালেই তাঁদের কালোয়াতি দেখানোর শখ। আরো শুনেছি যে আমাদের দেশের রাগরাগিণী নাকি প্রহর আর ঋতুর বাছবিচার করে গাওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে পশ্চিমের সকাল বেলাকার রোদ্দুর বিলম্বিত আর বাদবাকি দিন দ্রুত।

গাড়ি যেন কালোয়াৎ। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, কোনো গতিকে রোদ্দুরের তবলচিকে হার মানিয়ে যেন কোথাও গিয়ে ঠাণ্ডায় জিরোবে। আর রোদ্দুরও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক ঊর্ধ্বশ্বাসে। সে পাল্লায়

প্যাসেঞ্জারদের প্রাণ যায়। ইস্টিশানে ইস্টিশানে সম। কিন্তু গাড়ি থেকেই দেখতে পাই, রোদ্দুর প্ল্যাটফর্মের ছাওয়ার বাইরে আড়নয়নে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে—বাঘা তবলচি যে রকম দুই গানের মাঝখানে বাঁয়া-তবলার পিছনে ঘাপটি মেরে চাটিম চাটিম বোল তোলে আর বাঁকা নয়নে ওস্তাদের পানে তাকায়।

কখন খেয়েছি, কখন ঘুমিয়েছি, কোন কোন ইস্টিশান গেল, কে গেল না তার হিসেব রাখিনি। সে গরমে নেশা ছিল, তা না হলে কবিতা লিখব কেন? বিবেচনা করুন—

দেখিলাম পোড়া মাঠ। যতদূর দিগন্তের পানে
দৃষ্টি যায়—দগ্ধ, ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা। শান্তি নাহি প্রাণে
ধরিত্রীর কোনোখানে। সবিতার ক্রুদ্ধ অগ্নিদৃষ্টি
বর্ষিছে নির্মম বেগে। গুমরি উঠিছে সর্বসৃষ্টি
অরণ্য পর্বত জনপদে। যমুনার শুষ্ক বক্ষ
এ তীর ও তীর ব্যাপী—শুষিয়াছে কোন ক্রূর যক্ষ
তার স্নিগ্ধ মাতৃরস। হাহাকার উঠে সর্বনাশা
চরাচরে। মনে হয় নাই নাই নাই কোনো আশা
এ মরুরে প্রাণ দিতে সুধা-সিক্ত শ্যামলিম ধাবে।
বৃত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্যের সর্বশক্তি কাড়ে
বাসব আসবরিক্ত। ধরণীর শুষ্ক স্তনতৃণে
প্রেতযোনি গাভী, বৎস হৃত-আশ ক্লান্ত টেনে টেনে।

কী কবিতা! পশ্চিমের মাঠের চেয়েও নীরস কর্কশ। গুরুদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এ পদ্য ছাপানো হয়নি। গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ।

দুই

গাঁয়ের পাঠশালার বুড়ো পণ্ডিতমশাই হাই তুললেই তুড়ি দিয়ে করুণ কণ্ঠে বলতেন, 'রাধে গো, ব্রজসুন্দরী, পার করো, পার করো।' বড় হয়ে মেলা হিন্দি উর্দু পড়েছি, নানা দেশের নানা লোকের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে কিন্তু 'পার করো, পার করো' বলে ঠাকুরদেবতাকে স্মরণ করতে কাউকে শুনিনি।

শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা পার হয়ে এতদিন বাদে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম। নামগুলো ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছি, ম্যাপে ভালো করে চিনে নিয়েছি আর কল্পনায় দেখেছি তাদের বিরাট তরঙ্গ, খরতর স্রোত। ভেবেছি আমাদের গঙ্গা পদ্মা মেঘনা বুড়ীগঙ্গা এনাদের কাছে ধূলিপরিমাণ। গাড়ি থেকে তাকিয়ে দেখে বিশ্বাস হয় না, এঁরাই ইতিহাস ভূগোলে নামকরা মহাপুরুষের দল। কোথায় তরঙ্গ আর কোথায় তীরের মত স্রোত! এপার ওপার জুড়ে শুকনো খাঁখাঁ বালুচর, জল যে কোথায় তার পাত্তাই নেই, দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ দুইয়েরই প্রয়োজন। তখন বুঝতে পারলুম, ভবযন্ত্রণা পশ্চিমাদের মনে নদী পার হবার ছবি কেন এঁকে দেয় না। এসব নদীর বেশির ভাগ পার হবার জন্য ঠাকুরদেবতার তো দরকারই নেই, মাঝি না হলেও চলে। বর্ষাকালে কী অবস্থা হয় জানিনে, কিন্তু ঠাকুরদেবতাদের তো আর কিস্তিবন্দি করে মৌসুমমাফিক ডাকা যায়না; তিন দিনের বর্ষা তার জন্য বারো মাস চেল্লাচিল্লি করাও ধর্মের খাতে বেজায় বাজে খর্চা।

গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে। দাড়ি লম্বা হয়েছে, টিকি খাটো হয়েছে, নাদুসনুদুস লালাজীদের মিষ্টি মিষ্টি 'আইয়ে বৈঠিয়ে' আর শোনা যায় না। এখন ছ'ফুট লম্বা পাঠানদের 'দাগা, দাগা, দিলতা, রাওড়া', পাঞ্জাবীদের 'তুসি, অসি,' আর শিখ সর্দারজীদের জালবদ্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার। পুরুষ যে রকম মেয়েদের কেশ নিয়ে কবিতা লেখে এদেশের মেয়েরা বোধ করি সর্দারজীদের

দাড়ি সম্বন্ধে তেমনি গজল গায়; সে দাড়িতে পাক ধরলে মরসিয়া-জারী গানে বার্ধক্যকে বেইজ্জৎ করে। তাতে আশ্চর্য হবারই বা কী? তেয়োফিল গতিয়েরের এক উপন্যাসে পড়েছি, ফরাসী দেশে যখন প্রথম দাড়ি কামানো আরম্ভ হয় তখন এক বিদগ্ধা মহিলা গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'চুম্বনের আনন্দ ফরাসী দেশ থেকে লোপ পেল। শ্মশ্রুঘর্ষণের ভিতর দিয়ে প্রেমিকের দুর্বার পৌরুষের যে আনন্দঘন আস্বাদন পেতুম ফরাসী স্ত্রীজাতি তার থেকে চিরতরে বঞ্চিত হল। এখন থেকে ক্লীবের রাজত্ব। কল্পনা করতেও ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ রি রি করে ওঠে।'

ভাবলুম, কোনো সর্দারজীকে এ বিষয়ে রায় জাহির করতে বলি। ফরাসী দাড়ি তার গৌরবের মধ্যাহ্নগগনেও সর্দারজীর দাড়িকে যখন হার মানাতে পারেনি তখন এদেশের মহিলামহলে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে অনেক প্রশস্তি-তারিফ গাওয়া হয়েছে। কিন্তু ভাবগতিক দেখে সাহস পেলুম না। এদেশে কোন কথায় কখন যে কার 'সখ্‌ৎ বেইজ্জতি' হয়ে যায়, আর 'খুনসে' তার 'বদলাঈ' নিতে হয় তার হদিস তো জানিনে—তুলনাত্মক দাড়িতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে প্রাণটা কুরবানি দেব নাকি? এরা যখন বেণীর সঙ্গে মাথা দিতে জানে তখন আলবৎ দাড়িবিহীন মুণ্ডও নিতে জানে।

সামনের বুড়ো সর্দারজীই প্রথম আলাপ আরম্ভ করলেন। 'গোয়িঙ ফার' নয়, সোজাসুজি 'কহাঁ জাইয়েগা?' আমি ডবল তসলীম করে সবিনয় উত্তর দিলুম। ভদ্রলোক ঠাকুরদার বয়সী আর জবরজঙ্গ দাড়ি-গোঁফের ভিতর অতিমিষ্ট মোলায়েম হাসি। বিচক্ষণ লোকও বটেন, বুঝে নিলেন নিরীহ বাঙালী কৃপাণ-বন্দুকের মাঝখানে খুব আরাম বোধ করছে না। জিজ্ঞাসা করলেন পেশাওয়ারে কাউকে চিনি, না হোটেলে উঠব। বললুম 'বন্ধুর বন্ধু স্টেশনে আসবেন, তবে তাঁকে কখনো দেখিনি, তিনি যে আমাকে কী-করে চিনবেন সে সম্বন্ধে ঈষৎ উদ্বেগ আছে।'

সর্দারজী হেসে বললেন, 'কিছু ভয় নেই, পেশাওয়ার স্টেশনে এক গাড়ি বাঙালী নামে না, আপনি দু'মিনিট সবুর করলেই তিনি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেবেন।'

আমি সাহস পেয়ে বললুম, 'তাতো বটেই, তবে কিনা শার্ট পরে এসেছি—'

সর্দারজী এবার অট্টহাস্য করে বললেন, 'শার্টে যে এক ফুট জায়গা ঢাকা পড়ে তাই দিয়ে মানুষ মানুষকে চেনে নাকি?'

আমি আমতা আমতা করে বললুম 'তা নয়, তবে কিনা ধুতি-পাঞ্জাবী পরলে হয়ত ভালো হত।'

সর্দারজীকে হারাবার উপায় নেই। বললেন, 'এও তো তাজ্জবকী বাৎ—'পাঞ্জাবী' পরলে বাঙালীকে চেনা যায়?'

আমি আর এগলুম না। বাঙালী 'পাঞ্জাবী' ও পাঞ্জাবী-কুর্তায় কী তফাৎ সে সম্বন্ধে সর্দারজীকে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়ত আমাকে আরো বোকা বানিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরঞ্চ উনিই কথা বলুন, আমি শুনে যাই। জিজ্ঞাসা করলুম, 'সর্দারজী, শিলওয়ার বানাতে ক'গজ কাপড় লাগে?'

বললেন, 'দিল্লীতে সাড়ে তিন, জলন্ধরে সাড়ে চার, লাহোরে সাড়ে পাঁচ, লালামুসায় সাড়ে ছয়, রাওলপিণ্ডিতে সাড়ে সাত, তারপর পেশাওয়ারে এক লম্ফে সাড়ে দশ, খাস পাঠানমুলুক কোহাট খাইবারে পুরো থান।'

'বিশ গজ!'

'হ্যাঁ, তাও আবার খাকী শার্টিঙ দিয়ে বানানো।'

আমি বললুম, 'এ রকম একবস্তা কাপড় গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করে কী করে? মারপিট, খুনরাহাজানির কথা বাদ দিন।'

সর্দারজী বললেন, 'আপনি বুঝি কখনো বায়স্কোপে যান না? আমি এই বুড়োবয়সেও মাঝে মাঝে যাই। না গেলে ছেলেছোকরাদের মতিগতি বোঝবার উপায় নেই—আমার আবার একপাল নাতি নাতনি। এই সেদিন দেখলুম, দু'শো বছরের পুরোনো গল্পে এক মেমসায়েব ফ্রকের পর ফ্রক পরেই

যাচ্ছেন, পরেই যাচ্ছেন—মনে নেই, দশখানা না বারোখানা। তাতে নিদেনপক্ষে চল্লিশ গজ কাপড় লাগার কথা। সেই পরে যদি মেমরা নেচেকুঁদে থাকতে পারেন, তবে মদ্দা পাঠান বিশগজী শিলওয়ার পরে মারপিট করতে পারবে না কেন?'

আমি খানিকটা ভেবে বললুম, 'হক কথা, তবে কিনা বাজে খর্চা।'

সর্দারজী তাতে খুশি নন। বললেন, 'সে হল উনিশবিশের কথা। মাদ্রাজী ধুতি সাত হাত, জোর আট; অথচ আপনারা দশ হাত পরেন।'

আমি বললুম, 'দশ হাত টেঁকে বেশি দিন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরা যায়।'

সর্দারজী বললেন, 'শিলওয়ারের বেলাতেও তাই। আপনি বুঝি ভেবেছেন, পাঠান প্রতি ঈদে নতুন শিলওয়ার তৈরি করায়? মোটেই না। ছোকরা পাঠান বিয়ের দিন শ্বশুরের কাছ থেকে বিশগজী একটা শিলওয়ার পায়। বিস্তর কাপড়ের ঝামেলা—এক জায়গায় চাপ পড়ে না বলে বহুদিন তাতে জোড়াতালি দিতে হয় না। ছিঁড়তে আরম্ভ করলেই পাঠান সে শিলওয়ার ফেলে দেয় না, গোড়ার দিকে সেলাই করে, পরে তালি লাগাতে আরম্ভ করে—সে যে কোনো রঙের কাপড় দিয়েই হোক, পাঠানের তাতে বাছবিচার নেই। বাকি জীবন সে ঐ শিলওয়ার পরেই কাটায়। মরার সময় ছেলেকে দিয়ে যায়—ছেলের বিয়ে হলে পর তার শ্বশুরের কাছ থেকে নতুন শিলওয়ার পায়, ততদিন বাপের শিলওয়ার দিয়ে চালায়।'

সর্দারজী আমাকে বোকা পেয়ে মস্করা করছেন, না সত্যি কথা বলছেন বুঝতে না পেরে বললুম, 'আপনি সত্যি সত্যি জানেন, না আপনাকে কেউ বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেছে?'

সর্দারজী বললেন, 'গভীর বনে রাজপুত্তুরের সঙ্গে বাঘের দেখা। বাঘ বলল, 'তোমাকে আমি খাব।' এ হল গল্প, তাই বলে বাঘ মানুষ খায় সেও কি মিথ্যে কথা?'

অকাট্য যুক্তি। পিছনে রয়েছে আবার সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতা। কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বললুম, 'আমরা বাঙালী, পাজামার মর্ম আমরা জানব কী করে? আমাদের হল বিষ্টিবাদলার দেশ, খালবিল পেরতে হয়। ধুতিলুঙ্গি যেরকম টেনে টেনে তোলা যায়, পাজামাতে তো তা হয় না।'

মনে হয় এতক্ষণে যেন সর্দারজীর মন পেলুম। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বর্মা মালয়েও তাই। আমি ঐ সব দেশে ত্রিশ বৎসর কাটিয়েছি।'

তারপর তিনি ঝাড় বেঁধে নানা রকম গল্প বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য কতটা বানিয়ে বলা সে কথা পরখ করার মত পরশপাথর আমার কাছে ছিল না, তবে মনে হল ঐ বাঘের গল্পের মতই। দু'চারজন পাঠান ততক্ষণে সর্দারজীর কাছে এসে তাঁর গল্প শুনতে আরম্ভ করেছে—পরে জানলুম এদের সবাই দু'দশ বছর বর্মা মালয়ে কাটিয়ে এসেছে—এদের সামনে সর্দারজী ঠিক তেমনি ধাবা গল্প করে যেতে লাগলেন। তাতেই বুঝলুম, ফাঁকির অংশটা কমই হবে।

আড্ডা জমে উঠল। দেখলুম, পাঠানের বাইরের দিকটা যতই রসকষহীন হোক না কেন, গল্প শোনাতে আর গল্প বলাতে তাদের উৎসাহের সীমা নেই। তর্কাতর্কি করে না, গল্প জমাবার জন্য বর্ণনার রঙতুলিও বড় একটা ব্যবহার করে না। সব যেন উড্‌কাটের ব্যাপার—সাদামাটা কাঠখোট্টা বটে, কিন্তু ঐ নীরস নিরলঙ্কার বলার ধরনে কেমন যেন একটা গোপন কায়দা রয়েছে যার জোর মনের উপর বেশ জোর দাগ কেটে যায়। বেশির ভাগই মিলিটারী গল্প, মাঝে মাঝে ঘরোয়া অথবা গোষ্ঠী-সংঘর্ষণের ইতিহাস। অনেকগুলো গোষ্ঠীর নামই সেদিন শেখা হয়ে গেল—আফ্রিদী, শিনওয়ারী, খুগিয়ানী আরো কত কী। সর্দারজী দেখলুম এদের হাড়হদ্দ সবকিছুই জানেন, আমার সুবিধের জন্য মাঝে মাঝে টীকাটিপ্পনী কেটে আমাকে যেন আস্তে আস্তে ওয়াকিফহাল করে তুলছিলেন। ফুরসৎমাফিক আমাকে একবার বললেনও, 'ইংরেজ-ফরাসীর কেচ্ছা পড়ে পড়ে তো পরীক্ষা পাশ করেছেন, অন্য কোনো কাজে সেগুলো লাগবে না। তার চেয়ে পাঠানদের নামবুনিয়াদ শিখে নিন, পেশাওয়ার খাইবারপাশে

কাজে লাগবে।'

সর্দারজী হক কথা বলেছিলেন।

পাঠানদের গল্প আবার শেষ হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে। ভাঙা ভাঙা পশতু উর্দু পাঞ্জাবী মিশিয়ে গল্প শেষ করে বলবে, 'তখন তো আমার কুছ মালুমই হল না, আমি যেন শরাবীর বেহুঁশীতে মশগুল। পরে যখন সাফসফা, বিলকুল ঠাণ্ডা, তখন দেখি বাঁ হাতের দুটো আঙুল উড়ে গিয়েছে। এই দেখুন।' বলে বাইশগজী শিলওয়ারের ভাঁজ থেকে বাঁ হাতখানা তুলে ধরল।

আমি দরদ দেখাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাসপাতালে কতদিন ছিলেন?'

সুবে পাঠানিস্থান এক সঙ্গে হেসে উঠল; বাবুজীর অজ্ঞতা দেখে ভারি খুশি।

পাঠান বলল, 'হাসপাতাল আর বিলায়তি ডাগ্‌দর কহাঁ, বাবুজী? বিবি পট্টি বেঁধে দিলেন, দাদীমা কুচকুচ হলদভী লাগিয়ে দিলেন, মোল্লাজী ফুঁ-ফুঁকার করলেন। অব্ দেখিয়ে, মালুম হয় যেন আমি তিন আঙুল নিয়েই জন্মেছি।'

পাঠানের ভগিনীপতিও গাড়িতে ছিল; বলল, 'যে তিনজনের কথা বললে তাদের ভয়ে অজ্রঈল (যমদূত) তোমাদের গাঁয়ে ঢোকে না—তোমাকে মারে কে?' সবাই হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর দাদীজানের কেচ্ছা ওকে বলতে বলুন না। পাহাড়ের উপর থেকে পাথরের পর পাথর গড়িয়ে ফেলে কী রকম করে একটা পুরোদস্তুর গোরা পল্টনকে তিন ঘণ্টা কাবু করে রেখেছিলেন।'

সেদিন গল্পের প্লাবনে রৌদ্র আর গ্রীষ্ম দুই-ই ডুবে গিয়েছিল। আর কী খানাপিনা! প্রতি স্টেশনে আড্ডার কেউ না কেউ কিছু না কিছু কিনবেই। চা, শরবৎ, বরফজল, কাবাব, রুটি, কোনো জিনিসই বাদ পড়ল না। কে দাম দেয়, কে খায় কিচ্ছু বোঝবার উপায় নেই। আমি দু'একবার আমার হিস্যা দেবার চেষ্টা করে হার মানলুম। বারোজন তাগড়া পাঠানের তির্যকব্যূহ ভেদ করে দরজায় পৌঁছবার বহু পূর্বেই কেউ না কেউ পয়সা দিয়ে ফেলেছে। আপত্তি জানালে শোনে না, বলে, 'বাবুজী এই পয়লা দফা পাঠানমুল্লুকে যাচ্ছেন, না হয় আমরা একটু মেহমানদারী করলুমই। আপনি পেশাওয়ারে আড্ডা গাড়ুন, আমরা সবাই এসে একদিন আচ্ছা করে খানাপিনা করে যাবো।' আমি বললুম, 'আমি পেশাওয়ারে বেশি দিন থাকব না।' কিন্তু কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। সর্দারজী বললেন, 'কেন বৃথা চেষ্টা করেন? আমি বুড়োমানুষ, আমাকে পর্যন্ত একবার পয়সা দিতে দিল না। যদি পাঠানের আত্মীয়তা-মেহমানদারী বাদ দিয়ে এদেশে ভ্রমণ করতে চান, তবে তার একমাত্র উপায় কোনো পাঠানের সঙ্গে একদম একটি কথাও না বলা। তাতেও সব সময় ফল হয় না।'

পাঠানের দল আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমরা গরীব, পেটের ধান্দায় তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়াই, আমরা মেহমানদারী করব কী দিয়ে?'

সর্দারজী আমার কানে কানে বললেন, 'দেখলেন বুদ্ধির বহর? মেহমানদারী করার ইচ্ছাটা যেন টাকা থাকা না-থাকার উপর নির্ভর করে।'

তিন

সর্দারজী যখন চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশাওয়ার পৌঁছতে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। গরমে, ধুলোয়, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাবরুটিতে আর স্নানাভাবে আমার গায়ে তখন আর একরত্তি শক্তি নেই যে বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করি। কিন্তু পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করাতে সুখ এই যে, আমাদের কাছে যে কাজ কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়। গাড়ির ঝাঁকুনির তাল সামলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, উপরের বাঙ্কের বিছানা বাঁধা আর দেশলাইটি এগিয়ে দেওয়ার মধ্যে পাঠান কোনো তফাৎ দেখতে পায় না। বাক্স তোরঙ্গ নাড়াচাড়া করে যেন অ্যাটাচি কেস।

ইতিমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেয়ে গিয়েছি যে পাঠান-মুল্লুকের প্রবাদ, 'দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের।' শুনে গর্ব অনুভব করেছি বটে যে বন্দুকধারী পাঠান কামানধারী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিন্তু বিন্দুমাত্র আরাম বোধ করিনি। গাড়ি পেশাওয়ার পৌঁছবে রাত ন'টায়। তখন যে কার রাজত্বে গিয়ে পৌঁছব তাই নিয়ে মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা-ঠা আলো, ন'টা বাজল কী করে, আর পেশাওয়ারে পৌঁছলুমই বা কী করে? একটানা মুসাফিরির ধাক্কায় মন তখন এমনি বিকল হয়ে গিয়েছিল যে শেষের দিকে ঘড়ির পানে তাকানো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলুম। এখন চেয়ে দেখি সত্যি ন'টা বেজেছে। তখন অবশ্য এসব ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে হয়রান হবার ফুরসৎ ছিল না, পরে বুঝতে পারলুম পেশাওয়ার এলাহাবাদের ঘড়িমাফিক চলে বলে কাণ্ডটা খুবই স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক— তখন আবার জুন মাস।

প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ্য করলুম যে ছ'ফুটী পাঠানদের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের বাঙালীত্ব জাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে এক হাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর দু'হাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ—পরম উৎসাহে, গরম সম্বর্ধনায়। সে চাপে আমার হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর দুই থাবার ভিতর তখন লুকোচুরি খেলছে। চিৎকার করে যে লাফ দিয়ে উঠিনি তার একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে তখনো গাড়ির পাঠানের দুটো আঙুল উড়ে যাওয়ার গল্প অবচেতন মনে বাসা বেঁধে অর্ধচেতন সহিষ্ণুতায় আমাকে উৎসাহিত করছিল। তাই সেদিন পাঠান-মুল্লুকের পয়লা কেলেঙ্কারি থেকে বাঙালী নিজের ইজ্জৎ বাঁচাতে পারল। কিন্তু হাতখানা কোন শুভলগ্নে ফেরৎ পাব সে কথা যখন ভাবছি তখন তিনি হঠাৎ আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানী কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর সমান সমান উঁচু হলে সেদিন কী হত বলতে পারিনে কিন্তু আমার মাথা তাঁর বুক অবধি পৌঁছয়নি বলে তিনি তাঁর এক কড়া জোরও আমার গায়ে চাপাতে পারছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দু পশতুতে মিলিয়ে যা বলে যাচ্ছিলেন তার অনুবাদ করলে অনেকটা দাঁড়ায়—'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি তো?' আমি 'জী হাঁ, জী না,' করেই যাচ্ছি আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের কাছ থেকে তাদের আদবকায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতুম। পরে ওয়াকিফহাল হয়ে জানলুম, বন্ধুদর্শনে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই, দেওয়া কায়দা নয়। উভয় পক্ষ একসঙ্গে প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে যাবেন অন্তত দু'মিনিট ধরে। তারপর হাত-মিলানা, বুক-মিলানা শেষ হলে একজন একটি প্রশ্ন শুধাবেন, 'কী রকম আছেন?' আপনি তখন বলবেন, 'শুকুর, অলহমদুলিল্লা' অর্থাৎ 'খুদাতালাকে ধন্যবাদ, আপনি কী রকম?' তিনি বলবেন, 'শুকুর, অলহমদুলিল্লা।' সর্দিকাশির কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে হলে তখন বলতে পারেন—কিন্তু মিলনের প্রথম ধাক্কায় প্রশ্নতরঙ্গের উত্তর নানা ভঙ্গিতে দিতে যাওয়া 'সখৎ বেয়াদবী!'

খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না, আমি বাঙালী তিনি পাঠান, তবে যে এত সম্বর্ধনা করছেন তার মানে কী? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মত আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না—আর সে অতিথি যদি বিদেশী হয় তা হলে তো আর কথাই নেই। তারো বাড়া, যদি সে অতিথি পাঠানের তুলনায় রোগাদুবলা সাড়েপাঁচফুটী হয়। ভদ্রলোক পাঠানের মারপিট করা মানা। তাই সে তার শরীরের অফুরন্ত শক্তি নিয়ে কী করবে ভেবে

পায় না। রোগাদুব্‌লা লোক হাতে পেলে আর্তকে রক্ষা করার কৈবল্যানন্দ সে তখন উপভোগ করে—যদিও জানে যে কাজের বেলায় তার গায়ের জোরের কোনো প্রয়োজনই হবে না।

টাঙা তো চলেছে পাঠানী কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয়—গাড়ি সোজা চলে। পাঠান-মুল্লুকে লোকজন যার যে রকম খুশি চলে, গাড়ি এঁকেবেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘণ্টা বাজানো, চিৎকার করা বৃথা। খাস পাঠান কখনো কারো জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে 'স্বাধীন', রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার 'স্বাধীনতা' রইল কোথায়? কিন্তু ঐ স্বাধীনতার দাম দিতেও সে কসুর করে না। ঘোড়ার নালের চাট লেগে যদি তার পায়ের এক খাব্‌লা মাংস উড়ে যায় তাহলে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিশ ডাকাডাকি করে না। পরম অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'দেখতে পাস না?' গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান—ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই?' ব্যস্‌। যে যার পথে চলল।

দেখলুম পেশাওয়ারের বারো আনা লোক আহমদ আলীকে চেনে, আহমদ আলী বোধহয় দশ আনা চেনেন। দু'মিনিট অন্তর অন্তর গাড়ি থামান আর পশতু জবানে কী একটা বলেন; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে জানান, 'আপনার সঙ্গে খেতে বললুম। আপত্তি নেই তো?'

আহমদ আলীর স্ত্রীর সৌভাগ্য বলতে হবে—কারণ তিনিই রাঁধেন, পর্দা বলে বাড়েন না—যে তাঁদের বাড়ি স্টেশনের কাছে না হলে সে রাত্রে আহমদ আলীর বাড়িতে পাঠান-মুল্লুকের জিরগা বসে যেত।

সরল পাঠান ও সুচতুর ইংরেজে একটা জায়গায় মিল আছে। পাঠানমাত্রই ভাবে বাঙালী বোমা মারে, ইংরেজেরও ধারণা অনেকটা তাই। আহমদ আলী সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর। আমি তাঁর বাড়ি পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের ভিতর এক পুলিশ এসে আহমদ আলীকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তিনি সেটা পড়েন আর হাসেন। তারপর তিনি রিপোর্টখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাতে রয়েছে আমার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, এবং বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে যে লোকটা বাঙালী—আহমদ আলী যেন উক্ত লোকটার অনুসন্ধান করে সদাশয় সরকারকে তার হাল-হকিকৎ বাৎলান।

আহমদ আলী কাগজের তলায় লিখলেন, 'ভদ্রলোক আমার অতিথি।'

আমি বললুম, 'নাম-ধাম মতলবটাও লিখে দিন—জানতে চেয়েছে যে।'

আহমদ আলী বলেন, 'কী আশ্চর্য, অতিথির পিছনেও গোয়েন্দাগিরি করব নাকি?'

আমি ভাবলুম পাঠান-মুল্লুকে কিঞ্চিৎ বিদ্যা ফলাই। বললুম, 'কর্ম করে যাবেন নিরাসক্ত ভাবে, তাতে অতিথির লাভলোকসানের কথা উঠবে না, এই হল গীতার আদেশ।'

আহমদ আলী বললেন, 'হিন্দুধর্মে শুনতে পাই অনেক কেতাব আছে। তবে আপনি বেছে বেছে একখানা গীতের বই থেকে উপদেশটা ছাড়লেন কেন? তা সে কথা থাক। আমি বিশ্বাস করি কোনো কর্ম না করাতে, সে আসক্তই হোক আর নিরাসক্তই হোক। আমার ধর্ম হচ্ছে উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা।'

'উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা' কথাটায় আমার মনে একটু ধোঁকা লাগল। আমরা বলি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকব এবং এই রকম চিৎ হয়ে শুয়ে থাকাটা ইংরেজ পছন্দ করে না বলে 'লাইঙ স্যুপাইন' কর্মটি প্রভুদের পক্ষে অপকর্ম বলে গণ্য হয়। পাঠানে-ইংরেজে মিল আছে পূর্বেই বলেছি, ভাবলুম তাই বোধ হয় পাপটা এড়াবার ও আরামটি বজায় রাখার জন্য পাঠান উবুড় হয়ে শুয়ে থাকার কথাটা আবিষ্কার করেছে।

আমার মনে তখন কী দ্বিধা আহমদ আলী আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কিনা জানিনে। নিজের থেকেই বললেন, 'তা না হলে এদেশে রক্ষা আছে! এই তো মাত্র সেদিনের কথা। রাত্রে বেরিয়েছি রোঁদে—মুশহুর নাচনেওয়ালী জান্‌কী বাঈ কয়েক দিন ধরে গুম, যদি কোনো পাত্তা মেলে। আমি তো আপন মনে হেঁটে যাচ্ছি—আমার প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে জন আষ্টেক গোরা সেপাই কাঁধ মিলিয়ে

রাত্তিরের টহলে কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসঙ্গে এক লহমায় অনেকগুলো রাইফেলের কড়াক্-পিঙ্। আমিও তড়াক করে লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লুম, তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের নর্দমায়। সেখানে উবুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে মাথা তুলে দেখি, গোরার বাচ্চারা সব মাটিতে লুটিয়ে, জন দশেক আফ্রিদী চটপট গোরাদের রাইফেলগুলো তুলে নিয়ে অন্তর্ধান। আফ্রিদীর নিশান সাক্ষাৎ যমদূতের ফরমান, মকমল ডিক্রি, কিস্তি বরখেলাপের কথাই ওঠে না।

'তাই বলি, উবুড় হয়ে শুয়ে থাকতে না জানলে কখন যে কোন আফ্রিদীর নজরে পড়ে যাবেন বলা যায় না। জান বাঁচাবার এই হল পয়লা নম্বরের তালিম।'

আমি বললুম, 'চিৎ হয়ে থাকলেই বা দোষ কী?'

আহমদ আলী বললেন, 'উহুঁ, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে দেখতে পাবেন খুদাতালার আসমান—সে বড় খাবসুরৎ। কিন্তু মানুষের বদমায়েশীর উপর নজর রাখবেন কী করে? কী করে জানবেন যে ডেরা ভাঙবার সময় হল, আর এখানে শুয়ে থাকলে নয়া ফ্যাসাদে বাঁধা পড়ার সম্ভাবনা? মিলিটারি আসবে, তদারকতদন্ত হবে, আপনাকে পাকড়ে নিয়ে যাবে—তার চেয়ে আফ্রিদীর গুলি ভালো।'

আমি বললুম, 'সে না হয় আমার বেলা হতে পারত। কিন্তু আপনাকে তো রিপোর্ট দিতেই হত।'

আহমদ আলী বললেন, 'তওবা, তওবা। আমি রিপোর্ট করতে যাব কেন? আমার কী দায়? গোরার রাইফেল, আফ্রিদীর তার উপর নজর। যে-জিনিসে মানুষের জান পোঁতা, তার জন্য মানুষ জান দিতে পারে, নিতেও পারে। আমি সে ফ্যাসাদে কেন ঢুকি? বাঙালী বোমা মারে—কেন মারে খোদায় মালুম, রাইফেলে তো তার শখ নেই—ইংরেজ বোমা খেতে পছন্দ করে না, কিন্তু বাঙালীর গোঁ সে খাওয়াবেই। তার জন্য সে জান দিতে কবুল, নিতেও কবুল। আমি কেন ইংরেজকে আপনার হাড়হদ্দের খবর দেব? জান লেনদেনের ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের দূরে থাকা উচিত।'

আমি বললুম, 'হক কথা বলেছেন। রাসেলেরও ঐ মত। ভ্যালুজ নিয়ে নাকি তর্ক হয় না। ইংরেজে পাঠানে বিস্তর মিল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাঙালী কেন বোমা মারে সে তো অত্যন্ত সোজা প্রশ্ন। স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতা পেয়ে গেলে সেটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাইফেলের প্রয়োজন হয়। তাই বোধ করি স্বাধীন আফ্রিদীর কাছে রাইফেল এত প্রিয়বস্তু।'

আহমদ আলী অনেকক্ষণ আপন মনে কী যেন ভাবলেন। বললেন, 'কী জানি, স্বাধীনতা কীসের জোরে টিকে থাকে? রাইফেলের জোরে না বুকের জোরে। আমি এই পরশু দিনের একটা দাঙ্গার কথা ভাবছিলুম। জানেন বোধহয়, পেশাওয়ারের প্রায় প্রতি পাড়ায় একজন করে গুণ্ডার সর্দার থাকে। দুই পাড়ার গুণ্ডার দলে সেদিন লাগল লড়াই। গোলাগুলীর ব্যাপার নয়। হাতাহাতি, জোর ছোরাছুরি। একদল মিনিট দশেক পরে মার সইতে না পেরে দিল ছুট। কিন্তু তাদের সর্দার রইল দাঁড়িয়ে। সমস্ত দল তখন পড়ল গিয়ে তার ঘাড়ে—মেরে গুঁতিয়ে থেঁৎলে যখন ভাবল সে মরে গিয়েছে, তখন তাকে ফেলে সবাই চলে গেল। কাল তাকে হাসপাতালে দেখে এলুম। অন্তত ছ'মাস লাগবে সারতে—যদি ফাঁড়াটা কাটে। ক'খানা পাঁজর ভেঙেছে, আঁতে ক'টা ফুটো হয়েছে তার হিসেবনিকেশ এখনো শেষ হয়নি।

'কিন্তু আশ্চর্য হলুম দেখে যে লোকটা অতি রোগা টিঙটিঙে, সাড়ে পাঁচফুট হয় কি না হয়। ছোরাও নাকি সে চালাতে জানে না, রাইফেলও সে রাখে না। ব্যস—ঐ এক চীজ আছে, হিম্মৎ। বিস্তর মার খেয়েছে, অনেকবার। মেরেছে অল্প, মারিয়েছে অনেক, পালায়নি কক্খনো। আসামী হয়ে আদালতে এসেছে বহুবার, কখনো ফরিয়াদী হয়নি। বলে, 'পাঁচজনের বিপদ আপদের ফৈসালা করে দিই আমি, আর আমি যাব আদালতে আমার বিপদ আপদের কান্নাকাটি শোনাতে!'

'আরও আশ্চর্য হলুম দেখে, হাসপাতালে তার ওয়ার্ডে যেন পেশাওয়ারের ফলের বাজার বসে গিয়েছে। কাবুলের আঙুর, কান্দাহারের চেরী, মজার-ই-শরীফের আখরোট-খোবানী সব মজুদ। ছ'জন

পালোয়ান দিনরাত তার খাটের চতুর্দিকে মাটিতে বসে—কী জানি হুজুরের কখন কী দরকার হয়। হুজুর অবশ্যি উপস্থিত জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সঙ্কটসঙ্কুল খাইবারপাসে।

'কিন্তু আসল কথা, সে এখনো দলের সর্দার। তার ইজ্জৎ বেড়েছে; তার খুশনামে পেশাওয়ারের গুণ্ডামহল গমগম করছে।'

আমি চুপ করে ভাবছি, এমন সময় দেখি আহমদ আলী মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন, ' লোকটার হিম্মৎ ছাড়া নাকি আরো একটা গুণ আছে। যাকে বলে হাজির-জবাব। সব কথার চটপট উত্তর দিতে পারে। শুনলুম, চারবার প্রমাণ অভাবে খালাস পেয়ে পাঁচ বারের বার যখন হাকিম ইজাজ হুসেন খানের আদালতে উপস্থিত হল, তখন তিনি নাকি চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'এই নিয়ে তুই পাঁচবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস; তোর লজ্জা-শরম নেই?'

'সর্দার নাকি মুচকি হেসে বলেছিল, 'হুজুর প্রমোশন না পেলে আমি কী করব?'

সে রাতে শুতে যাবার আগে মটরুদাকে চিঠিতে লিখলুম, 'চিৎ হয়ে শোবে না, উবুড় হয়ে শোবে। পাঠান-মুল্লুকের এই আইন। শিব ঠাকুরের আপন দেশেও এই খবরটি পাঠিয়ে দিয়ো।'

চার

যতই বলি, 'ভাই আহমদ আলী, খুদা আপনার মঙ্গল করবেন, আখেরে আপনি বেহেশ্‌তে যাবেন, আমার যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করে দিন,' আহমদ আলী ততই বলেন, 'বরাদরে আজীজে মন্ (হে আমার প্রিয় ভ্রাতা), ফার্সীতে প্রবাদ আছে, 'দের আয়াদ্ দুরুস্ত আয়দ্' অর্থাৎ 'যা কিছু ধীরেসুস্থে আসে তাই মঙ্গলদায়ক'; আরবীতেও আছে, 'অল অজলু মিনা শয়তান' অর্থাৎ কিনা 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা'; ইংরিজিতেও আছে—'

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, এই পাঠানের চালে আমার চলবে না। শুনেছি এখান থেকে লাণ্ডিকোটাল যেতে তাদের পনেরো দিন লাগে—বাইশ মাইল রাস্তা।'

আহমদ আলী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বলেছে?'

আমি বললুম, 'কেন, কাল রাত্তিরের দাওয়াতে, রমজান খান, সেই যে বাবরীচুলওয়ালা, মিষ্টি মিষ্টি মুখ।'

আহমদ আলী বললেন, 'রমজান খান পাঠানদের কী জানে? তার ঠাকুরমা পাঞ্জাবী, আর সে নিজে লাহোরে তিন মাস কাটিয়ে এসেছে। খাস পাঠান কখনো আটক (সিন্ধু নদ) পেরোয় না। তার লাণ্ডিকোটাল থেকে পেশাওয়ার পৌঁছতে অন্তত দু'মাস লাগার কথা। না হলে বুঝতে হবে লোকটা রাস্তার ইয়ার-দোস্তের বাড়ি কাট করে এসেছে। পাঠান-মুল্লুকের রেওয়াজ প্রত্যেক আত্মীয়ের বাড়িতে তেরাত্তির কাটানো, আর, সব পাঠান সব পাঠানের ভাইবেরাদর। হিসেব করে নিন।'

কাগজ পেন্সিল ছিল না। বললুম, 'রক্ষে দিন, আমার যে কণ্ট্রাক্ট সই করা হয়ে গিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে।'

আহমদ আলী বললেন, 'বাস্ না পেলে আমি কী করব?'

'আপনি চেষ্টা করেছেন?'

আহমদ আলী আমাকে হুঁশিয়ার হতে বলে জানালেন, তিনি পুলিশের ইন্সপেক্টর, নানা রকমের উকিল মোক্তার তাঁকে নিত্যি নিত্যি জেরা করেন, আমি ও-লাইনে কাজ করে সুবিধা করতে পারব না।

তারপর বললেন, 'পেশাওয়ার ভালো করে দেখে নিন। অনেক দেখবার আছে, অনেক শেখবার আছে। বোখারা সমরকন্দ থেকে সদাগরেরা এসেছে পুস্তীন নিয়ে, তাশখন্দ থেকে এসেছে সামোভার নিয়ে—'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সামোভার কী?'

'রাশান গল্প পড়েন নি? সামোভার হচ্ছে ধাতুর পাত্র—টেবিলে রেখে তাতে চায়ের জল গরম করা হয়। আপনারা যে রকম মিঙ বংশের ভাস্ নিয়ে মাতামাতি করেন, পেশাওয়ার কান্দাহার তাশখন্দ তুল্লা সামোভার নিয়ে সেইরকম লড়ালড়ি করে, কে কত দাম দিতে পারে। সে কথা আরেক দিন হবে। তারপর শুনুন, মজার-ই-শরীফ থেকে কার্পেট এসেছে, বদখশান থেকে লাল রুবি, মেশেদ থেকে তসবী, আজরবাইজান থেকে—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্।'

'আরো কত কী। তারা উঠেছে সব সরাইয়ে। সন্ধ্যাবেলায় গরম ব্যবসা করে, রাত্তিরে জোর খানাপিনা, গানবাজনা। কত হৈ-হল্লা, খুনখারাবী, কত রকম-বেরকমের পাপ। শোনেননি বুঝি, পেশাওয়ার হাজার পাপের শহর। মাসখানেক ঘোরাঘুরি করুন যে-কোনো সরাইয়ে—ডজনখানেক ভাষা বিনা কসরতে বিনা মেহন্নতে শেখা হয়ে যাবে। পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন, চট করে চলে যাবেন ফার্সীতে, তারপর জগতাইতুর্কী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী—বাকিগুলো আপনার থেকেই হয়ে যাবে। গান-বাজনায় আপনার বুঝি শখ নেই—সেকী কথা? আপনি বাঙালী, টাগোর সায়েবের গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার আমি পড়েছি। আহা, কী উম্‌দা বয়েৎ, আমি ফার্সী তর্জমায় পড়েছি। আপনার তো এসব জিনিসে শখ থাকার কথা। নাই বা থাকল, কিন্তু ইদনজানের গান না শুনে আপনি পেশাওয়ার ছাড়বেন কী করে? পেশাওয়ারী হুরী, বারোটা ভাষায় গান গাইতে পারে। তার গাহক দিল্লি থেকে বাগদাদ অবধি। আপনি গেলে লড়কী বহুৎ খুশ হবে—তার রাজত্ব বাগদাদ থেকে বাঙ্গাল্ অবধি ছড়িয়ে পড়বে।

আমি আর কী করি। বললুম, 'হবে। সব হবে। কিন্তু টাগোর সায়েবের কোন কবিতা আপনার বিশেষ পছন্দ হয়?'

আহমদ আলী একটু ভেবে বললেন, 'আয় মাদর, শাহজাদা ইমরোজ —'

বুঝলুম, এ হচ্ছে—

'ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর—'

বললুম, 'সেকী কথা, খান সায়েব? এ কবিতা তো আপনার ভালো লাগার কথা নয়। আপনারা পাঠান, আপনারা প্রেমে জখম হলে তো বাঘের মত রুখে দাঁড়াবেন। ঘোড়ায় চড়ে আসবেন বিদ্যুৎগতিতে, প্রিয়াকে একটানে তুলে নিয়ে কোলে বসিয়ে চলে যাবেন দূরদূরান্তরে। সেখানে পর্বতগুহার নির্জনে আরম্ভ হবে প্রথমে মানঅভিমানের পালা। আপনি মাথা পেতে দেবেন তাঁর পায়ের মখমলের চটির নীচে—'

আমাকেই থামতে হল কারণ আহমদ আলী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক, কারো কথা মাঝখানে কাটেন না। আমি আটকে গেলে পর বললেন, 'থামলেন কেন, বলুন।'

আমি বললুম, 'আপনারা কোন দুঃখে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবেন ম্যা ম্যা, মা মা করে?'

আহমদ আলী বললেন, 'হুঁ, এক জর্মন দার্শনিকও নাকি বলেছেন স্ত্রীলোকের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে ভুলো না।'

আমি বললুম, 'তওবা তওবা, অত বাড়াবাড়ির কথা হচ্ছে না।'

আহমদ আলী বললেন, 'না দাদা, প্রেমের ব্যাপারে হয় ইস্‌পার না হয় উস্‌পার। প্রেম হচ্ছে শহরের বড় রাস্তা, বিস্তর লোকজন। সেখানে 'গোল্ডেন মীন' বা 'সোনালী মাঝারি' বলে কোনো উপায় নেই। হয় 'কীপ টু দি রাইট' অর্থাৎ ম্যা ম্যা করে হৃদয়বেদন নিবেদন, না হয় 'লেফট' অর্থাৎ বজ্রমুষ্টি দিয়ে নীটশে যা বলেছেন। কিন্তু থাক না এসব কথা।'

বুঝলুম প্রেমের ব্যাপারে পাঠান নীরব কর্মী। আমরা বাঙালী, দুপুররাত্রে পাড়ার লোককে না জাগিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে পারিনে। আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমাকে যেন খুশি করার জন্য

আহমদ আলী বললেন, 'পেশাওয়ারের বাজারে কিন্তু কোনো গানেওয়ালী নাচনেওয়ালী ছ'মাসের বেশি টিঁকতে পারে না। কোনো ছোকরা পাঠান প্রেমে পড়বেই। তারপর বিয়ে করে আপন গাঁয়ে নিয়ে সংসার পাতে।'

'সমাজ আপত্তি করে না? মেয়েটা দু'দিন বাদে শহরের জন্য কান্নাকাটি করে না?'

'সমাজ আপত্তি করবে কেন? ইসলামে তো কোনো মানা নেই। তবে দুদিন বাদে কান্নাকাটি করে কিনা বলা কঠিন। পাঠান গাঁয়ের কান্না শহরে এসে পৌঁছবে, এত জোর গলা ইদনজানেরও নেই। জানকী বাঈয়ের থাকলে আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হত না। হলপ করে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার নিজের বিশ্বাস, বেশির ভাগ মেয়েই বাজারের হট্টগোলের চেয়ে গ্রামের শান্তিই পছন্দ করে। তার উপরে যদি ভালোবাসা পায়, তা হলে তো আর কথাই নেই।'

আমি বললুম, 'আমাদের এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকও ঐ রকম ধরনের অভিমত দিয়েছেন, মেয়েদের বাজারে বহু খোঁজখবর নিয়ে।'

এমন সময় আহমদ আলীর এক বন্ধু মুহম্মদ জান বাইসিকেল ঠেলে ঠেলে এসে হাজির। আহমদ আলী জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইসিকেল আবার খোঁড়া হল কী করে?'

মুহম্মদ জান পাঞ্জাবী। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কেন যে আপনি এদেশে এসেছেন বুঝতে পারিনে। এই পাঠানরা যে কী রকম পাব্লিক নুইসেন্স তার খবর জানতে পারতেন যদি একদিনও আধ ঘণ্টার তরে এ শহরে বাইসিকেল চড়তেন। এক মাইল যেতে না যেতে তিনটি পাংকচার। সব ছোট ছোট লোহার।'

ভদ্রলোক দম নিচ্ছিলেন। আমি দরদ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত লোহা আসে কোথা থেকে?' মুহম্মদ জান আরো চটে গিয়ে বললেন, 'আমাকে কেন শুধোচ্ছেন? জিজ্ঞেস করুন আপনার দিলজানের দোস্ত শেখ আহমদ আলী খান পাঠানকে।'

আহমদ আলী বললেন, 'জানেন তো পাঠান বড্ড আড্ডাবাজ। গল্পগুজব না করে সে এক মাইল পথও চলতে পারে না। কাউকে না পেলে সে বসে যাবে রাস্তার পাশে। মুচীকে বলবে, 'দাও তো ভায়া, আমার পয়জারে গোটাকয়েক পেরেক ঠুকে।' মুচী তখন ঢিলে লোহাগুলো পিটিয়ে দেয়, গোটা দশেক নতুনও লাগিয়ে দেয়। এই রকম শ'খানেক লোহা লাগালে জুতোর চামড়া আর মাটিতে লাগে না, লোহার উপর দিয়েই রাস্তার পাথরের চোট যায়। হাফসোল লাগানোর খরচাকে পাঠান বড্ড ভয় করে কিনা। সেই পেরেক আবার হরেক রকম সাইজের হয়। পাঠানের জুতো তাই লোহার মোজায়িক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লোহা ঠোকানো না ঠোকানো অবান্তর— মুচীর সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য ঐ তার অজুহাত।'

মুহম্মদ জান বললেন, 'আর সেই লোহা ঢিলে হয়ে গিয়ে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।'

আমি বললুম, 'এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল আড্ডা মানুষকে অপকর্ম থেকে ঠেকিয়ে রাখে। এখন দেখতে পাচ্ছি ভুল করেছি।'

আহমদ আলী কাতরস্বরে বললেন, 'আড্ডার নিন্দা করবেন না, বাইসিকেল চড়ার নিন্দা করুন। আপনাকে বলিনি, 'অল অজলু মিনা শয়তান' অর্থাৎ হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা। তাই তো বাইসিকেলের আরেক নাম শয়তানের গাড়ি।'

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশাওয়ার দিনের ১১৪ ডিগ্রী ভুলে গিয়ে মোলায়েম বাতাস দিয়ে সর্বাঙ্গের গ্লানি খেদ ঘুচিয়ে দেয়। রাস্তাঘাট যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে হাই তুলে ঘোড়ার গাড়ির খটখটানি দিয়ে তুড়ি দিতে থাকে। পাঠান বাবুরা তখন সাজগোজ করে হাওয়া খেতে বেরোন। পায়ে জরীর পয়জার, পরনে পপলিনের শিলওয়ার—তার ভাঁজ ধারালো ছুরির মত ক্রীজের দু'দিক বেয়ে কেতায় কেতায় নেমে এসেছে; মুড়ির ভিতরে লাল সুতোর গোলাপী আভা। গায়ে রঙিন সিল্কের লম্বা

শার্ট আর মাথায় যে পাগড়ি, তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো শিরাভরণের সঙ্গে হয় না। বাঙালীর শিরাভরণ দেখে অভ্যাস নেই; টুপি বলুন, হ্যাট বলুন, সবই যেন তার কাছে অবান্তর ঠেকে, মনে হয় বাইরে থেকে জোর করে চাপানো। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও ধনী পাঠানের পাগড়ি দেখে মনে হয় ভগবান মানুষকে মাথাটা দিয়েছেন নিতান্ত ঐ পাগড়ি জড়াবার উপলক্ষ্য হিসাবে।

কামিয়ে-জুমিয়ে গোঁফে আতর মেখে আর সেই ভুবনমোহন পাগড়ি বেঁধে খানসায়েব যখন সাঁঝের ঝোঁকে পেশাওয়ারের রাস্তায় বেরোন, তখন কে বলবে তিনি জাকারিয়া স্ট্রীটের পাঠানের জাতভাই; কোথায় লাগে তাঁর কাছে তখন হলিউডের ঈভনিঙ-ড্রেস পরা হীমেনদের দল?

ফুরফুরে হাওয়া গাছের মাথায় চিরুনি চালিয়ে, খানসায়েবদের পাগড়ির চুড়ো দুলিয়ে, ফুলের দোকানে ঝোলানো মালাতে কাঁপন লাগিয়ে আর সর্বশেষে আহমদ আলীর দু'কান-ছোঁয়া গোঁফে হাত বুলিয়ে নামল আমার শ্রান্ত ভালে—তপ্ত গ্রীষ্মের দগ্ধ দিনান্তের সন্ধ্যাকালে। এ যেন বাঙলাদেশের জ্যৈষ্ঠশেষের নববর্ষণ—শীতল জলধারার পরিবর্তে এ যেন মাতৃহস্তের স্নিগ্ধমন্দ মলয়ব্যজন। কোন এক নৃশংস ফারাওয়ের অত্যাচারে দিবাভাগে দেশের জনমানব প্রাণীপতঙ্গ দলে দলে ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়ে প্রহর গুণছিল, পশ্চিম-পিরামিডে তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-বাতাস যেন মোজেসের অভয়বাণী দিয়ে গেল—দিকে দিকে নতুন প্রাণের সাড়া—ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর।

কিন্তু জেগে উঠেই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন কি আহারের? রুটি আর কাবাবওয়ালার দোকানের সামনে কী অসম্ভব ভিড়! বোরকা-পরা মেয়ে, সবে হাঁটতে শিখেছে ছেলে, বাঁ হাত মরণের দিকে ডান হাত রুটিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে বুড়ো, সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে আহারের সন্ধানে। রুটিওয়ালা সেই ক্ষুধার্তদের শান্ত করার জন্য কাউকে কাতরকণ্ঠে ডাকে 'ভাই' কাউকে 'বরাদর' কাউকে 'জানে মন' (আমার জান), কাউকে 'আগা-জান'—পশতু, পাঞ্জাবী, ফার্সী, উর্দু চারটে ভাষায় সে একসঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। ওদিকে তন্দুরের ভিতর লম্বা লোহার আঁকশি চালিয়ে রুটি টেনে টেনে ওঠাচ্ছে রুটিওয়ালার ছোকরারা। গনগনে আগুনের টকটকে লাল আভা পড়েছে তাদের কপালে গালে। বড় বড় বাবরীচুলের জুলফি থেকে-থেকে চোখমুখ ঢেকে ফেলছে—দু'হাত দিয়ে রুটি তুলছে, সরাবার ফুরসৎ নেই। বুড়ো রুটিওয়ালার দাড়ি হাওয়ায় দুলছে, কাজের হিড়িকে তার বজ্রবাঁধন পাগড়ি পর্যন্ত টেরচা হয়ে একদিকে নেমে এসেছে—ছোকরাদের কখনো তম্বি করে, 'জুদ্ কুন্, জুদ্ কুন্, জলদি করো, জলদি করো,' খদ্দেরদের কখনো কাকুতি-মিনতি, 'হে ভ্রাতঃ, হে বন্ধু, হে আমার প্রাণ, হে আমার দিলজান, সবুর করো সবুর করো; তাজা গরম রুটি দিই বলেই তো এত হাঙ্গাম-হুজ্জৎ। বাসি দিলে কি এতক্ষণ তোমাদের দাঁড় করিয়ে রাখতুম?'

বোরকার আড়াল থেকে কে যেন বলল—বয়স বোঝার জো নেই—'তোর তাজা রুটি খেয়ে খেয়েই তো পাড়ার তিনপুরুষ মরল। তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে বাসি খাস? তাই দে না।'

বোরকা পরে, ঐ যা। তা না হলে পাঠান মেয়েও স্বাধীন।

রুটির পর ফুল কিংবা আতর। মনে পড়ল মহাপুরুষ মুহম্মদের একটি বচন—সত্যেন দত্তের তর্জমা।

> জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
> খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি।
> জুটে যায় যদি দুইটি পয়সা
> ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী।

পাঁচ

পাঠান অত্যন্ত অলস এবং আড্ডাবাজ, কিন্তু আরামপ্রয়াসী নয় এবং যেটুকু সামান্য তার বিলাস, তার খরচাও ভয়ঙ্কর বেশি কিছু নয়। দেশভ্রমণকারী গুণীদের মুখে শোনা যে, যাদের গায়ের জোর

যেমন বেশি, তাদের স্বভাবও হয় তেমনি শান্ত। পাঠানদের বেলায়ও দেখলুম কথাটা খাঁটি। কাগজে আমরা হামেশাই পাঠানদের লুটতরাজের কথা পড়ি—তার কারণও আছে। অনুর্বর দেশ, ব্যবসাবাণিজ্য করতে জানে না, পল্টনে তো আর তামাম দেশটা ঢুকতে পারে না, কাজেই লুটতরাজ ছাড়া অন্য উপায় কোথায়? কিন্তু পেটের দায়ে যে অপকর্ম সে করে, মেজাজ দেখাবার জন্য তা করে না। তার আসল কারণ অবশ্য পাঠানের মেজাজ সহজে গরম হয় না—পাঞ্জাবীদের কথা স্বতন্ত্র। এবং হলেও সে চট করে বন্দুকের সন্ধান করে না। তবে সব জিনিসেরই দুটো একটা ব্যত্যয় আছে—পাঠান তো আর খুদ খুদাতালার আপন হাতে বানানো ফরিস্তা নয়। 'বেইমান' বললে পাঠানের রক্ত খাইবার পাসের টেম্পারেচার ছাড়িয়ে যায়, আর ভাইকে বাঁচাবার জন্য সে অত্যন্ত শান্ত মনে যোগাসনে বসে আঙ্গুল গোনে, নিদেনপক্ষে তাকে ক'টা খুন করতে হবে। কিন্তু হিসেবনিকেশে সাক্ষাৎ বিদ্যেসাগর বলে প্রায়ই ভুল হয় আর দুটো-চারটে লোক বেঘোরে প্রাণ দেয়। তাই নিয়ে তম্বিতম্বা করলে পাঠান সকাতরে নিবেদন করে, 'কিন্তু আমার যে চার চারটে বুলেটের বাজে খরচা হল তার কী? তাদের গুষ্টি-কুটুম কান্নাকাটি করছে, কিন্তু একজনও একবারের তরে আমার বাজে খরচার খেসারতির কথা ভাবছে না। ইনসান বড়ই খুদপরস্ত—সংসার বড়ই স্বার্থপর।'

পরশু রাতের দাওয়াতে এ রকম নানা গল্প শুনলুম। এসব গল্প বলার অধিকার নিমন্ত্রিত ও রবাহূতদের ছিল। একটা জিনিসে বুঝতে পারলুম যে, এঁদের সকলেই খাঁটি পাঠান।

সে হল তাদের খাবার কায়দা। কার্পেটের উপর চওড়ায় দুহাত, লম্বায় বিশ-ত্রিশহাত— প্রয়োজন মত— একখানা কাপড় বিছিয়ে দেয়। সেই দস্তরখানের দুদিকে সারি বেঁধে এক সারি অন্য সারির মুখোমুখি হয়ে বসে। তারপর সব খাবার মাঝারি সাইজের প্লেটে করে সেই দস্তরখানে সাজিয়ে দেয়; তিন থালা আলু-গোস্ত, তিন থালা শিককাবাব, তিন থালা মুর্গী-রোস্ট, তিন থালা সিনা-কলিজা, তিন থালা পোলাও, এই রকম ধারা সব জিনিস একখানা দস্তরখানের মাঝখানে, দুখানা দুই প্রান্তে। বাঙালী আপন আপন থালা নিয়ে বসে; রান্নাঘরের সব জিনিসই কিছু না কিছু পায়। পাঠানদের বেলা তা নয়। যার সামনে যা পড়ল, তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট। প্রাণ গেলেও কেউ কখনো বলবে না, আমাকে একটু মুর্গী এগিয়ে দাও, কিম্বা আমার শিককাবাব খাবার বাসনা হয়েছে। মাঝে মাঝে অবিশ্যি হঠাৎ কেউ দরদ দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আরে হোথায় দেখো গোলাম মুহম্মদ ট্যাড়শ চিবোচ্ছে, ওকে একটু পোলাও এগিয়ে দাও না'—সবাই তখন হাঁ-হাঁ করে সব ক'টা পোলাওয়ের থালা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর মজলিস গালগল্পে ফের মশগুল। ওদিকে গোলাম মুহম্মদ শুকনো পোলাওয়ের মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মারা গেল, না মাংসের থৈ-থৈ ঝোলে ডুবে গিয়ে প্রাণ দিল, তার খবর ঘণ্টাখানেক ধরে আর কেউ রাখে না। এবং লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, পাঠান আড্ডা জমাবার খাতিরে অনেক রকম আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। গল্পের নেশায় বেখেয়ালে অন্তত আধ ডজন অতিথি শুদ্ধ শুকনো রুটি চিবিয়েই যাচ্ছে, চিবিয়েই যাচ্ছে। অবচেতন ভাবটা এই, পোলাও-মাংস বাছতে হয়, দেখতে হয়, বহুৎ বায়নাক্কা, তাহলে লোকের মুখের দিকে তাকাব কী করে, আর না তাকালে গল্প জমবেই বা কী করে!

অথচ এরা সবাই ভদ্রসন্তান, দু' পয়সা কামায়ও বটে। বাড়িতে নিশ্চয়ই পছন্দমাফিক পোলাও কালিয়া খায়। কিন্তু পাঠান জীবনের প্রধান আইন, একলা বসে নবাবী খানা খাওয়ার চেয়ে ইয়ারবক্সীর সঙ্গে শুকনো রুটি চিবনো ভালো। ওমর খৈয়ামও বলেছেন—

তব সাথী হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ ভুলে তবু মরি
তোমারে ছাড়িয়া মসজিদে গিয়া
কী হবে মন্ত্র স্মরি?

কিন্তু ওমর বুর্জুয়া কবির বিদগ্ধ পদ্ধতিতে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পাঠান ভাঙা ভাঙা

উর্দুতে ঐ একই আপ্তবাক্য প্রলেতারিয়া কায়দায় জানায়—

'দোস্ত!

তুমহারী রোটি, হমারা গোস্ত!'

অর্থাৎ 'নেমন্তন্ন করেছ সেই আমার পরম সৌভাগ্য। শুধু শুকনো রুটি? কুছ পরোয়া নেহি। আমি আমার মাংস কেটে দেব।'

কাব্যজগতে যে হাওয়া বইছে, তাতে মনে হয়, ওমরের শরাবের চেয়ে মজুরের ধেনোর কদর বেশি।

তবে একটা কথা বলে দেওয়া ভালো। পাঠানের ভিতর বুর্জুয়া প্রলেতারিয়ায় যে তফাৎ, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। অনুভূতির জগতে তারা একই মাটির আসনে বসে, আর চিন্তাধারায় যে পার্থক্য সে শুধু কেউ খবর রাখে বেশি, কেউ কম। কেউ শেক্সপীয়র পড়েছে, কেউ পড়েনি। ভালমন্দ বিচার করার সময় দুই দলে যে বিশেষ প্রভেদ আছে, মনে হয়নি। আচার-ব্যবহারে এখনো তারা গুষ্টির ঐতিহ্যগত সনাতন দান-দেওয়া-নেওয়ার পন্থা অনুসরণ করে।

এসব তত্ত্ব আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ইসলামিয়া কলেজের এক অধ্যাপক। অনেকক্ষণ ধরে নানা রঙে, নানা দাগ কেটে সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করে বললেন—

'এই ধরুন আমার সহকর্মী অধ্যাপক খুদাবখ্শের কথা। ইতিহাসে অগাধ পণ্ডিত। ইহসংসারে সব কিছু তিনি অর্থনীতি দিয়ে জলের মত তরল করে এই তৃষ্ণার দেশে অহরহ ছেলেদের গলায় ঢালছেন। ধর্ম পর্যন্ত বাদ দেন না। যীশু খ্রীস্ট তাঁর ধর্ম আরম্ভ করেছিলেন ধনের নবীন ভাগবণ্টনপদ্ধতি নির্মাণ করে; তাতে লাভ হওয়ার কথা গরীবেরই বেশি—তাই সবচেয়ে দুঃখী জেলেরা এসে জুটেছিল তাঁর চতুর্দিকে। মহাপুরুষ মুহম্মদও নাকি সুদ তুলে দিয়ে অর্থবণ্টনের জমিকে আরবের মরুভূমির মত সমতল করে দিয়েছিলেন। এসব তো ইহলোকের কথা—পরলোক পর্যন্ত খুদাবখ্শ অর্থনৈতিক রাঁদা চালিয়ে চিক্কণ মসৃণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু থাক এসব কচকচানি—মোদ্দা কথা হচ্ছে ভদ্রলোক ইতিহাসের দূরবীনে আপন চোখটি এমনি চেপে ধরে আছেন যে আর কিছু তাঁর নজরে পড়ে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সকলের মনে গভীর সন্দেহ ছিল।

'মাসখানেক পূর্বে তাঁর বড় ছেলে মারা গেল। ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ত, মেধাবী ছেলে, বাপেরই মত পড়াশুনায় মশগুল থাকত। বড় ছেলে মারা গিয়েছে, চোট লাগার কথা, কিন্তু খুদাবখ্শ নির্বিকার। সময়মত কলেজে হাজিরা দিলেন। চায়ের সময় আমরা সন্তর্পণে শোক নিবেদন করতে গিয়ে আরেক প্রস্থ লেকচর শুনলুম, জরথুস্ত্র কোন অর্থনৈতিক কারণে রাজা গুশ্‌তআস্‌প্‌কে তাঁর নতুন ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তিন দিন বাদে দুসরা ছেলে টাইফয়েডে মারা গেল—খুদাবখ্শ বৌদ্ধ ধর্মের কী এক পিটক, না খোদায় মালুম কী, তাই নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এক মাস যেতে না যেতে স্ত্রী মারা গেলেন পিত্রালয়ে—খুদাবখ্শ তখন সিন্ধুর পারে পারে সিকন্দর শাহের বিজয়পন্থার অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধানে নাক-কান বন্ধ করে তুরীয়ভাব অবলম্বন করেছেন।

'আমরা ততদিনে খুদাবখ্শের আশা ছেড়ে দিয়েছি। লোকটা ইতিহাস করে করে অমানুষ হয়ে গিয়েছে এই তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আর পাঠানসমাজ যখন মনুষ্যজাতির সর্বোচ্চ গৌরবস্থল, তখন আর কী সন্দেহ যে খুদাবখ্শের পাঠানত্ব সম্পূর্ণ কর্পূর হয়ে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক টেলিস্কোপের পাল্লারও বহু ঊর্ধ্বে দূরদূরান্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত কোন সূক্ষ্মলোকে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

'এমন সময় মারা গেল তাঁর ছোট ভাই—পল্টনে কাজ করত। খুদাবখ্শের আর কলেজে পাত্তা নেই। আমরা সবাই ছুটে গেলুম খবর নিতে। গিয়ে দেখি এক প্রাগৈতিহাসিক ছেঁড়া গালচের উপর খুদাবখ্শ গড়াগড়ি দিচ্ছেন। পুথিপত্র, ম্যাপ, কম্পাস চতুর্দিকে ছড়ানো। গড়াগড়িতে চশমার একটা পরকলা ভেঙে গিয়েছে। খুদাবখ্শের বুড়ো মামা বললেন, দু'দিন ধরে জলস্পর্শ করেননি।

'হাউহাউ করে কাঁদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।' শোকে যে মানুষ এমন বিকল হতে পারে পূর্বে আর কখনো দেখিনি। আমরা সবাই নানারকমের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু খুদাবখ্‌শের মুখে ঐ এক কথা, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।'

'শেষটায় থাকতে না পেরে আমি বললুম, আপনি পণ্ডিত মানুষ, শোকে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আর আপনার সহ্য করবার ক্ষমতা যে কত অগাধ সে তো আমরা সবাই দেখেছি—দুটি ছেলে, স্ত্রী মারা গেলেন, আপনাকে তো এতটুকু কাতর হতে দেখিনি।

'খুদাবখ্‌শ আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু মুখে কথা ফুটল। বললেন, 'আপনি পর্যন্ত এই কথা বললেন? ছেলে মরেছিল তো কী? আবার ছেলে হবে। বিবি মরেছেন তো কী? নতুন শাদী করব। কিন্তু ভাই পাব কোথায়?' তারপর আবার হাউহাউ করে কাঁদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।'

অধ্যাপক বলা শেষ করলে আমি বললুম, 'লক্ষ্মণের মৃত্যুশোকে রামচন্দ্রও ঐ বিলাপ করেছিলেন।'

আহমদ আলী বললেন, 'লছ্‌মন? রামচন্দরজী? হিন্দুদের কী একটা গল্প আছে না? সেইটে আমাদের শুনিয়ে দিন। আপনি কখনো গল্প বলেন না, শুধু শোনেনই।'

ইয়া আল্লা! আদি কবি বাল্মীকি যে গল্প বলেছেন আমাকে সে গল্প নতুন করে আমার টৌটাফুটা উর্দু দিয়ে বলতে হবে! নিবেদন করলুম, 'অধ্যাপক খুদাবখ্‌শকে অনুরোধ করবেন। রামায়ণের নাকি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও আছে।'

অধ্যাপক শুধালেন, 'কিন্তু রামচন্দরজী জবরদস্ত লড়নেওয়ালা ছিলেন, নয় কি?'

আমি বললুম, 'আলবাৎ।'

অধ্যাপক বললেন, 'ঐ তো হল আসল তত্ত্বকথা। বীরপুরুষ আর বীরের জাতমাত্রই ভাইকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসে। পাঠানদের মত বীরের জাত কোথায় পাবেন বলুন?'

আমি বললুম, 'কিন্তু অধ্যাপক খুদাবখ্‌শ তো বীরপুরুষ ছিলেন না।'

অধ্যাপক পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললেন, 'সেই তো গুহ্যতর তত্ত্ব। অধ্যাপকি করো আর যাই করো, পাঠানত্ব যাবে কোত্থেকে? অর্থনৈতিক কারণ-ফারণ সব কিছুই অত্যন্ত পাতলা ফিলিম—একটু খোঁচা লাগলেই আসল পেলেট্ বেরিয়ে পড়ে।'

মেজর মুহম্মদ খান বললেন, 'ভাইকে ভালবাসার জন্য পাঠান হওয়ার কী প্রয়োজন? ইউসুফও (জোসেফ) তো বেনয়ামিনকে (বেনজামিন) ভয়ঙ্কর ভালবাসতেন।'

অধ্যাপক বললেন, 'ইহুদিদের কথা বাদ দিন। আদমের এক ছেলে আরেক ছেলেকে খুন করেনি?'

আমি বললুম, 'কিন্তু পাঠানরা ইহুদিদের হারিয়ে যাওয়া বারো উপজাতির একটা নয়? কোথায় যেন ঐ রকম একটা থিয়োরি শুনেছি যে সেই উপজাতি যখন দেখল তাদের কপালে শুকনো, মরা আফগানিস্থান পড়েছে তখন হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল—অর্থাৎ ফরাসীতে যাকে বলে 'ফগান' করেছিল—তাই তো তাদের নাম 'আফগান।' আর আপনারা তো আসলে আফগান, এদেশে বসবাস করে হিন্দুস্থানী হয়েছেন।'

অধ্যাপক পণ্ডিতের হাসি হেসে বললেন, 'ত্রিশ বৎসর আগে এ কথা বললে আপনাকে আমরা সাবাসী দিতুম, এখন ওসব বদলে গিয়েছে। তখনো আমরা জানতুম না যে, দুনিয়ার বড় বড় জাতেরা নিজেদের 'আর্য' বলে গৌরব অনুভব করছে। তখনো রেওয়াজ ছিল খানদানী হতে হলে বাইবেলের ইহুদি চিড়িয়াখানার কোনো না কোনো খাঁচায় সিংহ বাঁদর কিছু না কিছু একটা হতেই হবে। এখন সে সব দিন গিয়েছে—এখন আমরা সব্বাই 'আর্য'। বেদ-ফেদ কী সব আছে না?—সেগুলো সব আমরাই আউড়েছি। সিকন্দর শাহকে লড়াইয়ে আমরাই হারিয়েছি আর গান্ধার ভাস্কর্য আমাদেরই কাঁচা হাত মক্সোর নমুনা। 'গান্ধার' আর 'কান্দাহার' একই শব্দ। আরবী ভাষায় 'গ' অক্ষর নেই বলে আরব

ভৌগোলিকেরা 'ক' ব্যবহার করেছেন।'

পাণ্ডিত্যের অগাধ সাগরে তখন আমার প্রাণ যায় যায়। কিন্তু বিপদ-আপদে মুস্কিল-আসান হামেশাই পুলিশ। আহমদ আলী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রফেসরের ওসব কথা গায়ে মাখবেন না। ইসলামিয়া কলেজের চায়ের ঘরে যে আড্ডা জমে তারি খানিকটে পেত্‌লে নিয়ে তিনি সুন্দর ভাষায় রঙীন গেলাসে আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন। কিন্তু আসল পাঠান এসব জিনিস নিয়ে কক্‌খনো মাথা ঘামিয়ে পাগড়ির প্যাঁচ ঢিলে করে না। আফ্রিদী ভাবে, আফ্রিদী হল দুনিয়ার সেরা জাত; মোমন্দ বলে বাজে কথা, খুদাতালার খাস পেয়ারা কোনো জাত যদি দুনিয়ায় থাকে তবে সে হচ্ছে মোমন্দ জাত। এমন কি, তারা নিজেদের আফগান বলেও স্বীকার করে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই বুঝি আপনারা স্বাধীন আফগানিস্থানের অংশ হতে চান না? ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে স্বাধীন পাঠান হয়ে থাকবেন বলে?'

সব পাঠান এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'আলবাৎ না; আমরা স্বাধীন ফ্রন্টিয়ার হয়ে থাকব—সে মুল্লুকের নাম হবে পাঠান-মুল্লুক।'

অধ্যাপক বললেন, 'পাঠানের সোপবক্স লেকচার শোনেননি বুঝি কখনো? সে বলে, 'ভাই পাঠানসব, এস আমরা সব উড়িয়ে দিই; ডিমোক্রেসি, অটোক্রেসি, ব্যুরোক্রেসি, কম্যুনিজম, ডিক্‌টে-টরশিপ—সব সব।' আরেক পাঠান তখন চেঁচিয়ে বলল, 'তুই বুঝি অ্যানার্কিস্ট?' পাঠান বলল, 'না, আমরা অ্যানার্কিও উড়িয়ে দেব।'

অধ্যাপক বললেন, 'বুঝতে পেরেছেন?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপর 'না' হয়ে যাবে।' এই তো?'

অধ্যাপক বললেন, 'ঠিক ধরেছেন।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষের অংশ যখন হবেন না, তখন দয়া করে রাশানদের আপনারাই ঠেকিয়ে রাখবেন।'

সবাই সমস্বরে বললেন, 'আলবাৎ।'

ছয়

পৃথিবীর আর সব দেশে যেতে হলে একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করে যে কোনো বন্দরে গিয়ে হাজির হলেই হল। আফগানিস্থান যেতে হলে সেটি হবার যো নেই। পেশাওয়ার পৌঁছে আবার নতুন স্ট্যাম্পের প্রয়োজন। সে-ও আবার তিন দিন পরে নাকচ হয়ে যায়। খাইবারপাসের আশেপাশে কখন যে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে যায় তার স্থিরতা নেই বলেই এই বন্দোবস্ত। আবার এই তিন দিনের মেয়াদি স্ট্যাম্প সত্ত্বেও হয়ত খাইবারের মুখ থেকে মোটর ফিরিয়ে দিতে পারে—যদি ইতিমধ্যে কোনো বখেড়া লেগে গিয়ে থাকে।

সেই স্ট্যাম্প নিয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় দেখি হরেক রকম বিদেশী লোকে ভর্তি কতকগুলো বাস্ পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এগুলো কোথায় যাচ্ছে?'

তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'এগুলো কাবুল যায় না।' তারপর অন্য কথা পাড়বার জন্য বললেন, 'বাঙলাদেশের একটা গল্প বলুন না।'

আমি মনে মনে বললুম, আচ্ছা তবে শোন। বাইরে বললুম, 'গল্প বলা আমার আসে না, তবে একটা জিনিসে পাঠানে-বাঙালীতে মিল দেখতে পেয়েছি সেইটে আপনাকে বলছি, শুনুন—

এখানে যে রকম সব কারবার পাঞ্জাবী আর শিখদের হাতে কলকাতায়ও কারবার বেশির ভাগ অবাঙালীর হাতে। আর বাঙালী যখন ব্যবসা করে তখন তার কায়দাও আজব।

আমি তখন ইলিয়ট রোডে থাকতুম, সেখানে দোকানপাট ফিরিঙ্গিদের। মুসলমানদের কিছু কিছু দর্জীর দোকান আর লন্ড্রি, ব্যস। তার মাঝখানে এক বাঙালী মুসলমান ঝা চকচকে ফ্যান্সি দোকান খুলল। লোকটির বেশভূষা দেখে মনে হল, শিক্ষিত, ভদ্রলোকের ছেলে। স্থির করলুম, সাহস করে দোকান যখন খুলেছে তখন তাকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

জোর গরম পড়েছে—বেলা দুটো। শহরে চর্কিবাজীর মত ঘুরতে হয়েছে—দেদার সাবান চোখে পড়েছে কিন্তু কিনিনি—ভদ্রলোকের ছেলেকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

ট্রাম থেকে নেমে দোকানের সামনে এসে দেখি ভদ্রলোক নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন, পাখিটা খাঁচায় ঘুমুচ্ছে, ঘড়িটা পর্যন্ত সেই যে বারোটায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, এখনো জাগেনি।

আমি মোলায়েম সুরে বললুম, ও মশাই, মশাই।

ফের ডাকলুম, ও সায়েব, সায়েব।

কোনো সাড়াশব্দ নেই। বেজায় গরম, আমারও মেজাজ একটু একটু উষ্ণ হতে আরম্ভ করেছে। এবার চেঁচিয়ে বললুম, ও মশাই, ও সায়েব!

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বোয়াল মাছের মত দুটি রাঙা টকটকে চোখ সিকিটাক খুলে বললেন, আজ্ঞে? তারপর ফের চোখ বন্ধ করলেন।

আমি বললুম, সাবান আছে? পামওলিভ সাবান?

চোখ বন্ধ রেখেই উত্তর দিলেন, না।

আমি বললুম, সে কী কথা, ঐ তো রয়েছে শো-কেশে।

ও বিক্কিরির না।—'

তারপর আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'পাঠানরাও বুঝি এই রকম ব্যবসা করে?' তিনি তো খুব খানিকক্ষণ ধরে হাসলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বলুন তো?'

আমি উত্তর দিলুম, 'ঐ যে বললেন এসব বাস কাবুল যায় না।'

এবার আহমদ আলী থমকে দাঁড়ালেন। দেওয়ালের দিকে ঘুরে, কোমরে দু'হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঠা-ঠা করে হাসলেন। সে তো হাসি নয়—হাসির ধমক। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি কখন তাঁর হাসি থামবে। উত্তর দিলেন ভালো। বললেন, 'এসব বাস খাইবারপাস অবধি গিয়েই ব্যস।'

আমি শুধালুম, 'এই সামান্য রসিকতায় আপনি এত প্রচুর হাসতে পারেন কী করে?'

'কেন পারব না? হাসি কি আর গল্পে ঠাসা থাকে, হাসি থাকে খুশ-দিলে। আপনাকে বলিনি স্বাধীনতা কোথায় বাসা বেঁধে থাকে? রাইফেলে নয়, বুকের খুনে। একটা গল্প শুনবেন? ঐ দেখছেন, হোথায় চায়ের দোকানী বটতলায় বেঞ্চি পেতে দিয়েছে। চলুন না।'

পাঠান মাত্রই মারাত্মক ডিমোক্র্যাট। নির্জলা টাঙাওয়ালা বিড়িওয়ালার চায়ের দোকান।

আহমদ আলী তাঁর বিশাল বপুখানার ওজন সম্বন্ধে সচেতন বলে খুঁটির উপর ভর দিয়ে বসলেন, আমি আমার তনুখানা যেখানে খুশি রাখলুম। বললেন—

'ওমর খৈয়ামের এক রাত্রে বড্ড নেশা পেয়েছে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পাঁচখানা রুবাইয়াৎ শেষ না করে উঠবেন না। জানেন তো কীরকম ঠাসবুনুনির কবিতা—শেষ করতে করতে রাত প্রায় কাবার হয়ে এল। মদের দোকানে যখন পৌঁছলেন তখন ভোর হব হব। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'নিয়ে এস তো হে, এক পাত্তর উৎকৃষ্ট শিরাজী!' মদওয়ালা কাচুমাচু হয়ে বলল, 'হুজুর এত দেরিতে এসেছেন, রাত কাবারের সঙ্গে সঙ্গে মদও কাবার হয়ে গিয়েছে।' ওমর নরম হয়ে বললেন, 'শিরাজী নেই তো অন্য কোনো মাল দাও না।' মদওয়ালা বলল, 'শরম কী বাৎ। কিচ্ছু নেই হুজুর।' ওমর বললেন, 'পরোয়া নদারদ, ঐ যে এঁটো পেয়ালাগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে সেগুলো ধুয়ে তাই দাও দিকিনি— নেশার জিম্মাদারি আমার।'

হিম্মতের জিম্মাদারি, হাসির জিম্মাদারি, নেশার জিম্মাদারি কীসে কার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বেই দেখতে পেলুম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সেই ভেজাল পাঠান—তাঁর ভ্রাত্য-দোষ, তিনি তিন মাস লাহোরে কাটিয়েছিলেন—রমজান খান। আমি আহমদ আলীকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালুম। আর যায় কোথায়?' ও রমজান খান, জামে মন্, বরাদরে মন্, এদিকে এসো।' আমাকে তম্বি করে বললেন, 'আশ্চর্য লোক, আমি না ডাকলে আপনি ওকে যেতে দিতেন? এই গরমে? লোকটা সর্দিগর্মি হয়ে মারা যেত না? আল্লা রসুলের ডর-ভয় নেই?'

রমজান খান এসে বললেন, 'ভগিনীপতির অসুখ, তার করতে যাচ্ছি।' বলেই ঝুপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। আহমদ আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হবে, হবে, সব হবে। টেলিগ্রাফের তার শক্ত মালে তৈরি—দু'চার ঘণ্টায় ক্ষয়ে যাবে না। সুখবর শোনো। সৈয়দ সাহেব একখানা বহুৎ উমদা গল্প পেশ করেছেন।' বলে তিনি আমার কাঁচাসিদ্ধ গল্পে বিস্তর টমাটো-সস্ আর উস্টার-সস্ ঢেলে রমজান খানকে পরিবেশন করলেন। বারে বারে বলেন 'ও সাহেব বিক্‌কিরির না—এ বাস কাবুল যায় না।' এ যেন বাঙলাদেশের পুব আকাশে সূর্যোদয় আর পেশাওয়াবের পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেল। হুবহু একই রঙ।

রমজান খান বললেন, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু বাঙালী আর পাঠানে একটা জায়গায় সখৎ গরমিল আছে।'

আমি শুধালুম, 'কীসে?'

রমজান খান বললেন, 'আমি সিন্ধুনদ পেরিয়ে আহমদ আলীর নজরে যে মহাপাপ করেছি এটা সেই সিন্ধুপারের কাহিনী তবে আটকের কাছে নয়, অনেক দক্ষিণে—সেখানে সিন্ধু বেশ চওড়া। তারি বালুচরে বসে দুপুর রোদে আটজন পাঠান ঘামছে। উট ভাড়া দিয়ে তারা ছিয়ানব্বুই টাকা পেয়েছে, কিন্তু কিছুতেই সমানসমান ভাগ বাঁটোয়ারা কবতে পারছে না। কখনো কারো হিস্যায় কম পড়ে যায়, কখনো কিছু টাকা উপরি থেকে যায়। ক্রমাগত নতুন করে ভাগ হচ্ছে, হিসেব মিলছে না, ঘাম ঝরছে আর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গলাও চড়ছে। এমন সময় তারা দেখতে পেল, অন্য পার দিয়ে এক বেনে তার পুঁটলি হাতে করে যাচ্ছে। সব পাঠান এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বেনেকে ডাকল, এপারে এসে তাদের টাকার ফৈশালা করে দিয়ে যেতে। বেনে হাত-পা নেড়ে বোঝালো অত মেহন্নত তার সইবে না, আর কত টাকা ক'জন লোক তাই জানতে চাইল। চার কুড়ি দশ ও তার উপরে ছয় টাকা আর হিস্যেদার আটজন। বেনে বলল, 'বারো টাকা করে নাও।' পাঠানরা চেঁচিয়ে বলল, 'তুই একটু সবুর কর, আমরা দেখে নিচ্ছি বখরা ঠিক ঠিক মেলে কি না।' মিলে গেল—সবাই অবাক। তখন তাদের সর্দার চোখ পাকিয়ে বলল, 'এতক্ষণ ধরে আমরা চেষ্টা করলুম, হিসেব মিলল না; এখন মিলল কী করে? ব্যাটা নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরিয়ে নিয়ে হিসেব মিলিয়ে দিয়েছে। ওপার থেকে সে যখন হিসেব মেলাতে পারে তখন নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরাতেও পারে। পাকড়ো শালাকো!'

রমজান খান বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, পরোপকার করতে গিয়ে বেনের পো'র অবস্থা। ভাগ্যিস সিন্ধু সেখানে চওড়া এবং বেনেরা আর কিছু পারুক না পারুক, ছুটতে পারে আরবী ঘোড়ার চেয়েও তেজে। সে-যাত্রা বেনে বেঁচে গেল।'

আমি বললুম, 'গল্পটি উপাদেয়, কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে [illegible] গরমিলের এতে আছে কোন চীজ?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালী আপন দেশে বসে, এভা[illegible]ের গায়ে ফিতে না লাগিয়ে, চুড়োয় চড়তে গিয়ে খামখা জান না দিয়ে ইংরেজকে বাৎলে দেয় নি, ঐ দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়?'

আমি বললুম, 'হাঁ, কিন্তু নাম হয়েছে ইংরেজের।'

আহমদ আলী শুধালেন, 'তাই বুঝি বাঙালী চটে গিয়ে ইংরেজকে বোমা মারে?'

আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকে বললুম, 'সেও একটা অতি সূক্ষ্ম কারণ বটে, তবে কিনা শিকদার

এভারেস্ট সায়েবকে বোমা মারেননি।'

রমজান খান উষ্মা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু মারা উচিত ছিল।'

আমি বললুম, 'হুঁ, কিন্তু একটু সামান্য টেকনিকাল মুশকিল ছিল। নামকরণ যখন হয়, শিকদার তখন কলকাতায় আর মহামান্য স্যার জর্জ লণ্ডনে পেনসন টানছেন। পাল্লাটা—'

পুরো পাঠান এবং নিমপাঠান এক সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। শুধালেন, 'তার মানে? তবে কি ও লোকটার তদারকিতেও এভারেস্ট মাপা হয়নি?

আমি বললুম, 'না। কিন্তু আপনারা এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? এই আপনাদের ভাইবেরাদরই কতবার কাবুল দখল করেছেন আমার ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু এই কথাটা মনে গাঁথা আছে যে, নাম হয়েছে প্রতিবারেই ইংরেজের। আর আপনারা যখনই হাত গুটিয়ে বসেছিলেন তখনই হয় ইংরেজ কচুকাটা হয়ে মরেছে, নয় আপনাদের বদনাম দিয়ে নিজের অপমান জালার মত মোটা মোটা মেডেল পরে ঢেকেছে। এই গেলবারে যখন দু'খানা আকবরশাহী কামান আর তিনখানা জাহাঙ্গিরী বন্দুক দিয়ে আমান উল্লা ইংরেজকে তুলোধোনা করে ছাড়লেন, তখন ইংরেজ তামাম দুনিয়াকে ঢাক পিটিয়ে শোনায়নি যে, পাঠানের ফেরেব্বাজিতেই তারা লড়াই হারল?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালী এত খবর রাখে কেন?'

আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে না করেন, আর গোস্তাকি বেয়াদবি মাফ করেন, তবে সবিনয় নিবেদন, আপনারা যদি একটু বেশি খবর রাখেন তা হলে আমরা নিষ্কৃতি পাই।'

দু'জনেই চুপ করে শুনলেন। তারপর আহমদ আলী বললেন, 'সৈযদ সায়েব, কিছু মনে করবেন না। আপনারা বোমা মারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন চালান, ইংরেজ আপনাদের ভয়ও করে। এসব তো আরম্ভ হয়েছে মাত্র সেদিন। কিন্তু বলুন তো, যেদিন দুনিয়ার কেউ জানত না ফ্রন্টিয়ার বলে এক ফালি পাথরভর্তি শুকনো জমিতে একদল পাহাড়ী থাকে সেদিন ইংরেজ তাদের মেরে শেষ করে দিত না, যদি পারত? ফসল ফলে না, মাটি খুঁড়লে সোনা চাঁদি কয়লা তেল কিছুই বেরোয় না, এক ফোঁটা জলের জন্য ভোর হবার তিন ঘণ্টা আগে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি থেকে বেরোয়, এই দেশ কামড়ে ধরে পড়ে আছে মূর্খ পাঠান, কত যুগ ধরে, কত শতাব্দী ধরে কে জানে? সিন্ধুর ওপারে যখন বর্ষায় বাতাস পর্যন্ত সবুজ হয়ে যায় তখন তার হাতছানি পাঠান দেখেনি? পূরবৈয়া ভেজা ভেজা হাওয়া অদ্ভুত মিঠে মিঠে গন্ধ নিয়ে আসে, আজ পর্যন্ত কত জাত তার নেশায় পাগল হয়ে পুব দেশে চলে গিয়েছে—যায়নি শুধু মূর্খ আফ্রিদী, মোমন্দ।

'লড়াই করে যখন ইংরেজ এদেশকে উচ্ছন্ন করতে পারল না তখন সে প্রলোভন দেখায়নি? লাখ লাখ লোক পল্টনে ঢুকল। ইংরেজের ঝাণ্ডা এদেশে উড়ল বটে, কিন্তু তার রাজত্ব ঐ ঝাণ্ডা যতদূর থেকে দেখা যায় তার চেয়েও কম। আর পল্টনে না ঢুকে পাঠান করতই বা কী? পাঠানমোগল আমলে তাদের ভাবনা ছিল না। পল্টনের দরওয়াজা খোলা, অথচ মোগলপাঠান এই গরীব দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঢুকে বুড়োর রুটি কাড়তে চায়নি, বউঝিকে বিদেশী হারাম কাপড় পরাতে চায়নি। শাহানশাহ বাদশাহ দীনদুনিয়ার মালিক দিল্লির তখ্‌তনশীন সরকার-ই-আলা যখন হিন্দুস্থানের গরম বরদাস্ত না করতে পেরে এদেশ হয়ে ঠাণ্ডা সবুজ মোলায়েম কাবুল শহর যেতেন পাঠান তখন তাঁকে একবার তসলীম দিতে আসত। শাহানশাহ খুশ, পাঠান তর। বাদশাহের মীর-বখশী পিছনের তাঞ্জাম থেকে মুঠা মুঠা আশরফী রাস্তার দুদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন। 'জিন্দাবাদ শাহানশাহ জহানপনা' চিৎকার খাইবারের দুদিকের পাহাড়ে টক্কর খেয়ে খেয়ে আকাশ বিদীর্ণ করে খুদাতালার পা-দানে গিয়ে যখন পৌঁছত তখন সে প্রশংসাধ্বনি লক্ষ কণ্ঠের নয়, কোটি কোটি কণ্ঠের। সে আশরফী আজ নেই, পর্বতগাত্রে প্রশংসা-রব প্রতিধ্বনিত হয় না, কিন্তু ঐ পাথরের টুকরোগুলো পাষাণ পাঠান আপন ছাতির খুন দিয়ে এখনো স্বাধীন রেখেছে। তাই তার নাম এখনো ' নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ড।' পাঠান আর কী করতে পারত, বলুন।'

আমি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বারবার আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'আমি সে অর্থে কথাটা বলিনি। আমি ভদ্রসন্তানদের কথা ভাবছিলুম এবং তাঁরাও কিছু কম করেননি। তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ না করলে পাঠান সেপাই হয়তো আমান উল্লার বিরুদ্ধে লড়ত।'

আহমদ আলী বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের কথা বাদ দিন। এই অপদার্থ শ্রেণী যত শীঘ্র মরে ভূত হয়ে অজরঈলের দফতরে গিয়ে হাজিরা দেয় ততই মঙ্গল।'

রমজান খান আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের লড়ার কায়দা আর পাঠান সিপাইদের লড়ার কায়দা তো আর এক ধরনের হয় না। সময় যেদিন আসবে তখন দেখতে পাবেন আমাদের অপদার্থ আহমদ আলী কোন দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

আমি আহমদ আলীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালুম। আহমদ আলী বললেন, 'আমি সব কথা ভালো করে শুনতে পাইনে। একটু কালা—খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

সাত

আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে 'ইয়োম্ উস্ সফ্‌র্, নিস্‌ফ্ উস্ সফ্‌র্'—অর্থাৎ কিনা 'যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ।' পূর্ব বাঙলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়, 'উঠোন সমুদ্র পেরলেই আধেক মুশকিল আসান।' আহমদ আলীর উঠোন পেরতে গিয়ে আমার পাক্কা সাতদিন কেটে গেল। আট দিনের দিন সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্য বিস্তর দিব্যদিলাশা দিয়ে বিদায় নিলেন। হাওড়া স্টেশনে মনে হয়েছিল 'আমি একা,' এখন মনে হল 'আমি ভয়ঙ্কর একা।' 'ভয়ঙ্কর একা' এই অর্থে যে 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড'ই বলুন আর খাস আফগানিস্থানই বলুন এসব জায়গায় মানুষ আপন আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত। শুনেছি, কাবুলের বাইরেও নাকি পুলিশ আছে, কিন্তু আফগান আইনে খুন পর্যন্ত এখনো ঠিক 'কগনিজেবল অফেন্‌স্' নয়। রাহাজানির সময় যদি আপনি পাঠানী কায়দায় চটপট উবুড় হয়ে শুয়ে না পড়েন তাহলে সে ভুল অথবা গোঁয়ার্তুমির খেসারতি দেবেন আপনি। রাস্তাঘাটে কী করে চলতে হয় তার তালিম দেওয়া তো আর আফগান সরকারের জিম্মায় নয়। 'কীপ টু দি লেফ্‌ট' তো আর ইংরেজ সরকার আপনাকে ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে শেখায় না। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, আপনি যদি প্রাণটা নিতান্তই দিয়ে দেন তাবে আপনার আত্মীয়স্বজন তো রয়েছেন—তাঁরা খুনের বদলাই নিলেই তো পারেন। একটা বুলেটের জন্য তো আর তালুকমুলুক বেচতে হয় না, পারমিটও লাগে না।

সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি এসব দেশে এরকম কথাই কয়। তবু আফগানিস্থান স্বাধীন সভ্য দেশ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুন খারাবির প্রতি এত বেমালুম উদাসীন নয় তখন তাদেরও তো কিছু একটা করবার আছে এই ভেবে দু'চারটে পুলিশ দু-একদিন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করে যায়। যদি দেখে আপনার আত্মীয়স্বজন 'কা তব কান্তা' দর্শনে বুঁদ হয়ে আছেন অথবা শোনে যে খুনী কিম্বা তার সুচতুর আত্মীয়স্বজন আপনার আত্মীয়স্বজনকে চাকচিক্যময় বিশেষ বিরল ধাতুদ্বারা নাক কান চোখ মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, তাঁরা জীবনের এই তিনদিনের মুসাফিরীতে কে দু' ঘণ্টা আগে গেল, কে দু' ঘণ্টা পরে গেল, কে বিছানায় আল্লা রসুলের নাম শুনে শুনে গেল, কে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে খাবি খেয়ে খেয়ে পাড়ি দিল এসব তাবৎ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তবে বিবেচনা করুন, মহাশয়, পুলিশ কেন মিছে আপনাদের তথা খুনী এবং তস্য আত্মীয়স্বজনদের মামেলায় আরো ঝামেলা বাড়িয়ে সবাইকে খামকা, বেফায়দা তঙ্গ করবে? নির্বিকল্প বৈরাগ্য তো আর আপনাদের একচেটিয়া কারবার নয়, পুলিশও এই সার্বজনীন সার্বভৌমিক দর্শনের অংশীদার। তবে হাঁ, আলবাৎ এই নশ্বর সংসারে মাঝে মাঝে রুটি-গোস্তেরও প্রয়োজন হয়, সরকার যা দেন তাতে সব সময় কুলিয়ে ওঠে না, খুনীর আত্মীয়স্বজনকে যখন মেহেরবান খুদাতালা ধনদৌলত দিয়েছেন তখন—? তখন আফগান পুলিশকে আর দোষ দিয়ে

কী হবে!

কিন্তু একটা বিষয়ে আফগান সরকার সচেতন—রাহাজানির যেন বাড়াবাড়ি না হয়। বুখারা সমরকন্দ শিরাজ তেহরানে যদি খবর রটে যায় যে, আফগানিস্থানের রাজত্ব অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল তাহলে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে ও আফগান সরকারের শুল্ক-হংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করা বন্ধ করে দেবে।

ডানদিকে ড্রাইভার শিখ সর্দারজী। বয়স ষাটের কাছাকাছি, কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি ও পরে জানতে পারলুম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য। সব ভাষাই জানেন অথচ বলতে গেলে এক ফরাসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরিজি না বোঝেন তবে তিনি ভাবখানা করেন যেন আপনি যথেষ্ট ইংরিজি জানেন না, তখন তিনি ফরাসীর যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনো যদি আপনি তাঁর বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়েন। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে কথা বলবার ঝকমারি আর তিনি কত পোহাবেন? অথচ পরে দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বিপন্নের সহায়। তারো পরে বুঝতে পারলুম ভাষা বাবদে ভদ্রলোকের এ দুর্বলতা কেন, যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পাণ্ডিত্যের দাবি করে বেতারে চাকরী পেয়েছেন। আমার সঙ্গে দু'দিন একাসনে কাটাবেন—আমি যদি কাবুলে গিয়ে রটাই যে, তিনি গণ্ডূষজলের সফরী তাহলে বিপদআপদের সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁর এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলক ছিল—তাঁর অজান্তে বড়কর্তাদের সবাই জানতেন, ভাষার খাতে তাঁর জ্ঞানের জমা কতটুকু। তবু যে তিনি চাকরীতে বহাল ছিলেন তার সরল কারণ, অন্য সবাই ভাষা জানতেন তাঁর চেয়েও কম। এ তত্ত্বটি কিন্তু তিনি নিজে বুঝতে পারেননি। সরল প্রকৃতির লোক, নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে এতই ব্যস্ত যে পরের অজ্ঞতা তাঁর চোখে পড়ত না। গুণীরা বলে, 'চোখের সামনে ধরা আপন বন্ধ মুষ্টি দূরের হিমালয়কে ঢেকে ফেলে।'

বাসের পেটে একপাল কাবুলী ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, গ্রামোফোন-রেকর্ড, পেলেট-বাসন, ঝাড়লণ্ঠন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজসরঞ্জাম, কেতাব-পুথি, এক কথায় দুনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফগান শিল্প প্রস্তুত করে মাত্র তিন বস্তু—বন্দুক, গোলাগুলী আর শীতের কাপড়। বাদবাকি প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্থান থেকে, কিছুটা রুশ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্য আফগান সরকারের বাণিজ্য-প্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্কর মারলেই হয়।

সে সব পরের কথা।

আগের দিন পেশাওয়ারে ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল—ছায়াতে। এখন বাস্ যাচ্ছে যেখান দিয়ে সেখান থেকে দূরবীন দিয়ে তাকালেও একটি পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। থাকার মধ্যে আছে এখানে ওখানে পাথরের গায়ে হলদে ঘাসের পোঁচ।

হস্টেলে স্টোভ ধরাতে গিয়ে এক আনাড়ী ছোকরা একবার জ্বলন্ত স্পিরিটে আরো স্পিরিট ঢালতে গিয়েছিল। ধপ করে বোতলে স্টোভে সর্বত্র আগুন লেগে ছোকরার ভুরু, চোখের লোম, মোলায়েম গোঁফ পুড়ে কুঁকড়ে মুকড়ে এক অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। এখানে যেন ঠিক তাই। মা ধরণী কখন যেন হঠাৎ তাঁর মুখখানা সূর্যদেবের অত্যন্ত কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেখানে আগুনের এক থাবড়ায় তাঁর চুল ভুরু সব পুড়ে গিয়ে মাটির চামড়া আর ঘাসের চুলের সেই অবস্থা হয়েছে।

এরকম ঝলসে-যাওয়া দেশ আর কখনো দেখিনি। মরুভূমির কথা আলাদা। সেখানে যা কিছু পোড়বার মত সে সব আমাদের জন্মের বহুপূর্বে পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে উড়ে চলে গিয়েছে মরুভূমি ছেড়ে—সার হয়ে নতুন ঘাসপাতা জন্মাবার চেষ্টা আর করেনি। সূর্যদেব সেখানে একচ্ছত্রাধিপতি। এখানে নগ্ন বীভৎস দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব বলা ভুল—এখানে নির্মম কঠোর অত্যাচার। ধরণী এ দেশকে শস্যশ্যামল করার চেষ্টা এখনো সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেননি—প্রতি ক্ষীণ চেষ্টা বারে বারে নির্দয় প্রহারে ব্যর্থ হচ্ছে।

পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী প্রজার কথা মনে পড়ল। বার বার তারা চরের উপর খড়ের ঘর বাঁধে, বার বার জমিদারের লেঠেল সব কিছু পুড়িয়ে দিয়ে ছারখার করে চলে যায়।

পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হল। তারপর খাইবার গিরিসঙ্কট।

তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না, করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি। কারণ আমি যে অবস্থায় ঐ সঙ্কট অতিক্রম করেছি সে অবস্থায় পড়লে স্বয়ং পিয়ের লোতি কী করতেন জানিনে। লোতির কথা বিশেষ করে বললুম কারণ তাঁর মত অজানা অচিন দেশের আবহাওয়া শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে গড়ে তোলার মত অসাধারণ ক্ষমতা অন্য কোনো লেখকের রচনায় চোখে পড়ে না। স্বয়ং কবিগুরু বাঙালীর অচেনা জিনিস বর্ণনা করতে ভালোবাসতেন না। পাহাড় বাঙলাদেশে নেই—তাঁর আড়াই হাজার গানের কোথাও পাহাড়ের বর্ণনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সমুদ্র বাঙলাদেশের কোল ঘেঁষে আছে বটে কিন্তু সাধারণ বাঙালী সমুদ্র দেখে জগন্নাথের রথ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার মত করে—পুরীতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তাই 'পুরীর সমুদ্র দর্শনে' অথচ তিনি যে লোতির চেয়ে খুব কম সমুদ্র দেখেছিলেন তাও তো নয়। তবু এ সব হল বাঙালীর কিছু কিছু দেখা—সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস নয়। কিন্তু শীতের দেশের সবচেয়ে অপূর্ব দর্শনীয় জিনিস বরফপাত, রবীন্দ্রনাথ নিদেনপক্ষে সে সৌন্দর্য পাঁচ শ' বার দেখেছেন, একবারও বর্ণনা করেননি।

তবু যদি কেউ বার দশেক সেই গরম সহ্য করে খাইবার পাসের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করে তাহলে আলাদা কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সংসারের সুখদুঃখ অনুভব করা যেন উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার মত। ক্ষুধানিবৃত্তির আনন্দ সে তাতে পায় বটে কিন্তু ওদিকে কাঁটার খোঁচায় ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্তও পড়ে। তাই অনুমান করা বিচিত্র নয় খাইবারের গরম কাঁটা সয়ে গেলে তার থেকে কাব্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করার মত রসও কিঞ্চিৎ বেরতে পারে।

আমি যে বাসে গিয়েছিলুম তাতে কোনোপ্রকারের রস থাকার কথা নয়। সিকন্দরশাহী, বাবুরশাহী রাস্তা দিয়ে তাকে যেতে হবে বলে তার উপযুক্ত মিলিটারী বন্দোবস্ত করেই সে বেরিয়েছে। তার আপাদমস্তক পুরু করোগেটেড টিন দিয়ে ঢাকা এবং নশ্বর ভঙ্গুর কাঁচ সে তার উইণ্ড-স্ক্রীন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। একটা হেডলাইট কানা, কাঁচের অবগুণ্ঠন নেই। তখনই বুঝতে পারলুম বাইবেলের Song of the Song-এ বর্ণিত এক চোখের মহিমা—

"Thou hast ravished my heart, my spouse, thou hast ravished my heart with *one* of thine eyes."

যে সমস্যার সমাধান বহুদিন বহু কনকর্ড বহু টীকাটিপ্পনি ঘেঁটেও করতে পারিনি, আজ এক মুহূর্তে সদ্‌গুরুর কৃপায় আর খাইবারী বাসের নিমিত্তে তার সমাধান হয়ে গেল।

দু'দিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবারপাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্যের গা ঘেঁষে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট খচ্চর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সঙ্কীর্ণতম স্থলে দুই রাস্তায় মিশে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মত টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে, যে-কোনো জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

দ্বিপ্রহরের সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে—তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে। এই গিরিসঙ্কটে আফগানের লক্ষ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে কোটিকণ্ঠে পরিবর্তিত হয়—এই গিরিসঙ্কটে এক মার্তণ্ড ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ মার্তণ্ডে পরিণত হন। তাঁদের কোটি কোটি অগ্নিজিহ্বা আমাদের সর্বাঙ্গ লেহন করে পরিতুষ্ট হন না, চক্ষুর চর্ম পর্যন্ত অগ্নিশলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ে দেখি সর্দারজীর চোখ সন্ধ্যাসব স্পর্শ না করেই সন্ধ্যাকাশের মত লাল হয়ে উঠেছে। কাবুলী রুমাল

দিয়ে ফেটা মেরে চোখ বন্ধ করেছেন। নগ্নচোখে ক'জন লোক ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে পারে?

এই গরমেই কি কান্দাহারের বধূ গান্ধারী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? কান্দাহার থেকে দিল্লী যেতে হলে তো খাইবারপাস ছাড়া গত্যন্তর নেই। কে জানে, ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, অন্ধ বধূর দুর্দৈব দহন প্রশমিত করার জন্য মহাভারতকার গান্ধারীর অন্ধত্ব বরণের উপাখ্যান নির্মাণ করেননি?

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুস্তিন (ফার) ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার ওভারকোট গায়ে দিয়ে খচ্চর খেদিয়ে খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। সর্দারজীকে রহস্য সমাধানের অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, 'যাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সত্যই এরকম পুরু জামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম ঢুকতে পারে না, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। ঘাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই বা কী? এরা তার থোড়াই পরোয়া করে।' এটুকু বলতে বলতেই দেখলুম গরমের হল্কা মুখে ঢুকে সর্দারজীর গলা শুকিয়ে দিল। গল্প জমাবার চেষ্টা বৃথা।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত ঢঙের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অস্ত্র—গাদাবন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জর্মন মাউজার। দমস্কের বিখ্যাত সুদর্শন তরবারি, সুপারি কাটার জাঁতির মত 'জামধর' মোগল ছবিতে দেখেছিলুম, বাস্তবে দেখলুম হুবহু সেই রকম—গোলাপী সিল্কের কোমরবন্ধে গোঁজা। কারো হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা ঝকঝকে বর্শা। উটের পিঠে পশমে বোনা কত রঙের কার্পেট, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা বাদাম আখরোট কিসমিস আলু-বুখারা চলেছে হিন্দুস্থানের বিরিয়ানি-পোলাওয়ের জৌলুস বাড়াবার জন্য। আরো চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবন্ধের নিচে, ইজেরের ভাঁজে, পুস্তিনের লাইনিঙের ভিতরে আফিঙ আর হশীশ, না ককেনই, না আরো' কিছু।

সবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মন্থরে। মনে পড়ল মানস সরোবর-ফের্তা আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, কঠোর শীতে উঁচু পাহাড়ে যখন মানুষ কাতর হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে প্রশস্ততম পন্থা অতি ধীর পদক্ষেপে চলা, তড়িৎগতিতে সে যন্ত্রণা এড়াতে চেষ্টা করার অর্থ সজ্ঞানে যমদূতের হস্তে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ সমর্পণ করা। এও দেখি সেই অভিজ্ঞতার উষ্ণ সমর্থন। সেখানে প্রচণ্ড শীত, এখানে দুর্দান্ত গরম। পাঠান দু'বার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথরূপে গ্রহণ করলুম। 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা।'

রবীন্দ্রনাথও ঐ রকম কী একটা কথা বলেছেন না, দুঃখ না পেলে দুঃখ ঘুচবে কী করে? তবে কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, তাড়াতাড়ি করে দুঃখ এড়াবার চেষ্টা করা বৃথা? মেয়াদ পূর্ণ হতে যে সময় লাগবার কথা তা লাগবেই।

খ্রীস্টও তো বলেছেন—'Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence [prison] till thou hast paid the uttermost farthing'.

কে বলে বিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না? আমার সকল সমস্যা সমাধান করেই যেন ধড়াম করে শব্দ হল। কাবুলী তড়িৎগতিতে চোখের ফেটা খুলে আমার দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল, আমি সর্দারজীর দিকে তাকালুম। তিনি [illegible] অতি শান্তভাবে গাড়িখানা এক পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, 'টায়ার ফেঁসেছে। প্রতিবারই [illegible]। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।'

হৃদয়ঙ্গম করলুম, সৃষ্টি যখন তার রুদ্র[illegible]প ধারণ করেন তখন তাড়াতাড়ি করতে নেই। কিন্তু এই গ্রীষ্মে রুদ্র তাঁর প্রসন্ন কল্যাণ দক্ষিণ মুখ দেখালেই তো ভক্তের হৃদয় আকৃষ্ট হত বেশি।

প্রয়োজন ছিল না, তব সর্দারজী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খাইবারপাসের রাস্তা দুটো সরকারের বটে, কিন্তু দু'দিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরেছ। আড়ালে-আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে আছে। নামলেই কড়াক্-পিঙ্। তারপর কী কায়দায় সব কিছু হরণ করে তার

বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই। শিকারী হরিণ নিয়ে কী করে না করে সকলেরই জানা কথা—চামড়াটুকুও বাদ দেয় না। এ স্থলে শুনলুম, শুধু যে হাসিটুকু গুলী খাওয়ার পূর্বে মুখে লেগেছিল সেইটুকু হাওয়ায় ভাসতে থাকে— বাদবাকি উবে যায়।

পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের উপর রাহাজানি না করে তার জন্য খাইবারপাসের দু'দিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ দু'টাকা করে বছরে খাজনা দেয়। পরে আরেকটি শর্ত অতি কষ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদী আফ্রিদীতে ঝগড়া বাধলে রাস্তার এপারে ওপারে যেন বন্দুক না মারা হয়।

মোটর মেরামত করতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই। শুনেছি ভয়ঙ্কর জ্বর হলে রোগীর সময়ের আন্দাজ একেবারে চলে যায়। পরের দিনে যখন সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম চাকা বদলাতে দু'ঘণ্টা লাগল কী করে, তখন সর্দারজী বলেছিলেন, সময় নাকি লেগেছিল মাত্র আধ ঘণ্টা।

মোটর আবার চলল। কাবুলীর গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিড়বিড় করে যা বলছিলেন, তার নির্যাস—

'কিচ্ছু ভয় নেই সায়েব— কালই কাবুল পৌঁছে যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে কব্ করে কাবুল নদীতে ডুব দেব। বরফগলা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নেয়ে উঠে বরফে ঘষে ঘষে আঙুর খাব তামাম জুলাই আগস্ট। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নয়ানজুলিতে জল জমতে আরম্ভ করবে। অক্টোবরে শীতের হাওয়ায় ঝরা-পাতা কাবুল শহরে হাজারো রঙের গালিচা পেতে দেবে। নভেম্বরে পুস্তিনের জোব্বা বের করব। ডিসেম্বরে বরফ পড়তে শুরু করবে। সেই বরফের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেরব। উঃ! সে কী শীত, সে কী আরাম!'

আমি বললুম, 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

হঠাৎ দেখি সামনে একী! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর থামল। পাসপোর্ট দেখাতে হল। গেট খুলে গেল। আফগানিস্থানে ঢুকলুম। বড় বড় হরফে সাইনবোর্ডে লেখা—

It is absolutely forbidden
to cross this border into
Afghan territory.

কাবুলী বললেন, 'দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবারপাস পাস করা। অল্‌হম্‌দুলিল্লা (খুদাকে ধন্যবাদ)।'

আমি বললুম, 'আমেন।'

আট

খাইবারপাস তো দুঃখে-সুখে পেরলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমল বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পীচ-ঢালা রাস্তা ছিল—তা সে সঙ্কীর্ণই হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির উপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের উপর দিয়ে পণ্যবাহিনীর যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক হতে পারে তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙ্গা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গোরুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে—যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোষক না থাকে, এবং ছোটবড় নুড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

আহমদ আলী যাত্রাকালে আমার মাথায় একটা দশগজী বিরাট পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন। খাইবারপাসের মাঝখানে সে পাগড়ি আমাকে সর্দিগর্মি থেকে বাঁচিয়েছিল; এখন সেই পাগড়ি আমার মাথা এবং গাড়ির ছাতের মাঝখানে বাফার-স্টেট হয়ে উভয় পক্ষকে গুরুতর লড়াই-জখম থেকে বাঁচাল।

সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, পাগড়ি আর কোনো কাজে লাগে কিনা। তিনি বললেন, 'আরো বহু কাজে লাগে কিন্তু উপস্থিত একটার কথা মনে পড়ছে। বিশেষ অবস্থাতে শুধু কলসীতেই চলে, দড়ি কেনার দরকার হয় না।'

বুঝলুম, রাস্তার অবস্থা, গ্রীষ্মের আতিশয্য আর দ্বিপ্রহরের অনাহার এ-পথের ফুল-টাইম গাহক সর্দারজীকে পর্যন্ত কাবু করে ফেলেছে—তা না হলে এ রকম বীভৎস প্রয়োজনের কথা তাঁর মনে পড়বে কেন?

দুঃখ হল। ষাট বৎসর বয়স হতে চলল, কোথায় না সর্দারজী দেশের গ্যাঁয়ে তেঁতুলের ছায়ায় নাতি-নাতনীর হাতে হাওয়া খেতে খেতে পল্টনের গল্প বলবেন আর কোথায় আজ এই একটানা আগুনের ভিতর পেশাওয়ার কাবুলে মাকু মারা। কেন এমন অবস্থা কে জানে, কিন্তু দেশ, কাল এবং বিশেষ করে পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করে আড্ডা জমাবার রৌদ্রাতুর জীর্ণাঙ্কুর উপড়ে ফেলতে বেশি টানাহেঁচড়া করতে হল না।

কী দেশ! দুদিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে নুড়ি আর নুড়ি। যেখানে নুড়ি আর নেই সেখান থেকে চোখে পড়ে বহুদূরে আবছায়া আবছায়া পাহাড়। দূর থেকে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করলুম লক্ষ বৎসর রৌদ্রবর্ষণে তাতেও সজীব কোনো কিছু না থাকারই কথা। রেডিয়েটারে জল ঢালার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল, তখন লক্ষ্য করলুম এক কণা ঘাসও দুই পাথরের ফাঁকে কোথাও জন্মায়নি। পোকামাকড়, কোনো প্রকারের প্রাণের চিহ্ন কোথাও নেই—খাবে কী, বাঁচবে কী দিয়ে? মা ধরণীর বুকের দুধ এদেশে যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে; কোনো ফাটল দিয়ে কোনো বাঁধন ছিঁড়ে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত বেরোয়নি। দিকদিগন্তব্যাপী বিশাল শ্মশানভূমির মাঝখান দিয়ে প্রেতযোনি বর্মধারিণী ফোর্ড গাড়ি চলেছে ছায়াময় সন্তানসন্ততি নিয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, চক্রবালপরিপূর্ণ মহানির্জনতার অদৃশ্য প্রহরীরা হঠাৎ কখন যন্ত্রস্তনিত ধূম্রপুচ্ছ এই স্বতশ্চলশকট শূন্যে তুলে নিয়ে বিরাট নৈস্তব্ধ্যের যোগভূমি পুনরায় নিরঙ্কুশ করে দেবে।

তারপর দেখি মৃত্যুর বিভীষিকা। প্রকৃতি এই মরুপ্রান্তরে প্রাণ সৃষ্টি করেন না বটে কিন্তু প্রাণ গ্রহণে তিনি বিমুখ নন। রাস্তার ঠিক উপরেই পড়ে আছে উটের একটা বিরাট কঙ্কাল। গৃধিনী শকুনি অনাহারে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়ে এখানে আসে না বলে কঙ্কাল এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েনি। রৌদ্রের প্রকোপে ধীরে ধীরে মাংস শুকিয়ে গিয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়েছে। মসৃণ শুভ্র সম্পূর্ণ কঙ্কাল যেন যাদুঘরে সাজানো বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল সামগ্রী হয়ে পড়ে আছে।

লাণ্ডিকোটাল থেকে দক্কা দশ মাইল।

সেই মরুপ্রান্তরে দক্কা দুর্গ অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হল। মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে আশপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে—ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রঙ। দেয়ালের উপরের দিকে এক সারি গর্ত; দুর্গের লোক তারি ভিতর দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শত্রুকে গুলী করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অন্ধের উপড়ে-নেওয়া চোখের শূন্য কোটর।

কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বাঁ দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছেন—ডান দিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। পলিমাটি জমে গিয়ে যেটুকু মেঠো রসের সৃষ্টি হয়েছে তারি উপরে ভুখা দেশ ফসল ফলিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম; মনে হল ভিজে সবুজ নেকড়া দিয়ে কাবুল নদী আমার চোখের জ্বালা ঘুচিয়ে দিলেন। মনে হল ঐ সবুজটুকুর কল্যাণে সে-যাত্রা আমার চোখ দুটি বেঁচে গেল। না হলে দক্কা দুর্গপ্রাকারের অন্ধ কোটর নিয়ে আমাকেও দিশেহারা হয়ে ঐ দেয়ালেরই মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

কাবুলী বললেন, 'চলুন, দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারী কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তা হলে সন্ধ্যার আগেই জলালাবাদ পৌঁছতে পারব।'

দুর্গের অফিসার আমাকে বিদেশী দেখে প্রচুর খাতির-যত্ন করলেন। দক্কার মত জায়গায় বরফের কল থাকার কথা নয়, কিন্তু যে শরবৎ খেলুম তার জন্য ঠাণ্ডা জল কুজোতে কী করে তৈরী করা সম্ভব হল বুঝতে পারলুম না।

অফিসার সত্যি অত্যন্ত ভদ্রলোক। আমার কাতর অবস্থা দেখে বললেন, 'আজ রাতটা এখানেই জিরিয়ে যান। কাল অন্য মোটরে আপনাকে সোজা কাবুল পাঠিয়ে দেব।' আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম যে, আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে।

অফিসারটি শিক্ষিত লোক। একলা পড়েছেন, কথা কইবার লোক নেই। আমাকে পেয়ে নির্জনে জমানো তাঁর চিন্তাধারা যেন উপছে পড়ল। হাফিজ-সাদীর অনেক বয়েৎ আওড়ালেন এবং মরুপ্রান্তরে একা একা আপন মনে সেগুলো থেকে নিংড়ে নিংড়ে যে রস বের করেছেন তার খানিকটা আমায় পরিবেশন করলেন। আমি আমার ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে জিজ্ঞাসা করলুম, সঙ্গীহীন জীবন কি কঠিন বোধ হয় না? বললেন, 'আমার চাকরী পল্টনের, ইস্তফা দেবার উপায় নেই। কাজেই বাইরের কাবুল নদীটি নিয়ে পড়ে আছি। রোজ সন্ধ্যায় তার পাড়ে গিয়ে বসি আর ভাবি যেন একমাত্র নিতান্ত আমার জন্য সে এই দুর্গের দেয়ালে আঁচল বুলিয়ে চলে গিয়েছে। আর দু'চারজন যারা নদীর পারে যায়, তাদের মতলব ঠাণ্ডা হওয়ার। আমিও ঠাণ্ডা হই, কিন্তু শীতকালেও কামাই দিইনে। গোড়ার দিকে আমিও স্বার্থপর ছিলুম, কাবুল নদী আমার কাছে সৌন্দর্য উপভোগের বস্তু ছিল। তার গান শুনতুম, তার নাচ দেখতুম, তার লুটিয়ে-পড়া সবুজ আঁচলের এক প্রান্তে আসন পেতে বসতুম। এখন আমাদের অন্য সম্পর্ক। আচ্ছা বলুন তো, অমাবস্যার অন্ধকারে যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন আপনি কখনো নদীর পারে কান পেতে শুয়েছেন?'

আমি বললুম, 'নৌকোতে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি।'

তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'তা হলে আপনি বুঝতে পারবেন। মনে হয় না কুলকুল শুনে, যে আর দু'দিন কাটলেই আরেকটু, আর সামান্য একটু অভ্যাস হয়ে গেলেই হঠাৎ কখন এই রহস্যময়ী ভাষার অর্থ সরল হয়ে যাবে? আপনি ভাবছেন আমি কবিত্ব করছি। আদপেই না। আমার মনে হয় মেঘের ডাক যেমন জনপ্রাণীকে বিদ্যুতের ভয় জানিয়ে দেয়, জলের ভাষাও তেমনি কোনো এক আশার বাণী জানাতে চায়। দূর সিন্ধুপার থেকে সে বাণী উজিয়ে উজিয়ে এসেছে, না কাবুল পাহাড়ের শিখর থেকে বরফের বুকের ভিতর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখানে এসে গান গেয়ে জেগে উঠছে, জানিনে।

'এখন বড্ড গরম। শীতকালে যখন আপনার ছুটি হবে তখন এখানে আসবেন। এই নদীর অনেক গোপন খবর আপনাকে বাৎলে দেব। আহারাদি? কিচ্ছু ভাবনা নেই। মুর্গী, দুম্বা যা চাই। শাকসব্জী? সে গুড়ে পাথর।'

অফিসার যখন কথা বলছিলেন, তখন আমার এক একবার সন্দেহ হচ্ছিল, একা থেকে থেকে বোধহয় ভদ্রলোকের মাথা কেমন জানি একটুখানি—। কিন্তু কাবুল নদীর সবুজ আঁচল ছেড়ে তিনি যখন অক্লেশে দুম্বার পিঠে সোওয়ার হলেন, তখনই বুঝলুম ভদ্রলোক সুস্থই আছেন। বললেন, 'আমার কাজ পাসপোর্ট সই করা আর কী মাল আসছে-যাচ্ছে তার উপর নজর রাখা। কিছু কঠিন কর্ম নয়, বুঝতেই পারছেন। ওদিকে নতুন বাদশা উঠে পড়ে লেগেছেন আফগানিস্থানকে সজীব সবল করে তোলবার জন্য। অনেক লোক তার চারদিকে জড়ো হয়েছেন। শুনতে পাই কাবুলে নাকি সর্বত্র নতুন প্রাণের সবুজ ঘাস জেগে উঠেছে। কিন্তু এদিকে ইংরেজ দুম্বা, ওদিকে রুশী বকরী। সুযোগ পেলেই কাঁচা ঘাস সাফ করে দিয়ে কাবুলের নেড়া পাহাড়কে ফের নেড়া করে দেবে। ভাগ্যিস চতুর্দিকে খোদায় দেওয়া পাথরের বেড়া রয়েছে, তাই রক্ষে। আর রক্ষে এই যে, দুম্বা আর বকরিতে কোনোদিন মনের মিল হয় না। দুম্বা যদি ঘাসের দিকে নজর দেয় তো বকরি শিঙ উঁচিয়ে লাফ দিয়ে আমুদরিয়া পার হতে চায়। বকরি যদি তেরিমেরি করে তবে দুম্বা ম্যা ম্যা করে আর সবাইকে জানিয়ে দেয় যে, বকরির নজর শুধু কাবুলের চাট্টিখানি ঘাসের উপর নয়—তার আসল নজর হিন্দুস্থান, চীন, ইরান সবক'টা

বড় বড় ধানক্ষেতের উপর।'

আমি শুধালুম, 'দুম্বাটা শুধু ম্যা ম্যা করবে কেন? তারো তো একজোড়া খাসা শিঙ আছে।'

'ছিল। হিন্দুস্থান ভাবে, এখনো আছে, কিন্তু এদেশের পাথরে খামকা গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভোঁতা করে ফেলেছে। তাই বোধহয় সেটা ঢাকবার জন্য সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে— গোরা সেপাইয়ের খানাপিনার জমক-জৌলুস দেখেছেন তো? হিন্দুস্থান সেই সোনালি শিঙের ঝলমলানি দেখে আরো বেশি ভয় পায়। ওদিকে মিশরে সা'দ জগলুল পাশা, তুর্কীতে মুস্তফা কামাল পাশা, হিজজীজে ইবনে সউদ, আফগানিস্থানে আমান উল্লা খান দুম্বার পিঠে কয়েকটা আচ্ছা ডাণ্ডা বুলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো জানোয়ারই সহজে ঘায়েল হয় না। জানোয়ার তো?'

আমি আঁৎকে উঠলুম। কী ভয়ঙ্কর সিডিশন! নাঃ, তা তো নয়। মনেই ছিল না যে স্বাধীন আফগানিস্থানে বসে কথা কইছি।

অফিসার বলে যেতে লাগলেন, 'তাই আজ হিন্দুস্থান আফগানিস্থানে মিলে মিশে যে কাজ করতে যাচ্ছে সে বড় খুশির কথা। কিন্তু আপনাকে বহুৎ তকলিফ বরদাস্ত করতে হবে। কাবুল শক্ত জায়গা। শহরের চারিদিকে পাথর, মানুষের দিলের ভিতর আরো শক্ত পাথর। শাহানশা বাদশা সেই পাথরের ফাটলে ঘাস গজাচ্ছেন, আপনাকে পানি ঢালতে ডেকেছেন।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'লজ্জা দেবেন না। আমার কাজ অতি নগণ্য।'

অফিসার বললেন, 'তার হিসেবনিকেশ আর-একদিন হবে। আজ আমি খুশি যে এতদিন শুধু পেশাওয়ার পাঞ্জাবের লোক আফগানিস্থানে আসত, এখন দূর বাঙলা-মুল্লুকেও আফগানিস্থানের ডাক পৌঁচেছে।'

দেখি সর্দারজী দূর থেকে ইশারায় জানাচ্ছেন, সব তৈরি—আমি এলেই মোটর ছাড়ে।

অফিসার সর্দারজীকে দেখে বললেন, 'অমর সিং বুলানীর গাড়িতে যাচ্ছেন বুঝি? ওর মত হুঁশিয়ার আর কলকব্জায় ওস্তাদ ড্রাইভার এ রাস্তায় আর কেউ নেই। এমন গাড়িও নেই যার গায়ে অমর সিংয়ের দুটো ঠোক্কর, দুটো চারটে কদরের চাঁটি পড়েনি। কোনো বেয়াড়া গাড়ি যদি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে তবে শেষ দাওয়াই তার ঘোমটা খুলে কানের কাছে বলা, 'ওঝা অমর সিংকে খবর দেওয়া হয়েছে।' আর দেখতে হবে না। সেলফ্-স্টার্টার না, হ্যাণ্ডিল না, হঠাৎ গাড়ি পাঁই পাঁই করে ছুটতে থাকে। ড্রাইভার কোনো গতিকে যদি পিছন দিকে ঝুলে পড়তে পারে তবেই রক্ষা।

'কিন্তু হামেশাই দেখবেন লাইনের সবচেয়ে লজঝড় গাড়ি চালাচ্ছে অমর সিং। একটা মজা দেখবেন?' বলে তিনি অমর সিংকে ডেকে বললেন, 'সর্দারজী, আমি একখানা নয়া গাড়ি কিনেছি। সিধা আমেরিকা থেকে আসছে। তুমি চালাবে? তনখা যা পাচ্ছ তাই পাবে।'

অফিসারের নজরে পড়াতে সর্দারজী তো হাসিমুখে এসে সালাম করে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কথা শুনে মুখ গম্ভীর হল। পাগড়ির ন্যাজটা দু'হাতে নিয়ে সর্দারজী ভাঁজ করেন আর ভাঁজ খোলেন— নজরও ঐদিকে ফেরানো। তারপর বললেন, 'হজুরের গাড়ি চালানো বড়ী ইজ্জৎকী বাৎ, কিন্তু আমার পুরোনো চুক্তির মেয়াদ এখনো ফুরোয়নি।'

অফিসার বললেন, 'তাই নাকি? বড় আফসোসের কথা। তা সে চুক্তি শেষ হলে আমায় খবর দিয়ো। আচ্ছা তুমি এখন যাও, আমি ক্ষুদে আগাকে (অর্থাৎ আমাকে) পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখলেন তো? নতুন গাড়ি সে চালাতে চায় না। চুক্তি-ফুক্তি সব বাজে কথা। আমার ড্রাইভারের দরকার শুনলে এ লাইনের কোন মোটরের গোঁসাই চুক্তির ফপরদালালি করতে পারে বলুন তো! তা নয়। অমর সিং নতুন গাড়ি চালিয়ে সুখ পায় না। পদে পদে যদি টায়ার না ফাটল, এঞ্জিন না বিগড়ল, ছাতখানা উড়ে না গেল, তবে সে মোটর চালিয়ে কী কেরামতি? সে গাড়ি তো বোরকা-পরা মেয়েই চালাতে পারে।

'আমার কী মনে হয় জানেন? বুড়ী মরে গিয়েছে। মোটরের বনেট খুলতে পেলে সে এখন বউয়ের ঘোমটা খোলার আনন্দ পায়। নতুন গাড়িতে তার অজুহাত কোথায়?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বউয়ের ঘোমটা খোলার জন্য আবার অজুহাতের প্রয়োজন হয় নাকি?'

অফিসার বললেন, 'হয়, হয়। রাজাধিরাজের বেলাও হয়। শুনুন, কাবুল-বদখশান আধা হিন্দুস্থানের মালিক হুমায়ুন বাদশা জুবেদীকে কী বলেছেন—

তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারির মত
দেখা মোরে দিতে করুণায়
বল তুমি, 'রহি অবগুণ্ঠনের মাঝে
এ-রূপ দেখাতে নারি হায়।'
তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে রবে ব্যবধান
অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন
আমার আনন্দ হতে সৌন্দর্য তোমার
দূরে রাখে কোন আবরণ!
একী গো সমরলীলা তোমায় আমায়?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার:
মরমের মর্ম যাহা তাই তুমি মোর
জীবনের জীবন আমার।

—সত্যেন দত্তের অনুবাদ

নয়

আফগানিস্থানের অফিসার যদি কবি হতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে পীর হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন-তিনবার চাকা ফাটল, আর এঞ্জিন সর্দারজীর উপর গোসা করে দু'বার গুম হলেন। চাকা সারাল হ্যাণ্ডিম্যান—তদারক করলেন সর্দারজী। প্রচুর মেহদি-প্রলেপের সল্যুশন লাগিয়ে বিবিজানের কদম মবারক মেরামত করা হল, কিন্তু তাঁর মুখ ফোটাবার জন্য স্বয়ং সর্দারজীকে ওড়না তুলে অনেক কাকুতিমিনতি করতে হল। একবার চটে গিয়ে তিনি হ্যাণ্ডিল মারবার ভয়ও দেখিয়েছিলেন—শেষটায় কোন শর্তে রফারফি হল, তার খবর আমরা পাইনি বটে কিন্তু হরেকরকম আওয়াজ থেকে আমেজ পেলুম বিবিজান অনিচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন।

জলালাবাদ পৌঁছবার কয়েক মাইল আগে তাঁর কোমরবন্ধ অথবা নীবিবন্ধ, কিম্বা বেল্ট—যাই বলুন, ছিঁড়ে দু'টুকরো হল। তখন খবর পেলুম সর্দারজীও রাতকানা। রেডিয়োর কর্মচারী আমার কানটাকে মাইক্রোফোন ভেবে ফিস ফিস করে প্রচার করে দিলেন, 'অদ্যকার মত আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত হল। কাল সকাল সাতটায় আমরা আবার উপস্থিত হব।'

আধ মাইলটাক দূরে আফগান সরাই। বেতারের সায়েব ও আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললুম। বাদবাকি আর সকলে হৈ-হল্লা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল। বুঝলুম, এদেশেও বাসে চড়ার পূর্বে সাদা কালিতে কাবিন-নামায় লিখে দিতে হয়, 'বিবিজানের খুশীগমীতে তাঁহাকে স্বহস্তে স্বস্কন্ধে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে গররাজি হইব না।'

সর্দারজী তম্বি করে বললেন, 'একটু পা চালিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।'

সরাই তো নয়, ভীষণ দুশমনের মত দাঁড়িয়ে এক চৌকো দুর্গ। 'কর্মঅন্তে নিভৃত পান্থশালাতে' বলতে আমাদের চোখে যে স্নিগ্ধতার ছবি ফুটে ওঠে এর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। ত্রিশ ফুট

উঁচু হলদে মাটির নিরেট চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা—তার ভেতর দিয়ে উট, বাস, ডবল-ডেকার পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভেতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরুতে হবে না।

ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। কত শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুর্গন্ধ আমাকে ধাক্কা মেরেছিল বলতে পারিনে, কিন্তু মনে হল আমি যেন সে ধাক্কায় তিন গজ পিছিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা কী বুঝতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না। এলাকাটা মৌসুমী হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না—যথেষ্ট উঁচু নয় বলে বরফও পড়ে না। আশেপাশে নদী বা ঝরনা নেই বলে ধোয়ামোছার জন্য জলের বাজে খরচার কথাও ওঠে না। অতএব সেকেন্দরশাহী বাজীরাজ থেকে আরম্ভ করে পরশুদিনের আস্ত ভেড়ার পাল যে সব 'অবদান' রেখে গিয়েছে, তার স্থূলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে যে, ভয় হয় ধাক্কা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব; ইচ্ছে করলে চামচ দিয়ে কুরে কুরে তোলা যায়। চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল, মাত্র একদিকে একখানা দরজা। বাইরের হাওয়া তারি সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়, অন্যদিকে বেরুবার পথ নেই দেখে ঐ জালিয়ানওয়ালাবাগে আর ঢোকে না। সূচীভেদ্য অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম সূচীভেদ্য দুর্গন্ধ শুঁকলুম।

দুর্গপ্রাকারকে পিছনের দেয়ালস্বরূপ ব্যবহার করে চার সারি কুঠরি নয়—খোপ; শুধু দরজার জায়গাটা ফাঁকা। খোপগুলোর তিন দিক বন্ধ—সামনের চত্বরের দিক খোলা। বেতারওয়ালা সরাইয়ের মালিকের সঙ্গে দর-কষাকষি করে আমাদের জন্য একটা খোপ ভাড়া নিলেন—আমার জন্য একখানা দড়ির চারপাইও যোগাড় করা হল। খোপের সামনের দিকে একটু বারান্দা, চারপাই সেখানে পাতা হল। খোপের ভিতর একবার এক লহমার তরে ঢুকেছিলুম—মানুষের কত কুবুদ্ধিই না হয়। ধর্ম সাক্ষী, স্মেলিং সল্টে যার ভিরমি কাটে না, তাকে আধ মিনিট সেখানে রাখলে আর দেখতে হবে না।

কেরোসিন কুপির ক্ষীণ আলোকে যাত্রীরা আপন আপন জানোয়ারের তদারক করছে। উট যদি তাড়া খেয়ে পিছু হটতে আরম্ভ করল, তবে খচ্চরের পাল চিৎকার করে রুটিওয়ালার বারান্দায় ওঠে আর কী। মোটর যদি হেডলাইট জ্বালিয়ে রাত্রিবাসের স্থান অনুসন্ধান করে, তবে বাদবাকি জানোয়ার ভয় পেয়ে সব দিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করে। মালিকেরা তখন আবার চিৎকার করে আপন আপন জানোয়ার খুঁজতে বেরোয়। বিচুলি নিয়ে টানাটানি, রুটির দোকানে দর-কষাকষি, মোটর মেরামতের হাতুড়ি পেটা, মোরগ-জবাইয়ের ঘড়ঘড়ানি, আর পাশের খোপের বারান্দায় খান সায়েবের নাক-ডাকানি। তার নাসিকা আর আমার নাকের মাঝখানে তফাত ছয় ইঞ্চি। শিথান বদল করার উপায় নেই—পা তাহলে পশ্চিম দিকে পড়ে ও মুখ উটের লেজের চামর ব্যজন পায়। আর উট যদি পিছু হটতে আরম্ভ করে, তবে কী হয় না-হয় বলা কিছু কঠিন নয়। গোমূত্রের মত পবিত্র জিনিসেও প্রপাতস্নানের ব্যবস্থা নেই।

তবে একথা ঠিক, দুর্গন্ধ ও নোংরামি সহ্য করে কেউ যদি সরাইয়ে জ্ঞান অন্বেষণ অথবা আড্ডার সন্ধানে একটা চক্কর লাগায়, তবে তাকে নিরাশ হতে হবে না। আহমদ আলীর ফিরিস্তিমাফিক সব জাত সব ভাষা তো আছেই, তার উপরে গুটিকয়েক সাধুসজ্জন, দু'-একজন হজ-যাত্রী—পায়ে চলে মক্কা পৌঁছবার জন্য তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়েছেন। এঁদের চোখেমুখে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই; কারণ এঁরা চলেন অতি মন্দগতিতে এবং নোংরামি থেকে গা বাঁচাবার কায়দাটা এঁরা ফ্রন্টিয়ারেই রপ্ত করে নিয়েছেন। সম্বল-সামর্থ্য এঁদের কিছুই নেই—উপরে আল্লার মরজি ও নীচে মানুষের দাক্ষিণ্য এই দুই-ই তাঁদের নির্ভর।

অনৈসর্গিক পাপের আভাস ইঙ্গিতও আছে—কিন্তু সেগুলো হির্শফেল্ট্ সায়েবের জিম্মাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সেই সাত-সকালে পেশাওয়ারে আণ্ডা-রুটি খেয়ে বেরিয়েছিলুম তারপর পেটে আর কিছুই পড়েনি।

দক্কার শরবৎ পেট পর্যন্ত পৌঁছয়নি, শুকনো তালু-গলাই তাকে শুষে নিয়েছিল। কিন্তু চতুর্দিকের নোংরামিতে এমনি গা ঘিন ঘিন করছিল যে, কোনো কিছু গিলবার প্রবৃত্তি ছিল না। নিজের আদিখ্যেতায় নিজের উপর বিরক্তিও ধরছিল—আরে বাপু, আর পাঁচজন যখন দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমুচ্ছে, তখন তুমিই বা এমন কোন নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি যে, তোমার স্নান না হলে চলে না, মাত্র দু'হাজার বছরের জমানো গন্ধে তুমি ভিরমি যাও। তবু তো জানোয়ারগুলো চত্বরে, তুমি বারান্দায় শুয়ে। মা জননী মেরী সরাইয়েও জায়গা পাননি বলে শেষটায় গাধা-খচ্চরের মাঝখানে প্রভু যীশুর জন্ম দেননি? ছবিতে অবশ্য সায়েবসুবোরা যতদূর সম্ভব সাফসুতরো করে সব কিছু এঁকেছেন, কিন্তু শাকে ঢাকা পড়ে ক'টা মাছ?

বেৎলেহেমের সরাইয়ে আর আফগানিস্থানের সরাইয়ে কী তফাত? বেৎলেহেমেও বৃষ্টি হয় তিন ফোঁটা আর বরফ পড়ে আড়াই তোলা। কে বললে তোমায় ইহুদি আফগানের চেয়ে পরিষ্কার? আফগানিস্থানের গন্ধে তোমার গা বিড়োচ্ছে, কিন্তু ইহুদির গায়ের গন্ধে বোকা পাঁঠা পর্যন্ত লাফ দিয়ে দবমা ফুটো করে প্রাণ বাঁচায়।

এ সব হল তত্ত্বজ্ঞানের কথা। কিন্তু মানুষের মনের ভিতর যে রকম গীতাপাঠ হয়, সে রকম বেয়াড়া দুর্যোধনও সেখানে বসে। তার শুধু এক উত্তর, 'জানামি ধর্মং, ন চ মে প্রবৃত্তি,' অর্থাৎ 'তত্ত্বকথা আর নতুন শোনাচ্ছ কী, কিন্তু ওসবে আমার প্রবৃত্তি নেই।' তার উপর আমার বেয়াড়া মনের হাতে আরেকখানা খাসা উত্তরও ছিল। সর্দারজী ও বনেটবাসিনীতে যদি সাঁঝের ঝোঁকে ঢলাঢলি আরম্ভ না হত তবে অনেক আগেই জলালাবাদের সবকারী ডাকবাঙলোয় পৌঁছে সেখানে তোমাতে-আমাতে স্নানাহার করে এতক্ষণে নরগিস ফুলের বিছানায়, চিনার গাছের দোদুল হাওয়ায় মনের হরিষে নিদ্রা যেতুম না?

বেয়াড়া মন কিছু কিছু তত্ত্বজ্ঞানেরও সন্ধান রাখে—না হলে বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে এক ঘরে সারাজীবন কাটায় কী করে? ফিস ফিস করে তর্কও জুড়ে দিয়ে বলল, মা মেরী ও যীশুর যে গল্প বললে সে হল বাইবেলি কেচ্ছা। মুসলমান শাস্ত্রে আছে, বিবি মরিয়ম (মেরী) খেজুরগাছের তলায় ইসা-মসীহকে প্রসব করেছিলেন।

বিবেকবুদ্ধি—'সে কী কথা! ডিসেম্বরের শীতে মা মেরী গেলেন গাছতলায়?'

বেয়াড়া মন—'কেন বাপু, তোমার বাইবেলেই তো রয়েছে, প্রভু জন্মগ্রহণ করলে পর দেবদূতেরা সেই সুসমাচার মাঠের মাঝখানে গিয়ে রাখাল ছেলেদের জানালেন। গয়লার ছেলে যদি শীতের রাত মাঠে কাটাতে পারে, তবে ছুতোরের বউই পারবে না কেন, শুনি? তার উপর গর্ভযন্ত্রণা—সর্বাঙ্গে তখন গল গল করে ঘাম ছোটে!'

ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি আমি আদপেই পছন্দ করিনে। দু'জনকে দুই ধমক দিয়ে চোখ বন্ধ করলুম।

চত্বরের ঠিক মাঝখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত উঁচু একটা প্রহরী শিখর। সেখান থেকে হঠাৎ এক হুঙ্কারধ্বনি নির্গত হয়ে আমার তন্দ্রাভঙ্গ করল। শিখরের চুড়ো থেকে সরাইওয়ালা চেঁচিয়ে বলছিল, 'সরাই যদি রাত্রিকালে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে হে যাত্রীদল, আপন আপন মাল-জান বাঁচাবার জিম্মাদারি তোমাদের নিজের।'

ঐটুকুই বাকি ছিল। সরাইয়ের সব কষ্ট চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিয়েছিলুম ঐ জানটুকু বাঁচাবার আশায়। সরাইওয়ালা সেই জিম্মাদারিটুকুও আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ায় যখন আর কোনো ভরসা কোনো দিকে রইল না তখন আমার মনে এক অদ্ভুত শান্তি আর সাহস দেখা দিল। উর্দুতে বলে, 'নঙ্গেসে, খুদাভী ডরতে হ্যাঁয়', অর্থাৎ 'উলঙ্গকে ভগবান পর্যন্ত সমঝে চলেন।' সোজা বাঙলায় প্রবাদটা সামান্য অন্যরূপ নিয়ে অল্প একটু গীতিরসে ভেজা হয়ে বেরিয়েছে, 'সমুদ্রে শয়ন যার শিশিরে কী ভয় তার?'

ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার মনে তখন আরও একটা খটকা লাগল। রেডিয়োওয়ালার চোস্ত ফার্সী জানার কথা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ঐ যে সরাইওয়ালা বলল, 'মাল-জানের' তদারকি আপন আপন কাঁধে এ কথাটা আমার কানে কেমনতরো নতুন ঠেকলো। সমাসটা কি 'জান-মাল' নয়?'

অন্ধকারে রেডিয়োওয়ালার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই তাঁর কথা অনেকটা বেতারবার্তার মত কানে এসে পৌঁছল। বললেন, 'ইরানদেশে ফার্সীতে বলে, 'জান-মাল' কিন্তু আফগানিস্থানে জান সস্তা, মালের দাম ঢের বেশি। তাই বলে 'মাল-জান।'

আমি বললুম, 'তাই বোধ করি হবে। ভারতবর্ষেও প্রাণ বেজায় সস্তা—তাই আমরাও বলি, 'ধনে-প্রাণে' মেরো না। 'প্রাণে-ধনে' মেরো না কথাটা কখনো শুনিনি।'

আমাতে বেতারওয়ালাতে তখন একটা ছোটখাটো 'ব্রেনস্‌-ট্রাস্ট্‌' বানিয়ে বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফ্রন্টিয়ারের ওপারে তো শুনেছি জীবন পদে পদে বিশেষ বিপন্ন হয় না। তবে আপনার মুখে এরকম কথা কেন?'

আমি বললুম, 'বুলেট ছাড়া অন্য নানা কায়দায়ও তো মানুষ মরতে পারে। জ্বর আছে, কলেরা আছে, সান্নিপাতিক আছে, আর না খেয়ে মরার রাজকীয় পন্থা তো বারোমাসই খোলা রয়েছে। সে পথ ধরলে দু-দণ্ড জিরোবার তরে সরাই-ই বলুন, আর হাসপাতালই বলুন কোনো কিছুরই বালাই নেই।'

বেতারবাণী হল, 'না খেয়ে মরতে পারাটা তামাম প্রাচ্যভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। একে অজরামর করে রাখার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার নামান্তর 'হোয়াইট মেনস বার্ডেন'। কিন্তু আফগানরা প্রাচ্যভূমির ছোটজাত বলে নিজের মোট নিজেই বইবার চেষ্টা করে। সাধারণত এই মোট নিয়ে প্রথম কাড়াকাড়ি লাগায় 'ধর্মপ্রাণ' মিশনারীরা, তাই আফগানিস্থানে তাদের ঢোকা কড়া বারণ। কোনো অবস্থাতেই মিশনারীকে পাসপোর্ট দেওয়া হয় না। মিশনারীর পরে আসে ইংরেজ। তাদেরও আমরা পারতপক্ষে ঢুকতে দিই না—ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের জন্য যে ক'জন ইংরেজের নিতান্ত প্রয়োজন তাদেরি আমরা বড় অনিচ্ছায় বরদাস্ত করেছি।'

এই দুটি খবর আমাব কর্ণকুহরে মথি ও মার্ক লিখিত দুই সুসমাচারের ন্যায় মধুসিঞ্চন করল। গুলিস্তান, বোস্তানের খুশবাই হয়ে সকল দুর্গন্ধ মেরে ফেলে আমার চোখে গোলাপী ঘুমের মোলায়েম তন্দ্রা এনে দিল।

'জিন্দাবাদ আফগানিস্থান!'—না হয় থাকলই বা লক্ষ লক্ষ ছারপোকা সে দেশের চারপাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে জিন্দা হয়ে।

দশ

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল আজান শুনে। নমাজ পড়ালেন বুখারার এক পুস্তিন সদাগর। উৎকৃষ্ট আরবী উচ্চারণ শুনে বিস্ময় মানলুম যে তুর্কীস্থানে এত ভালো উচ্চারণ টিকে রইল কী করে। বেতারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না।' আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে করেন?' আমার এ সঙ্কোচে তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে বুঝতে পারলুম, খাস প্রাচ্য দেশে অচেনা অজানা লোককে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই। পরে জানলুম, যার সম্বন্ধে কৌতূহল দেখানো হয় সে তাতে বরঞ্চ খুশিই হয়।

মোটরে বসে তারি খেই তুলে নিয়ে আগের রাতের অভিজ্ঞতার জমাখরচা নিতে লাগলুম।

গ্রেট ঈস্টার্ন পান্থশালা, আফগান সরাইও পান্থশালা। সরাইয়ের আরাম-ব্যারাম তো দেখা হল—গ্রেট ঈস্টার্ন, গ্যাণ্ডেরও খবর কিছু কিছু জানা আছে।

মার্কস না পড়েও চোখে পড়ে যে সরাই গরীব, হোটেল ধনী। কিন্তু প্রশ্ন তাই দিয়ে কি সব পার্থক্যের

অর্থ করা যায়? সরাইয়েও জন আষ্টেক এমন সদাগর ছিলেন যাঁরা অনায়াসে গ্রেট ঈস্টার্নের সুইট নিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে। গ্রেট ঈস্টার্নের বড়সায়েবদেরও কিছু কিছু চিনি।

কিন্তু আচারব্যবহারে কী ভয়ঙ্কর তফাত। এই আটজন ধনী সদাগর ইচ্ছে করলেই একত্র হয়ে উত্তম খানাপিনা করে জুয়োয় দু' শ' চার শ' টাকা এদিক ওদিকে উড়িয়ে দিয়ে রাত কাটাতে পারতেন। চাকরবাকর সন্ত্রস্ত হয়ে হুজুরদের হুকুম তামিল করত—সরাইয়ের ভিখিরি ফকিরদের তো ঠেকিয়ে রাখতই, সাধুসজ্জনদের সঙ্গেও এঁদের কোনো যোগাযোগ হত না।

পৃথক হয়ে আপন আপন দ্বিরদরদস্তম্ভে এঁরা তো বসে থাকলেনই না—আটজনে মিলে 'খানদানী' গোঠও এঁরা পাকালেন না। নিজ নিজ পণ্যবাহিনীর ধনী গরীব আর পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের দহরম-মহরম আগের থেকে তো ছিলই, তার উপরে সরাইয়ে আসন পেতে জিরিয়েজুরিয়ে নেওয়ার পর তাঁরা আরো পাঁচজনের তত্ত্বতালাশ করতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে হরেক রকমের আড্ডা জমে উঠল; ধনী গরীবের পার্থক্য জামা কাপড়ে টিঁকে থাকল বটে, কিন্তু কথাবার্তায় সে সব তফাত রইল না। দু-চারটে মোসায়েব 'ইয়েসমেন' ছিল সন্দেহ নেই, তা সে গরীব আড্ডা-সর্দারেরও থাকে। ব্যবসাবাণিজ্য, তত্ত্বকথা, দেশ-বিদেশের রাস্তাঘাট-গিরিসঙ্কট, ইংরেজ-রুশের মন-কষাকষি, পাগলা উট কামড়ালে তার দাওয়াই, সর্দারজীর মাথার ছিট, সব জিনিস নিয়েই আলোচনা হল। গরীব ধনী সকলেরই সকল রকম সমস্যা আড্ডার দয়ে মজে কখনো ডুবল, কখনো ভাসল; কিন্তু বাকচতুর গরীবও ধনীর পোলাও-কর্মলিয়ার আশায় বেশরম বাঁদরনাচ নাচল না।

ঝগড়া-কাজিয়াও আড্ডার চোখের সামনে চাতালে হচ্ছে। কথাবার্তার খোঁচাখুঁচিতে যতক্ষণ উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট ততক্ষণ আড্ডা সে সব দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, কিন্তু মারামারির পূর্বাভাস দেখা দিলেই কেউ না কেউ মধ্যস্থ হয়ে বখেড়া ফৈসালা করে দেয়। মনে পড়ল বায়স্কোপের ছবি; সেখানে দুই সায়েবে ঝগড়া লাগে, আর পাঁচজন হটে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ায়। দুই সায়েব তখন কোট খুলে ছুঁড়ে ফেলেন, আর সক্কলের দয়ার শরীর, কোটটাকে ধুলোয় গড়াতে দেন না, লুফে নেন। তারপর শুরু হয় ঘুষোঘুষি রক্তারক্তি। পাঁচজন বিনা টিকিটে তামাসা দেখে আর সমস্ত বর্বরতাটাকে 'অন্য লোকের নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার' নাম দিয়ে ক্ষীণ বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায়।

সরাইয়ে কারো কোনো নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নেই। তাই পার্সোনাল ইডিয়সিংক্রেসি বা খেয়াল খুশির ছিট নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না। অথবা বলতে পারেন, সক্কলেই যে যার খুশি মত কাজ করে যাচ্ছে, আপনি আপত্তি জানাতে পারবেন না, আর আপনিও আপনার পছন্দ মত যা খুশি করে যাবেন, কেউ বাধা দেবে না । হাতাহাতি না হলেই হল।

তাতে করে ভালো মন্দ দুই-ই হয়। একদিকে যেমন গরম, ধুলো, তৃষ্ণা সত্ত্বেও মানুষ একে অন্যকে প্রচুর বরদাস্ত করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সকলেই সরাইয়ের কুঠরি-চত্বর নির্মমভাবে নোংরা করে।

একদিকে নিবিড় সামাজিক জীবনযাত্রা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিকাশ। অর্থাৎ 'কম্যুনিটি সেন্স' আছে কিন্তু 'সিভিক সেন্স' নেই।

ভাবতে ভাবতে দেখি সরাইয়ে এক রাত্রি বাস করেই আমি আফগান তুর্কোমান সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছি। হুঁশিয়ার হয়ে ভিতরের দিকে তাকানো বন্ধ করলুম। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়েই বা দেখব আর কী? সেই আগের দিনকার জনপদ বা জনশূন্য শিলাপর্বত।

সর্দারজীকে বললুম, 'রাত্তিরে যখন গা বিড়োচ্ছিল তখন একটু সুপুরি পেলে বড় উপকার হত। কিন্তু সরাইয়ে পানের দোকান তো দেখলুম না।'

সর্দারজী বললেন, 'পান কোথায় পাবেন, বাবুসায়েব? পেশাওয়ারেই শেষ পানের দোকান। তার পশ্চিমে আফগানিস্থান, ইরান, ইরাকের কোথাও পান দেখিনি—পল্টনে ড্রাইভারি করার সময় এসব

দেশ আমার ঘোরা হয়ে গিয়েছে। পাঠানও তো পান খায় না। পেশাওয়ারের পানের দোকানের গাহক সব পাঞ্জাবী।'

তাই তো। মনে পড়ল, কলুটোলা জাকারিয়া স্ট্রীটে হোটেলের গাড়ি বারান্দার বেঞ্চে বসে কাবুলীরা শহর রাঙা করে না বটে। আরো মনে পড়ল, দক্ষিণভারতে বর্মা মালয়ে এমন কি খাসিয়া পাহাড়েও প্রচুর পান খাওয়া হয়—যদিও এদের কেউই কাশী-লক্ষ্ণৌয়ের মত তরিবৎ করে জিনিসটার রস উপভোগ করতে জানে না। তবে কি পান অনার্য জিনিস? 'পান' কথাটা তো আর্য—'কর্ণ' থেকে 'কান', 'পর্ণ' থেকে 'পান'। তবে 'সুপুরি'? উঁহুঁ, কথাটা তো সংস্কৃত নয়। লক্ষ্ণৌয়ে বলে 'ডলি' অথবা 'ছালিয়া' —সেগুলোও তো সংস্কৃত থেকে আসেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে 'গুয়া' কথাটার 'গুবাক' না 'গূবাক' কী একটা সংস্কৃত রূপ আছে না? কিন্তু তাহলেও তো কোনো কিছুর সমাধান হয় না, কারণ পাঞ্জাব দোয়াব এসব উন্নাসিক আর্যভূমি ত্যাগ করে খাঁটি গুবাক হঠাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়ে গাছের ডগায় আশ্রয় নেবেন কেন? আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের সব মাঙ্গলিকেই সুপুরির প্রয়োজন হয়, কিন্তু গৃহ্যসূত্রের ফিরিস্তিতে গুবাক— গুবাক? নাঃ। মনে তো পড়ে না। তবে কি এ নিতান্তই অনার্যজনসুলভ সামগ্রী? পূর্বপ্রাচ্য থেকে উজিয়ে উজিয়ে পেশাওয়ার অবধি পৌঁচেছে? সাধে বলি, ভারতবর্ষ তাবৎ প্রাচ্য সভ্যতার মিলনভূমি।

ডিমোক্রেসি ডিমোক্রেসি জিগির তুলে বড্ড বেশি চেঁচামেচি করাতে দক্ষিণভারতের এক সাধক বলেছিলেন, 'তাহলে সবাই ঘুমিয়ে পড়। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষে মানুষে ভেদ থাকে না, সবাই সমান।' সেই গরমে বসে বসে তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করলুম। ঝাঁকুনি, ধুলো, কঠিন আসন, ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্ত্বেও বেতারকর্তা ও আমার দু'জনেরই ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর মাথা আমার কাঁধে ঢলে পড়ছিল, আমি তখন শক্ত হয়ে বসে তাঁর ঘুমে তা দিচ্ছিলুম। তারপর হঠাৎ একটা জোর ঝাঁকুনি খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে তিনি আমার কাছে মাফ চেয়ে শক্ত হয়ে বসছিলেন। তখন আমার পালা। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভদ্রতার বেড়া ভেঙে আমার মাথা তাঁর কাঁধে জিরিয়ে নিচ্ছিল।

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রথম পরশ পেলুম; খুলে দেখি সামনে সবুজ উপত্যকা—রাস্তার দুদিকে ফসল ক্ষেত। সর্দারজী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'জলালাবাদ।'

দক্কার পাশের সেই কাবুল নদীর কৃপায় এই জলালাবাদ শস্যশষ্পশ্যামল। এখানে জমি বোধহয় দক্কার মত পাথরে ভর্তি নয় বলে উপত্যকা রীতিমত চওড়া—একটু নিচু জমিতে বাস নামার পর আর তার প্রসারের আন্দাজ করা যায় না। তখন দু'দিকেই সবুজ, আর লোকজনের ঘরবাড়ি। সামান্য একটি নদী ক্ষুদ্রতম সুযোগ পেলে যে কী মোহন সবুজের লীলাখেলা দেখাতে পারে জলালাবাদে তার অতি মধুর তসবির। এমনকি যে দুটো-চারটে পাঠান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেহারাও যেন সীমান্তের পাঠানের চেয়ে মোলায়েম বলে মনে হল। লক্ষ্য করলুম, যে পাঠান শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের 'বেপর্দামির' নিন্দা করে, তারি বউ-ঝি ক্ষেতে কাজ করছে অন্য দেশের মেয়েদেরই মত। মুখ তুলে বাসের দিকে তাকাতেও তাদের আপত্তি নেই। বেতারকর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমার যতদূর জানা, কোনো দেশের গরীব মেয়েই পর্দা মানে না, অন্তত আপন গাঁয়ে মানে না। শহরে গিয়ে মধ্যবিত্তের অনুকরণে কখনো পর্দা মেনে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টা করে, কখনো কাজ-কর্মের অসুবিধা হয় বলে গাঁয়ের রেওয়াজই বজায় রাখে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আরবের বেদুইন মেয়েরা?'

তিনি বললেন, 'আমি ইরাকে তাদের বিনা পর্দায় ছাগল চরাতে দেখেছি।'

থাক উপস্থিত এ সব আলোচনা। গোটা দেশটা প্রথমে দেখে নিই, তারপর রীতি-রেওয়াজ ভালোমন্দের বিচার করা যাবে।

গাড়ি সদর রাস্তা ছেড়ে জলালাবাদ শহরে ঢুকল। কাবুলীরা সব বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এক

মিনিটের ভিতর অন্তর্ধান। কেউ একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, বাস ফের ছাড়বে কখন। আমার তো এই প্রথম যাত্রা, তাই সর্দারজীকে শুধালুম, 'বাস আবার ছাড়বে কখন?' সর্দারজী বললেন, 'আবার যখন সবাই জড়ো হবে।' জিজ্ঞেস করলুম, 'সে কবে?' সর্দারজী যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,'আমি তার কী জানি? সবাই খেয়েদেয়ে ফিরে আসবে যখন, তখন।'

বেতারকর্তা বললেন, 'ঠায় দাঁড়িয়ে করছেন কী? আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'আর সব গেল কোথায়? ফিরবেই বা কখন?'

তিনি বললেন, 'ওদের জন্য আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? আপনি তো ওদের মালজানের জিম্মাদার নন।'

আমি বললুম, 'তাতো নই-ই। কিন্তু যেরকমভাবে ফুট্ করে সবাই নিরুদ্দেশ হল তাতে তো মনে হল না যে ওরা শিগগির ফিরবে। আজ সন্ধ্যায় তা হলে কাবুল পৌঁছব কী করে?'

বেতাবকর্তা বললেন, ' সে আশা শিকেয় তুলে রাখুন। এদের তো কাবুল পৌঁছবার কোনো তাড়া নেই। বাস যখন ছিল না, তখন ওরা কাবুল পৌঁছত পনেরো দিনে, এখন চারদিন লাগলেও তাদের আপত্তি নেই। ওরা খুশি, ওদের হেঁটে যেতে হচ্ছে না, মালপত্র তদারক করে গাধা-খচ্চরের পিঠে চাপাতে নামাতে হচ্ছে না, তাদের জন্য বিচুলির সন্ধান করতে হচ্ছে না। জলালাবাদে পৌঁচেছে, এখানে সকলেরই কাকা-মামা-শালা, কেউ না কেউ আছে, তাদের তত্ত্বতালাশ করবে, খাবেদাবে, তারপর ফিরে আসবে।'

আমি চুপ করে গেলুম। দক্কাতে অফিসারকে বলেছিলুম, 'আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে,' এখন বুঝতে পারলুম সব মানুষই কিছু না কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। তফাত শুধু এইটুকু, কেউ করে জেনে, কেউ না জেনে।

আফগানিস্থানের বড় শহর পাঁচটি। কাবুল, হিরাত, গজনী, জলালাবাদ, কান্দাহার। জলালাবাদ আফগানিস্থানের শীতকালের রাজধানী। তাই এখানে রাজপ্রাসাদ আছে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য খাস পান্থনিবাস আছে।

বেতারবাণী যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু উপস্থিত জলালাবাদের বাজার দেখে আফগানিস্থানের অন্যতম প্রধান নগর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেলুম না। সেই নোংরা মাটির দেয়াল, অত্যন্ত গরীব দোকানপাট---সস্তা জাপানী মালে ভর্তি বিস্তর চায়ের দোকান, আর অসংখ্য মাছি। হিমালয়ের চটিতে মানুষ যে রকম মাছি সম্বন্ধে নির্বিকার এখানেও ঠিক তাই।

হঠাৎ আখ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। চৌকো চৌকো করে কেটে দোকানের সামনে সাজিয়ে রেখেছে এবং তার উপরে দুনিয়ার সব মাছি বসাতে চেহারা চালে-তিলের মত হয়ে গিয়েছে। ঘিনপিত ঝেড়ে ফেলে কিনলুম এবং খেয়ে দেখলুম, দেশের আখের চেয়েও মিষ্টি। সাধে কি বাবুর বাদশা এই আখ খেয়ে খুশি হয়ে তার নমুনা বদখশান-বুখারায় পাঠিয়েছিলেন? তারপর দেখি, নোনা ফুটি শশা তরমুজ। ঘন সবুজ আর সোনালি হলদেতে ফলের দোকানে রঙের অপূর্ব খোলতাই হয়েছে—খুশবাই চতুর্দিক মাত করে রেখেছে। দরদস্তুর না করে কিনলেও ঠকবার ভয় নেই। রপ্তানি করার সুবিধে নেই বলে সব ফলই বেজায় সস্তা। বেতারবার্তা জ্ঞান বিতরণ করে বললেন, 'যারা সত্যিকারের ফলের রসিক তারা এখানে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা ফল খেয়েই কাটায় আর যারা পাঁড় মেওয়া-খোর তারা শীতকালেও কিসমিস আখরোট পেস্তা বাদামের উপর নির্ভর করে। মাঝে মাঝে রুটি-পনির আর ক্বচিৎ কখনো এক টুকরো মাংস। এরাই সব চাইতে দীর্ঘজীবী হয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এদের গায়ে বুলেট লাগে না বুঝি? জলালাবাদের ফল তা হলে মন্ত্রপূত বলতে হয়।'

বেতারবার্তা বললেন, 'জলালাবাদের লোক গুলি খেতে যাবে কেন? তারা শহরে থাকে, আইনকানুন মানে, হানাহানির কিবা জানে?'

কিন্তু জলালাবাদের যথার্থ মাহাত্ম্য শহরের বাইরে। আপনি যদি ভূবিদ্যার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে চান তবে কিঞ্চিৎ খোঁড়াখুড়ি করলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আপনি যদি নৃতত্ত্বের অনুসন্ধান করতে চান তবে চারিদিকের নানাপ্রকারের অনুন্নত উপজাতি আপনাকে দেদার মালমশলা যোগাড় করে দেবে। যদি মার্কসবাদের প্রাচ্যদেশীয় পটভূমি তৈরি করতে চান তবে মাত্র এঙ্গেল্‌সের 'অরিজিন অব দি ফ্যামিলি' খানা সঙ্গে নিয়ে আসুন, বাদবাকি সব এখানে পাবেন—জলালাবাদের গ্রামাঞ্চলে পরিবার পত্তনের ভিৎ, আর একশ' মাইল দূরে কাবুলে রাষ্ট্রনির্মাণের গম্বুজশিখর বিরাজমান। যদি ঐতিহাসিক হন তবে গান্ধারী, সিকন্দর, বাবুর, নাদিরের বিজয় অভিযান বর্ণনায় কতটা খাঁটি কতটা ঝুটা নিজের হাতে যাচাই করে নিতে পারবেন। যদি ভূগোল অর্থনীতির সমন্বয়ে প্রমাণ করতে চান যে তিন ফোঁটা নদীর জল কী করে নব নব মন্বন্তরের কারণ হতে পারে তাহলে জলালাবাদে আস্তানা গেড়ে কাবুল নদীর উজান ভাঁটা করুন। আর যদি গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রয়াগভূমির অনুসন্ধান করেন তবে তার রঙ্গভূমি তো জলালাবাদের কয়েক মাইল দূরে হাদ্দা গ্রামে। ধ্যানী বুদ্ধ, কঙ্কালসার বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার-শৈলীর যত উদাহরণ চান সব উপস্থিত। মাটির উপরে কিঞ্চিৎ, ভিতরে প্রচুর। ঢিপিঢাপা দেখামাত্র অজ্ঞ লোকেও বলতে পারে।

আর যদি আপনি পাণ্ডিত্যের বাজারে সত্যিকার দাঁও মারতে চান তবে দেখুন, সিন্ধুর পারে মোন্-জো-দড়ো বেরল, ইউফ্রেটিস টাইগ্রিসের পারে আসিরীয় বেবিলনীয় সভ্যতা বেরল, নীলের পারে মিশরীয় সভ্যতা বেরল—এর সব কটাই পৃথিবীর প্রাকআর্য প্রাচীন সভ্যতা। শুনতে পাই, নর্মদার পারে ঐরকম একটা দাঁও মারার জন্য একপাল পণ্ডিত মাথায় গামছা বেঁধে শাবল নিয়ে লেগে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে বাজার কোণঠাসা করতে পারবেন না, উল্টে দেউলে হবার সম্ভাবনাই বেশি। আর যদি নিতান্তই বরাতজোরে কিছু একটা পেয়ে যান তবে হবেন না হয় রাখাল বাঁড়ুজ্যে। একপাল মার্শাল উড়োউড়ি করছে, ছোঁ মেরে আপনারি কাঁচামাল বিলেতে নিয়ে গিয়ে তিন ভল্যুম চামড়ায় বেঁধে আপনারি মাথায় ছুঁড়ে মারবে। শোনেননি, গুণী বলেছেন, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দুবার ঠকলে তোমার দোষ।' তাই বলি, জলালাবাদ যান, মোন্-জো-দড়োর কনিষ্ঠ ভ্রাতার উদ্ধার করুন, তাতে ভারতের গর্ব বারো আনা, আফগানিস্থানের চার আনা। বিশেষত যখন আফগানিস্থানে কাক চিল নেই—আপনার মেহন্নতের মাল নিয়ে তারা চুরিচামারি করবে না।

জানি, পণ্ডিতমাত্রই সন্দেহ-পিশাচ। আপনিও বলবেন, 'না হয় মানলুম, জলালাবাদের জমির শুধু উপরেই নয়, নিচেও বিস্তর সোনার ফসল ফলে আছে, কিন্তু প্রশ্ন, চতুর্দিক থেকে অ্যাদ্দিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলির পাল সেখানে ঝামেলা লাগায়নি কেন?'

তার কারণ তো বেতারবাণী বহু পূর্বেই বলে দিয়েছেন। ইংরেজ এবং অন্য হরেক রকম সাদা বুলবুলিকে আফগান পছন্দ করে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাণ্ডিত্যাম্বরে উপস্থিত যে কয়টি পক্ষী উড্ডীয়মান তাদের সর্বাঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠ, এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আপনার রঙ দিব্য বাদামি, আপনি প্রতিবেশী, আফগান আপনাকে বহু শতাব্দী ধরে চেনে—আপনি না হয় তাকে ভুলে গিয়েছেন, আপনারি জাতভাই বহু ভারতীয় এখনো আফগানিস্থানে ছোটখাটো নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি এমনকি বসবাসও করে। আপনাকে আনাচে কানাচে ঘুরতে দেখলে কাবলীওয়ালা আর যা করে করুক, আঁৎকে উঠে কোঁৎকা খুঁজবে না।

তবু শুনবেন না? সাধে বলি, সব কিছু পণ্ড না হলে পণ্ডিত হয় না।

এগার

মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পৌঁছবার আর কোনো ভরসাই রইল না।

পেশাওয়ার থেকে জলালাবাদ একশ' মাইল, জলালাবাদ থেকে কাবুল আরো একশ' মাইল। শাস্ত্রে লেখে সকালে পেশাওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জলালাবাদ পৌঁছবে। পরদিন ভোরবেলা জলালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, শাস্ত্র মানে অল্প লোকেই। পরে জানলুম একমাত্র মেল বাস ছাড়া আর কেউ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বেগে চলে না।

জলালাবাদের আশেপাশে গাঁয়ের ছেলেরা রাস্তায় খেলাধুলো করছে। তারি এক খেলা মোটরের জন্য রাস্তায় গোলকধাঁধা বানিয়ে দেওয়া। কায়দাটা নতুন। কাবুলীরা যে আগুার মত শক্ত টুপির চতুর্দিকে পাগড়ি জড়ায় ছোঁড়ারা সেই টুপি এমনভাবে রাস্তায় সাজিয়ে রাখে যে, হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ি না চালালে দুটো চারটে থেৎলে দেবার সম্ভাবনা। দূর থেকে সেগুলো দেখতে পেলেই সর্দারজী দাড়িগোঁফের ভিতরে বিড়বিড় করে কী একটা গালাগাল দিয়ে মোটরের বেগ কমান। কয়েকবার এ রকম লক্ষ্য করার পর বললুম, 'দিন না দুটো-চারটে থেৎলে। ছোঁড়াদের তাহলে আক্কেল হয়।' সর্দারজী বললেন, 'খুদা পনাহ্, এমন কর্ম করতে নেই। আর টায়ার ফাঁসাতে চাইনে।' আমি বুঝতে না পেরে বললুম, ' সে কী কথা, এই টুপিগুলো আপনার টায়ার ছ্যাঁদা করে দেবে?' তিনি বললেন, 'আপনি খেলাটার আসল মর্মই ধরতে পারেননি। টুপির ভিতরে রয়েছে মাটিতে শক্ত করে পোঁতা লম্বা লোহা। যদি টুপি বাঁচিয়ে চলি তবে গাড়ি বাঁচানো হল, যদি টুপি থেৎলাই, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়েও কুড়োল মারা হল।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ ছোকরারা মোটরওয়ালাদের শেখাতে চায়, 'পরের অপকার করিলে নিজের অপকার হয়।'

সর্দারজী বললেন, 'ওঃ, আপনার কী পরিষ্কার মাথা!'

বেতারবাণী বললেন, 'কিন্তু প্রশ্ন, এই মহান শিক্ষা এল কোথা হতে?'

আমি নিবেদন করলুম, 'আপনিই বলুন।'

তিনি বললেন, 'ছোঁড়াদের খেলাতে রয়েছে, বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শের ভগ্নাবশেষ। জানেন, এককালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রসারপ্রতিপত্তি ছিল।'

আমি বললুম, 'তাই তো শুনেছি।'

তিনি বললেন, 'শুনেছি মানে? একটুখানি ডাইনে হাঁটলেই পৌঁছবেন হাদ্দায়। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন কত বৌদ্ধ মূর্তি বেরিয়েছে মাটির তলা থেকে। আপনি কি ভাবছেন সে আমলের লোক নানা রকম মূর্তি জড়ো করে যাদুঘর বানাত?'

এ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন, 'কনিষ্কের আমলে গান্ধারবাসীরা যাদুঘর নির্মাণ করিত কি না?'

ফেল মারলুম। কিন্তু বাঙালী আর কিছু পারুক না পারুক, বাজে তর্কে খুব মজবুত। বললুম, 'কিন্তু কাল রাত্রে সরাইয়ে নিজের 'জান-মাল'—থুড়ি, 'মাল-জান' সম্বন্ধে যে সতর্কতার হুঙ্কার শুনতে পেলুম, তা থেকে তো মনে হল না প্রভু তথাগতের সাম্যমৈত্রীর বাণী শুনছি।'

বেতারবার্তা বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে অহিংস শিশুশাবক ও স্ত্রীলোকের ধর্ম। পূর্ণবয়স্ক, প্রাণবন্ত দুর্ধর্ষ পুরুষের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

সর্দারজী খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'আমি তো গ্রন্থসাহেব মানি, কিন্তু একথা বার বার স্বীকার করব যে, এই আধা-ইনসান পাঠান জাতকে কেউ যদি ধর্মের পথে নিয়ে যেতে পারে তবে সে ইসলাম।'

আমি তো ভয় পেয়ে গেলুম। এইবার লাগে বুঝি। 'আধা-ইনসান' অর্থাৎ 'অর্ধ-মনুষ্য' বললে কার রক্ত গরম না হয়। কিন্তু বেতারবাণী অত্যন্ত সৌম্য কণ্ঠে বললেন, 'আপনি বিদেশী এবং আমাদের সকলের চেয়ে বেশি লোকজনের সংস্রবে এসেছেন, তার উপর আপনি বয়সে প্রবীণ। আপনার এই

মত শুনে ভারি খুশি হলুম।'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কৌতূহল দমন করতে না পেরে গাড়ির ঝড়ঝড়ানির সঙ্গে গলা মিলিয়ে সর্দারজীকে আস্তে আস্তে উর্দুতে শুধালুম, 'একী কাণ্ড? আপনি এঁর জাত তুলে এঁকে আধা-ইনসান বললেন, আর ইনি খুশি হয়ে আপনাকে তসলীম করলেন!'

সর্দারজী আরো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ইনি চটবেন কেন? ইনি তো কাবুলী।'

আমি আরো সাত হাত জলে। ফের শুধালুম, 'কাবুলী পাঠান নয়?'

সর্দারজী তখন আমার অজ্ঞতা ধরতে পেরে বুঝিয়ে বললেন, 'আফগানিস্থানের অধিবাসী পাঠান। কিন্তু খাস কাবুলের লোক ইরান দেশ থেকে এসে সেখানে বাড়িঘরদোর বেঁধে শহর জমিয়েছে। তাদের মাতৃভাষা ফার্সী। পাঠানের মাতৃভাষা পশতু। বেতারের সায়েব পশতু ভাষার এক বর্ণও বোঝেন না।'

আমি বললুম, 'তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু কলকাতার কাবুলীওয়ালারা তো ফার্সী বোঝে না।'

'তার কারণ কলকাতার কাবুলীরা কাবুলের লোক নয়। তারা সীমান্ত, খাইবার বড় জোর চমন কান্দাহারের বাসিন্দা। খাস কাবুলী পারতপক্ষে কাবুল শহরের সীমানার বাইরে যায় না। যে দু'দশ জন যায় তারা সদাগর। তাদের পাল্লা ঐ পেশাওয়ার অবধি।'

এত জ্ঞান দান করেও সর্দারজীর আশ মিটল না। আমাকে শুধালেন, 'আপনি 'কাবুলীওয়ালা', 'কাবুলীওয়ালা' বলেন কেন? কাবুলের লোক হয় হবে 'কাবুলী,' নয় 'কাবুলওয়ালা'। 'কাবুলীওয়ালা' হয় কী করে?'

হকচকিয়ে গেলুম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কাবুলীওয়ালা'। গুরুকে বাঁচাই কী করে? আর বাঁচাতে তো হবেই কারণ—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়,

তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

সামলে নিয়ে বললুম, 'এই আপনি যে রকম 'জওয়াহিরাত' বলেন। 'জওহর' হল একবচন; 'জওয়াহির' বহুবচন। 'জওয়াহিরে' ফের 'আত' লাগিয়ে আরো বহুবচন হয় কী প্রকারে?'

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিন্তু মাছ দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিনা সে প্রশ্ন অন্য যে কোনো দেশে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কিন্তু পাঠান-মুল্লুকের আইন, এক খুনের বদলে আরেক খুন। তাই সে যাত্রা সর্দারজীর সামনে ইজ্জত বজায় রেখে ফাঁড়া কাটাতে পারলুম।

অবশ্য দরকার ছিল না। সর্দারজী তখন মোড় নিতে ব্যস্ত। আমি ভাবলুম, ম্যাপে দেখেছি জলালাবাদ থেকে কাবুল সোজা নাকবরাবর রাস্তা—গাড়ি আবার মোড় নিচ্ছে কেন?

বেতারবাণী হল, 'সেই ভালো, আজ যখন কিছুতেই কাবুল পৌঁছনো যাবে না, তখন নিমলার বাগানেই রাত কাটানো যাক।'

দূর থেকেই সারি সারি চিনার গাছ চোখে পড়ল। সুপারির চেয়ে উঁচু—সোজা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। বুক অবধি ডালপালা নেই, বাকিটুকু মসৃণ ঘন পল্লবে আন্দোলিত। আমাদের বাঁশপাতার সঙ্গে কচি অশথপাতার সৌন্দর্য মিলিয়ে দিয়ে দীর্ঘ বিনুনির মত যদি কোনো পল্লবের কল্পনা করা যায় তবে তাই হয় চিনারের পাতা। কিন্তু তার দেহটির সঙ্গে অন্য কোনো গাছের তুলনা হয় না। ইরানী কবিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তন্বঙ্গী তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরঙ্গিমার সঙ্গে চিনারের দেহসৌষ্ঠবের তুলনা করে এখনো তৃপ্ত হননি। মৃদুমন্দ বাতাসে চিনার যখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে মন্থরে আন্দোলিত করে, তখন রসকষহীন পাঠান পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বারে বারে তার দিকে তাকায়। সুপারির দোলের সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে, কিন্তু সুপারির রঙ শ্যামলিমাহীন কর্কশ, আর সমস্তক্ষণ ভয় হয়, এই বুঝি ভেঙে পড়ল।

মনে হয়, মানুষ ছাড়া অন্য যে কোনো প্রাণী চিনারের দেহচ্ছন্দকে তরুণীর চেয়ে মধুর বলে স্বীকার

করবে।

বেতারওয়ালা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনো খবরই রাখেন না। সর্দারজীর কাছ থেকে বেশি আশা করাও অন্যায়, কিন্তু তিনিই বললেন নিমলার বাগান আর তাজমহলের বাগান নাকি একই সময়কার। নিমলার বাগানে যে প্রাসাদ ছিল সেটি অভিযান আক্রমণ সহ্য না করতে পেরে অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু সারিবাঁধানো রমণীয় চিনারগুলো নাকি শাহজাহানের হুকুমে পোঁতা। সর্দারজীর ঐতিহাসিক সত্যতা এখানে অবশ্য উদ্ভিদবিদ্যা দিয়ে পরখ করে নেবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এই অজানা অচেনা দেশে শাহজাহানের তৈরি তাজের কনিষ্ঠ উদ্যানে ঢুকছি কল্পনা করাতে যে সুখ, উদ্ভিদতত্ত্বের মোহমুদ্গর দিয়ে সে মায়াজাল ছিন্ন করে কী এমন চরম মোক্ষলাভ! বাগানে আর এমন কিছু চারুশিল্পও নেই যার কৃতিত্ব শাহজাহানকে দিয়ে দিলে অন্য কারো ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। আর এ কথাও তো সত্য যে শাহজাহানের আসন উঁচু করার জন্য নিমলার বাগানের প্রয়োজন হয় না—এক তাজই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

তবু স্বীকার করতে হবে অতি অল্প আয়াসের মধ্যে উদ্যানটি প্রাণাভিরাম। চিনারের সারি, জল দিয়ে বাগান তাজা রাখবার জন্য মাঝখানে নালা আর অসংখ্য নরগিস ফুলের চারা। নরগিস ফুল দেখতে অনেকটা রজনীগন্ধার মত, চারা হুবহু একই রকম অর্থাৎ ট্যুবরোজ জাতীয়। গ্রীক দেবতা নারসিসাস নাকি আপন রূপে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত দিন নদীর জলে আপন চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দেবতারা বিরক্ত হয়ে শেষটায় তাঁকে নদীর পারের ফুল গাছে পরিবর্তিত করে দিলেন। এখনো নারসিসাস ফুল—ফার্সীতে নরগিস—ঠিক তেমনি নদীর জলে আপন ছায়ার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যা কাটল নালার পারে, নরগিস বনের এক পাশে, চিনার মর্মরের মাঝখানে। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু চিনার পল্লব থেকে মুছে যাওয়ার পর ডাকবাঙলোর খানসামা আহার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে সেখানেই চারপাই আনিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শেষরাত্রে ঘুম ভাঙল অপূর্ব মাধুরীর মাঝখানে। হঠাৎ শুনি নিতান্ত কানের পাশে জলের কুলুকুলু শব্দ আর আমার সর্বদেহ [illegible]য়ে, নাকমুখ ছাপিয়ে কোন অজানা সৌরভ সুন্দরীর মধুর নিশ্বাস।

শেষরাত্রে নৌকা যখন [illegible] ছেড়ে নদীতে নামে তখন যেমন নদীর কুলকুল শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, জানলার পাশে শিউলি গাছ [illegible]কলে শরতের অতি ভোরে যে রকম তন্দ্রা টুটে যায় এখানে তাই হল, কিন্তু দুয়ে মিলে গিয়ে। এ সঙ্গীত বহুবার শুনেছি কিন্তু তার সঙ্গে এহেন সৌরভসোহাগ জীবনে আর কখনো পাইনি।

সেই আধা-আলোঅন্ধকারে চেয়ে দেখি দিনের বেলার শুকনো নালা জলে ভরে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে, নরগিসের পা ধুয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। বুঝলুম, নালার উজানে দিনের বেলায় বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করা হয়েছিল—ভোরের আজানের সময় নিমলা বাগানের পালা; বাঁধ খুলে দিতেই নালা ছাপিয়ে জল ছুটেছে—তারি পরশে নরগিস নয়ন মেলে তাকিয়েছে। এর গান ওর সৌরভে মিশে গিয়েছে।

আর যে চিনারের পদপ্রান্তে উভয়ের সঙ্গীত সৌরভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মির নবীন অভিষেকের জন্য। দেখতে না দেখতে চিনার সোনার মুকুট পরে নিল, পদপ্রান্তে পুষ্পবনের গন্ধধূপে বৈতালিক মুখরিত হয়ে উঠল—

'এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার,
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার?'

বারো

ভোরের নমাজ শেষ হতেই সর্দারজী ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হল তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন আজ সন্ধ্যেয় যে করেই হোক কাবুল পৌঁছবেন।

বেতার-সায়েবের দিলও খুব চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সর্দারজীর সঙ্গে নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন ও আমাকে আফগানিস্থান সম্বন্ধে নানা কাজের খবর, নানা রঙীন গুজব বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য, কতটা কল্পনা, কতটা ডাহা মিথ্যে বুঝবার মত তথ্য আমার কাছে ছিল না, কাজেই একতরফা গল্প জমে উঠল ভালোই। তারই একটা বলতে গিয়ে ভূমিকা দিলেন, সামান্য জিনিস মানুষের সমস্ত জীবনের ধারা কী রকম অন্য পথে নিয়ে ফেলতে পারে শুনুন!

'প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই নিমলার বাগানেই জন চল্লিশ কয়েদী আর তাদের পাহারাওয়ালারা রাত কাটিয়ে সকালবেলা দেখে একজন কী করে পালিয়েছে। পাহারাওয়ালাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। কাবুল থেকে যতগুলো কয়েদী নিয়ে বেরিয়েছিল জলালাবাদে যদি সেই সংখ্যা না দেখাতে পারে তবে তাদের যে কী শাস্তি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের আইনজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। কেউ বলল, ফাঁসি দেবে, কেউ বলল, গুলি করে মারবে, কেউ বলল, জ্যান্ত শরীর থেকে টেনে টেনে চামড়া তুলে ফেলবে। জেল যে হবেই সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, আর আফগান জেলের অবস্থা আর কেউ জানুক না জানুক তারা বিলক্ষণ জানত। একবার সে জেলে ঢুকলে সাধারণত কেউ আর বেরিয়ে আসে না—যদি আসে তবে সে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে, অথবা অন্যের স্কন্ধের উপর সোয়ার হয়ে কফিনের ভিতর শুয়ে শুয়ে। আফগান জেল সম্বন্ধে তাই যেসব কথা শুনতে পাবেন তার বেশির ভাগই কল্পনা—মরা লোকে তো আর কথা কয় না।

'তা সে যাই হোক, পাহারাওয়ালারা তো ভয়ে আধমরা। শেষটায় একজন বুদ্ধি বাৎলাল যে, রাস্তার যে কোনো একটা লোককে ধরে নিয়ে গোঁজামিল দিতে।

'পাছে অন্য লোক জানতে পেরে যায় তাই তারা তাড়াতাড়ি নিমলার বাগান ছেড়ে রাস্তায় বেরল। চতুর্দিকে নজর, কাউকে যদি একাএকি পায় তবে তাকে দিয়ে কাজ হাসিল করবে। ভোরের অন্ধকার তখনো কাটেনি। এক হতভাগা গ্রামের রাস্তার পাশে প্রয়োজনীয় কর্ম করতে এসেছিল। তাকে ধরে শিকলি পরিয়ে নিয়ে চলল আর সকলের সঙ্গে জলালাবাদের দিকে।

'সমস্ত রাস্তা ধরে তাকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের সকল রকম ভয় দেখিয়ে পাহারাওয়ালারা শাসিয়ে বলল, 'জলালাবাদের জেলর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যেন শুধু বলে, 'মা খু চিহল্ ও পঞ্জম্ হস্তম্' অর্থাৎ 'আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।' ব্যস আর কিছু না।

'লোকটা হয় আকাট মূর্খ ছিল, না হয় ভয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল অথবা এও হতে পারে যে সে ভেবে নিয়েছিল যে যদি কোনো কয়েদী পালিয়ে যায়, তবে সকলের পয়লা রাস্তায় যে সামনে পড়ে তাকেই সরকারী নম্বর পুরিয়ে দিতে হয়। অথবা হয়ত ভেবে নিয়েছিল রাস্তার যে কোনো লোককে রাজার হাতি যখন মাথায় তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারে, তখন তাকে জেলখানায়ই বা নিয়ে যেতে পারবে না কেন?'

বেতারবাণী বললেন, 'গল্পটা আমি কম করে জন পাঁচেকের মুখে শুনেছি। ঘটনাগুলোর বর্ণনায় বিশেষ হেরফের হয় না কিন্তু ঐ হতভাগা কেন যে জলালাবাদের জেলরের সামনে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবার চেষ্টা একবারও করল না সেই বিচিত্র।'

সর্দারজী শুধালেন 'অন্য কয়েদীরাও চুপ করে রইল?'

বেতারওয়ালা বললেন, 'তাদের চুপ করে থাকার প্রচুর কারণ ছিল। সব ক'টা কয়েদীই ছিল একই ডাকাত দলের। তাদেরই একজন পালিয়েছে—অন্য সকলের ভরসা সে যদি বাইরে থেকে তাদের জন্য কিছু করতে পারে। তার পালানোতে অন্য সকলের যখন সড় ছিল তখন তারা কিছু বললে

তো তাকে ধরিয়ে দেবারই সুবিধে করে দেওয়া হত।

'তা সে যাই হোক, সেই হতভাগা তো জলালাবাদের জাহান্নমে গিয়ে ঢুকল। কিছুদিন যাওয়ার পর আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারল কী বোকামিই সে করেছে। তখন একে ওকে বলে কয়ে আলা হজরত বাদশার কাছে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা দিয়ে সে দরখাস্ত পাঠাবার চেষ্টা করল। কিন্তু জলালাবাদের জেলের দরখাস্ত সহজে হুজুরের কাছে পৌঁছয় না। জেলরও ভয় পেয়ে গিয়েছে, ভালো করে সনাক্ত না করে বেকসুর লোককে জেলে পোরার সাজাও হয়ত তার কপালে আছে। অথবা হয়ত ভেবেছে, সমস্তটাই গাঁজা, কিম্বা ভেবেছে, জেলের আর পাঁচজনের মত এরও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

'জলালাবাদের জেলের ভিতরে কাগজ-কলমের ছড়াছড়ি নয়। অনেক ঝুলোঝুলি করে সে দরখাস্ত লেখায়, তারপর সে দরখাস্তের কী গতি হয় তার খবর পর্যন্ত বেচারীর কানে এসে পৌঁছয় না।

'বিশ্বাস করবেন না, এই করে করে একমাস নয় দু'মাস নয়, এক বৎসর নয় দু'বৎসর নয়-- ঝাড়া ষোলটি বৎসর কেটে গিয়েছে। তার তখন মনের অবস্থা কী হয়েছে বলা কঠিন, তবে আন্দাজ করা বোধ করি অন্যায় নয় যে, সে তখন দরখাস্ত পাঠানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে।

'এমন সময় তামাম আফগানিস্থান জুড়ে খুব বড় একটা খুশির জশন (পরব) উপস্থিত হল। মুইন্-উস-সুলতানের (যুবরাজের) শাদী অথবা তাঁর প্রথম ছেলে জন্মেছে। আমির হবীব উল্লা খুশির জোশে অনেক দান-খয়রাত করলেন ও সে খয়রাতির বরসাত কথাসুখা জেলগুলোতেও পৌঁছল। শীতকাল, আমির তখন জলালাবাদে। ফরমান বেরল, জলালাবাদের জেলর যেন তাবৎ কয়েদীকে হুজুরের সামনে হাজির করে। হুজুর তাঁর বেহদ মেহেরবানি ও মহব্বতের জোড়ে বে-এখতেয়ার হয়ে হুকুম দিয়ে ফেলেছেন যে খুদ তিনি হরেক কয়েদীর ফরিয়াদ-তকলিফের খানাতল্লাশি করবেন।

'বিস্তর কয়েদী খালাস পেল, তারো বেশি কয়েদীর মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া হল। করে করে শেষটায় নিমলার সেই হতভাগা হুজুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'হুজুর শুধালেন, 'তু কীস্তী', 'তুই কে?'

'সে বলল, 'মা খু চিহল্ ও পঞ্জম হস্তম্' অর্থাৎ 'আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।'

'হুজুর যতই তার নামধাম রসুবসাজার কথা জিজ্ঞাসা করেন সে ততই বলে সে শুধু পঁয়তাল্লিশ নম্বরের। ঐ এক বুলি, এক জিগির। হুজুরের সন্দেহ হল, লোকটা বুঝি পাগল। ঠাহর করবার জন্য অন্য নানা রকমের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল, সূর্য কোন দিকে ওঠে, কোন দিকে অস্ত যায়, মা ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, না ছেলে মাকে। সব কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেয়, কিন্তু তার নিজের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে, 'আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।'

'ষোল বছর ঐ মন্ত্র জপ করে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে, তার নাম নেই ধাম নেই সাকিন ঠিকানা নেই, তার পাপ নেই পুণ্য নেই, জেলের ভিতরের বন্ধন নেই, বাইরের মুক্তিও নেই---তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তার সর্বৈব সত্তা ঐ এক মন্ত্রে, 'আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।'

'শত দোষ থাকলেও আমির হবীব উল্লার একটা গুণ ছিল; কোনো জিনিসের খেই ধরলে তিনি জট না ছাড়িয়ে সন্তুষ্ট হতেন না। শেষটায় সেই ডাকাতদের যে দু'-একজন তখনো বেঁচেছিল তারাই রহস্যের সমাধান করে দিল।

'শুনতে পাই খালাস পাওয়ার পরও, বাকি জীবন সে ঐ পঁয়তাল্লিশ নম্বরের ভানুমতী কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

গল্প শুনে আমার সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পরিপক্ক বৃদ্ধ সর্দারজীর মুখে শুধু 'আল্লা মালিক', 'খুদা বাঁচানেওয়ালা।'

ততক্ষণে চড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাবুল যেতে হলে যে সাত আট হাজার ফুট পাহাড় চড়তে

হয় সিমলার কিছুক্ষণ পরেই তার আরম্ভ।

শিলেট থেকে যারা শিলঙ গিয়েছেন, দেরাদুন থেকে মসৌরী, কিম্বা মহাবলেশ্বরের কাছে পশ্চিম ঘাট উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের পক্ষে এ রকম রাস্তার চুলের কাঁটার বাঁক, হাঁসুলি চাকের মোড় কিছু নতুন নয়—নতুনত্বটা হচ্ছে যে, এ রাস্তা কেউ মেরামত করে দেয় না, এখানে কেউ রেলিং বানিয়ে দেয় না, বিশেষ সংকীর্ণ সংকট পেরবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দু'দিকের মোটর আটকানো হয় না। মাটি ধসে রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে যতক্ষণ না জন আষ্টেক ড্রাইভার আটকা পড়ে আপন আপন শাবল দিয়ে রাস্তা সাফ করে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতমশায়ের 'রাধে গো ব্রজসুন্দরী, পার করো' বলা ছাড়া অন্য কিছু করবার নেই। যাঁরা শীতকালে এ রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে রাস্তার বরফও নিজেদের সাফ করতে হয়। অবশ্য বরফ সাফ করাতে আভিজাত্য আছে—শুনেছি স্বয়ং হুমায়ুন বাদশাহ নাকি শের শাহের তাড়া খেয়ে কাবুল না কান্দাহার যাবার পথে নিজ হাতে বরফ সাফ করেছিলেন।

শিলঙ-নৈনিতাল যাবার সময় গাড়ির ড্রাইভার অন্তত এই সান্ত্বনা দেয় যে, দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। এখানে যদি কোনো ড্রাইভার এ রকম কথা বলে তবে আপনাকে শুধু দেখিয়ে দিতে হবে, রাস্তার যে কোনো এক পাশে, হাজার ফুট গভীর খাদে দুর্ঘটনায় অপমৃত দুটো একটা মোটর গাড়ীর কঙ্কাল। মনে পড়ছে কোন এক হিল-স্টেশনের চড়াইয়ের মুখে দেখেছিলুম, ড্রাইভারদের বুকে যমদূতের ভয় জাগাবার জন্য রাস্তার কর্তাব্যক্তিরা একখানা ভাঙা মোটর ঝুলিয়ে রেখেছেন—নিচে বড় বড় হরফে লেখা, 'সাবধানে না চললে এ অবস্থা তোমারও হতে পারে।' কাবুলের রাস্তার মুখে সে রকম ব্যাপক কোনো বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয় না—চোখ খোলা রাখলে দুদিকে বিস্তর প্রাঞ্জল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সবচেয়ে চিত্তির যখন হঠাৎ বাঁক নিয়ে সামনে দেখতে পাবেন আধ মাইল লম্বা উটের লাইন। একদিকে পাহাড়ের গা, আর একদিকে হাজার ফুট গভীর খাদ, মাঝখানে গাড়ি বাদ দিয়ে বাস্তার ক্লীয়ারিঙ এক হাত। তার ভিতর দিয়ে নড়বড়ে উট দূরের কথা, শান্ত গাধাও পেরতে পারে না। চওড়া রাস্তার আশায় আধ মাইল লম্বা উটের সারিকে পিছু ঠেলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তখন গাড়িই ব্যাক করে চলে উল্টো দিকে। সে অবস্থায় পিছনের দিকে তাকাতে পারেন এমন স্থিতপ্রজ্ঞ, এমন, স্নায়ুবিহীন 'দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনা' স্থিতধী মুনিপ্রবর আমি কখনো দেখিনি। সবাই তখন চোখ বন্ধ করে কলমা পড়ে আর মোটর না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর চোখ খুলে যা দেখে সেও পিলে চমকানিয়া। আস্তে আস্তে একটা একটা করে উট সেই ফাঁকা দিয়ে যাচ্ছে, তারপর বলা নেই কওয়া নেই একটা উট হঠাৎ আধপাক নিয়ে ফাঁকাটুকু চওড়াচওড়ি বন্ধ করে দেয়। পিছনের উটগুলো সঙ্গে সঙ্গে না থেমে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ঝামেলা লাগায়— স্রোতের জলে বাঁধ দিলে যে রকম জল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে উটটা রাস্তা বন্ধ করেছে তাকে তখন সোজা করে ফের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জন পাঁচেক লোক সামনে থেকে টানাটানি করে, আর জন বিশেক পিছন থেকে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা লাগায়। অবস্থাটা তখন অনেকটা ছোট গলির ভিতর আনাড়ি ড্রাইভার মোটর ঘোরাতে গিয়ে আটকা পড়ে গেলে যে রকম হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সেখানে হাজার ফুট গভীর খাদের ভয় নেই, আর আপনি হয়ত রকে বসে বিড়ি হাতে আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে গুষ্টিসুখ অনুভব করছেন।

এই অবস্থায় যদি পিছন থেকে আর এক সার উট এসে উপস্থিত হয় তবে ষ'টার সম্পূর্ণ খোলতাই হয়। আধ মাইল ধরে সমস্ত রাস্তা জুড়ে তখন ঢাকা-দক্ষিণের মেলার গোরুর হাট বসে যায়।

বুখারা-সমরকন্দ, শিরাজ-বদখশান সেই দ'য়ে মজে গিয়ে চিৎকার করে, গালাগাল দেয়, জট খোলে, ফের পাকায়, অস্ত্র সম্বরণ করে, দু'দণ্ড জিরিয়ে নেয়, ঢেলে সেজে ফের গোড়া থেকে উড্র কায়দায় আরম্ভ করে—

'ক' রে কমললোচন শ্রীহরি
'খ' রে খগ-আসনে মুরারি
'গ' রে গরুড়—

স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করাই যদি সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হয়, তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি আজও সেই রাস্তার মাঝখানে মোটরের ভিতর কনুয়ের উপর ভর করে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছি। জটপাকানো স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু সেটা কী করে খুলল, মোটর আবার কী করে চলল, একদম মনে নেই।

তেরো

ফ্রান্সের বেতারবাণী আরম্ভ হয় 'ইসি পারি' অর্থাৎ 'হেথায় প্যারিস' দিয়ে। কাবুল ইয়োরোপীয় কোনো জিনিস নকল করতে গেলে ফ্রান্সকে আদর্শরূপে মেনে নেয় বলে কাবুল রেডিয়ো দুই সন্ধ্যা আপন অভিজ্ঞান-বাণী প্রচারিত করে 'ইন্ জা কাবুল' অর্থাৎ 'হেথায় কাবুল' বলে।

মোটরে বেতারবাণী হল 'ইন্ জা কাবুল'। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে বলে বেতারযোগে প্যারিস অথবা কাবুলের যতটা দেখবার সুবিধে হয়, আমার প্রায় ততটাই হল।

হেডলাইটের জোরে কিছু যে দেখব তারও উপায় ছিল না। পূর্বেই বলেছি বাসখানার মাত্র একটি চোখ—সাঁঝের পিদিম দেখাতে গিয়ে সর্দারজী তার উপর আবিষ্কার করলেন যে, সে চোখটিও খাইবারের রৌদ্রদাহনে গান্ধারীর চোখের মত কানা হয়ে গিয়েছে। সর্দারজীর নিজের জন্য অবশ্য বাসের কোনো চোখেরই প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি রাতকানা। কিন্তু রাস্তার পঁয়তাল্লিশ নম্বরীদের উপকারের জন্য প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে একটা হারিকেন যোগাড় করা হল। হ্যাণ্ডিম্যান সেইটে নিয়ে একটা মাড-গার্ডের উপর বসল।

আমি সভয়ে সর্দারজীকে জিজ্ঞেস করলুম, 'হারিকেনের সামান্য আলোতে আপনার মোটর চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

সর্দারজী বললেন, 'হচ্ছে বইকি, আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওটা না থাকলে গাড়ি জোর চালাতে পারতুম।' মনে পড়ল, দেশের মাঝিরাও অন্ধকার রাত্রে নৌকার সম্মুখে আলো রাখতে দেয় না। কিন্তু 'ভাগ্য-বিধাতা' অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তো কবি তাঁরই হাতে গোটা দেশটার ভার ছেড়ে দিয়ে গেয়েছেন—

> পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা
> যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
> হে চির-সারথি, তব রথচক্রে
> মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

কিন্তু কবির তুলনায় দার্শনিক ঢের বেশি হুঁশিয়ার হয়। তাই বোধহয় কবির হাতে রাষ্ট্রের কী দুরবস্থা হতে পারে, তারই কল্পনা করে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে ভালো মন্দ সব কবিকেই অবিচারে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

এই সব তত্ত্বচিন্তা না করা ছাড়া তখন অন্য কোনো উপায় ছিল না। যদিও কাবুল উপত্যকার সমতল ভূমি দিয়ে তখন গাড়ি চলেছে তবু দুটো একটা মোড় সব সময়েই থাকার কথা। সে সব মোড় নেবার সময় আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করছিলুম এবং সেই খবরটি সর্দারজীকে দেওয়াতে তিনি যা বললেন, তাতে আমার সব ডর ভয় কেটে গেল। তিনি বললেন, 'আম্মো চোখ বন্ধ করি।' শুনে আমি যা চোখ বন্ধ করলুম তার সঙ্গে গান্ধারীর চোখ বন্ধ করার তুলনা করা যায়।

সে যাত্রা যে কাবুল পৌঁছতে পেরেছিলুম তার একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে, রগরগে উপন্যাসের

গোয়েন্দা শত বিপদেও মরে না—ভ্রমণকাহিনী লেখকের জীবনেও এই সূত্র প্রযোজ্য।

'গুমরুক' বা কাস্টম-হাউস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে—বিছানাখানা পর্যন্ত ছাড়ল না। টাঙা নিয়ে ফরাসী রাজদূতাবাসের দিকে রওয়ানা হলুম—কাবুল শহরে আমার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি সেখানেই থাকতেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আমার ফার্সীর অধ্যাপক ছিলেন ও তখন ফরাসী রাজদূতাবাসে কর্ম করতেন।

টাঙা তিন মিনিট চলার পরেই বুঝতে পারলুম মস্কো রেডিয়ো কোন ভরসায় তাবৎ দুনিয়ার প্রলেতারিয়াকে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ফতোয়া জারি করে। দেখলুম, কাবুল শহরে আমার প্রথম পরিচয়ের প্রলেতারিয়ার প্রতীক টাঙাওয়ালা আর কলকাতার গাড়িওয়ালায় কোনো তফাত নেই। আমাকে উজবুক পেয়ে সে তার কর্তব্য শেয়ালদার কাপ্তেনদের মত তখনি স্থির করে নিয়েছে।

বেতারওয়ালা তাকে পই পই করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ফরাসী দূতাবাস কী করে যেতে হয়, সেও বার বার 'চশ্‌ম্‌' 'বসর্‌ ও চশ্‌ম্‌' অর্থাৎ 'আমার মাথার দিব্যি' 'আপনার তালিম এবং হুকুম আমার চোখের জ্যোতির ন্যায় মূল্যবান' ইত্যাদি শপথ-কসম খেয়েছিল, কিন্তু কাজের বেলায় দু'মিনিট যেতে না যেতেই সে গাড়ি দাঁড় করায়, বেছে বেছে কাবুল শহরের সবচেয়ে আকাট মূর্খকে জিজ্ঞাসা করে ফরাসী দূতাবাস কী করে যেতে হয়।

অনেকে অনেক উপদেশ দিলেন। এক গুণী শেষটায় বললেন—'ফরাসী রাজদূতাবাস? সে তো প্যারিসে। যেতে হলে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'বোম্বাই গিয়ে জাহাজ ধরতে হয়। চল হে টাঙাওয়ালা, পেশোয়ার অথবা কান্দাহার—যেটা কাছে পড়ে সেখান থেকে বোম্বাই।'

টাঙাওয়ালা ঘড়েল। বুঝল,

> 'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা,
> আমি ঢাকার বাঙাল নহি গো।'

তখন সে লব-ই-দরিয়া, দেহ-আফগানান, শহর-আরা হয়ে ফরাসী রাজদূতাবাস পৌঁছল। কাবুল শহর ছোট—কম করে তিনবার সে আমাকে ঐ রাস্তা দিয়ে আগেই নিয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে পাহাড়—এর চেয়ে প্যাঁচালো কেপ অব্‌ গুড হোপ চেষ্টা করলেও হয় না।

আমি কিছু বললে এতক্ষণ ধরে সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে আমার কাঁচা ফার্সী সে বুঝতে পারে না। এবার আমার পালা। ভাড়া দেবার সময় সে যতই নানারকম যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে আমি ততই বোকার মত তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই আর একঘেয়ে আলোচনায় নতুনত্ব আনবার জন্য তার খোলা হাত থেকে আমারই দেওয়া দু'চার আনা কমিয়ে নিই। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাঙা ফার্সীকে একদম ক্ষুদ বানিয়ে দিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলি, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি ইমানদার লোক, বিদেশি বলে না জেনে বেশি দিয়ে ফেলেছি, অত বেশি নিতে চাও না। মা শা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ করুন, তোমার বেটাবেটির—'

পয়সা সরালেই সে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠে আল্লা-রসুলের দোহাই কাড়ে, আর ইমান-ইনসাফ সম্বন্ধে সাদী-রুমীর বয়েৎ আওড়ায়। এমন সময় অধ্যাপক বগদানফ এসে সব কিছু রফারফি করে দিলেন।

যাবার সময় সে আমাকে আর এক দফা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিয়ে, অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় শুধাল, 'আপনার দেশ কোথায়?'

বুঝলুম, গয়ার পাণ্ডার মত। ভবিষ্যৎ সতর্কতার জন্য।

কে বলে বাঙালী হীন? আমরা হেলায় লঙ্কা করিনি জয়?

রাতের বেলাই বগদানফ সায়েবের সঙ্গে আলাপ করার সুবিধা। সমস্ত রাত ধরে পড়াশোনা করেন,

আর দিনের বেলা যতটা পারেন ঘুমিয়ে নেন। সেই কারণেই বোধহয় তিনি ভারতবর্ষের সব পাখির মধ্যে পেঁচাকে পছন্দ করতেন বেশি। শান্তিনিকেতনে তিনি যে ঘরটায় ক্লাশ নিতেন, নন্দবাবু তারই দেয়ালে একটা পেঁচা এঁকে দিয়েছিলেন। বগদানফ সায়েব তাতে ভারি খুশি হয়ে নন্দবাবুর মেলা তারিফ করেছিলেন।

বগদানফ জাতে রুশ, মস্কোর বাসিন্দা ও কট্টর জারপন্থী। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় মস্কো থেকে পালিয়ে আজরবাইজান হয়ে তেহরান পৌঁছান। সেখান থেকে বসরা হয়ে বোম্বাই এসে বাসা বাঁধেন। ভালো পেহলেভী বা পহ্লবী জানতেন বলে বোম্বায়ের জরথুস্ত্রী কামা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে দিয়ে সেখানে অনেক পুথিপত্রের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে রুশ পণ্ডিতদের দুরবস্থায় সাহায্য করবার জন্য এক আন্তর্জাতিক আহ্বানে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সাড়া দেন এবং বোম্বাই-এ বগদানফের সঙ্গে দেখা হলে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে ফার্সীতে অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন।

১৯১৭ সালের পূর্বে বগদানফ রুশের পররাষ্ট্রবিভাগে কাজ করতেন ও সেই উপলক্ষে তেহরানে আট বৎসর কাটিয়ে অতি উৎকৃষ্ট ফার্সী শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পরবর্তী কালে ইরান যান, তখন সেখানে ফার্সীর জন্য অধ্যাপক অনুসন্ধান করলে পণ্ডিতেরা বলেন যে, ফার্সী পড়াবার জন্য বগদানফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পাওয়া অসম্ভব। কাবুলের অন্য জহুরীদের মুখেও আমি শুনেছি যে, আধুনিক ফার্সী সাহিত্যে বগদানফের লিখনশৈলী আপন বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে। ইয়োরোপীয় বহু ভাষা তো জানতেনই—তাছাড়া জগতাই, উসমানলী প্রভৃতি কতকগুলো অজানা অচেনা তুর্কী ভাষা উপভাষায় 'জবরদস্ত মৌলবী'ও ছিলেন। কাবুলের মত জগাখিচুড়ি শহরের দেশি বিদেশি সকলের সঙ্গেই তিনি তাঁদের মাতৃভাষায় দিব্য স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন।

একদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে কুসংস্কারে ভর্তি। বাঁ দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের চাঁদ দেখতে পেয়েছেন না তো গোখরোর ফণায় যেন পা দিয়েছেন। সেই দুর্ঘটনার তিন মাস পরেও যদি তাঁর পেয়ারা বেড়াল বমি করে, তবে ঐ বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে অপয়া চাঁদ দেখাই তার জন্য দায়ী। মইয়ের তলা দিয়ে গিয়েছ, হাত থেকে পড়ে আরশি ভেঙে গিয়েছে, চাবির গোছা ভুলে মেঝের উপর রেখেছিলে—আর যাবে কোথায়, সে রাত্রে বগদানফ সায়েব তোমার জন্য এক ঘণ্টা ধরে আইকনের সামনে বিড়বিড় করে নানা মন্ত্র পড়বেন, গ্রীক অর্থডক্স চার্চের তাবৎ সেন্টদের কাছে কান্নাকাটি করে ধন্না দেবেন, পরদিন ভোরবেলা তোমার চোখে মুখে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে তিন বৎসর ধরে অপেক্ষা করবেন তোমার কাছ থেকে কোনো দুঃসংবাদ পাবার জন্য। তিন বছর দীর্ঘ মেয়াদ, কিছু না কিছু একটা ঘটবেই। তখন বাড়ি বয়ে এসে বগদানফ সায়েব তোমার সামনে মাথা নিচু করে জানুতে হাত রেখে বসবেন, মুখে ঐ এক কথা 'বলিনি, তখন বলিনি?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'বড় বড় সাধক মহাপুরুষ যেন এক একটা কাঠের গুঁড়ি হয়ে ভেসে যাচ্ছেন। শত শত কাক তারই উপরে বসে বিনা মেহন্নতে ভবনদী পার হয়ে যায়।'

বগদানফের পাল্লায় পড়লে তিন দিনে দুনিয়ার কুল্লে কুসংস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে, এক মাসের ভিতর সেগুলো মানতে আরম্ভ করবেন, দু'মাসের ভিতর দেখতে পাবেন, বগদানফ-কাঠের গুঁড়িতে আপনি একা নন, আপনার এবং সায়েবের পরিচিত প্রায় সবাই তার উপরে বসে বসে ঝিমোচ্ছেন। ঘোর বেলেল্লা দু'একটা নাস্তিকের কথা অবিশ্যি আলাদা। তারা প্রেম দিলেও কলসির কানা মারে।

দয়ালু, বন্ধুবৎসল ও সদানন্দ পুরুষ। তার মুক্ত হস্তের বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলেছিলেন, 'ইল্ আশেৎ লে মাশিন আ পের্সে লে মাকারনি।' অর্থাৎ মাকারনি ফুটো করার জন্য তিনি মেশিন কেনেন। সোজা বাঙলায় কাকের ছানা কেনেন।

কাবুলের বিদেশি দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল ছিলেন বগদানফ সায়েব—একটি আস্ত প্রতিষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি হয় না । তাই তাঁর সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল।

চোদ্দ

এক বৃদ্ধা দুঃখ করে বলেছিলেন, পালা-পরবে নেমন্তন্ন পেলে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে মায়ের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। 'রেখে গেলে গলার আল, নিয়ে গেলে লোকের গাল।' তারপর বুঝিয়ে বলেছিলেন, বাড়িতে যদি মেয়েকে রেখে যাও তাহলে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম না মন্দ করলুম; সঙ্গে যদি নিয়ে যাও তবে সক্কলের কাছ থেকে একই গালাগাল, এতদিন ধরে বিয়ে দাওনি কেন?'

দেশভ্রমণে দেখলুম একই অবস্থা। মোকামে পৌঁছেই প্রশ্ন, দেশটার ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেব, কি দেব না। যদি না দাও তবে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম, না মন্দ করলুম। যদি দাও তবে লোকের গালাগাল নিশ্চিত খেতে হবে। বিশেষ করে আফগানিস্থানের বেলা, কারণ অরক্ষণীয়া কন্যার যে রকম বিয়ে হয়নি আফগানিস্থানেরও ইতিহাস তেমনি লেখা হয়নি। আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস পোঁতা আছে সে দেশের মাটির তলায়, আর ভারতবর্ষের পুরাণ-মহাভারতে। আফগানিস্থান গরীব দেশ, ইতিহাস গড়ার জন্য মাটি ভাঙবার ফুরসৎ আফগানেব নেই, মাটি যদি সে নিতান্তই খোঁড়ে তবে সে কাবুলী মোন্-জো-দড়ো বের করার জন্য নয়—কয়লার খনি পাবার আশায়। পুরাণ ঘাঁটাঘাঁটি করার মত পাণ্ডিত্য কাবুলীর এখনো হয়নি—আমাদেরই কতটা হয়েছে কে জানে? পুরাণের কতটা সত্যিকার ইতিহাস আর কতটা ইতিহাস-পাগলাদের বোকা বানাবার জন্য পুরাণকারের নির্মম অট্টহাস তারই মীমাংসা করতে অর্ধেক জীবন কেটে যায়।

আফগানিস্থানের অর্বাচীন ইতিহাস নানা ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে এদেশে ওদেশে, অন্তত চারখানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এদেশের মাল নিয়ে পণ্ডিতেরা নাড়াচাড়া করেছেন—মাহমুদ, বাবুরের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের পাঠান-তুর্কী-মোগল যুগের ইতিহাস লেখার জন্য। কিন্তু বাবুরের আত্মজীবনী সঙ্গে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় পণ্ডিত—আফগানের কথাই ওঠে না—কাবুল, হিন্দুকুশ, বদখশান্ বল্‌খ, মৈমানা হিরাতে ঘোরাঘুরি করেননি কারণ আফগান ইতিহাস লেখার শিরঃপীড়া নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত এখনও উদ্‌ব্যস্ত হননি। অথচ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আফগানিস্থানের ইতিহাস না লিখে ভারত-ইতিহাস লেখবার জো নেই, আফগান রাজনীতি না জেনে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ ঠাণ্ডা রাখবার কোনো মধ্যমনারায়ণ নেই।

গোদের উপর আরেক বিষ-ফোঁড়া—আফগানিস্থানের উত্তর ভাগ অর্থাৎ বল্‌খ-বদখশানের ইতিহাস তার সীমান্ত নদী আমুদরিয়ার (গ্রীক অক্সুস, সংস্কৃত বক্ষু) ওপারে তুর্কীস্থানের সঙ্গে, পশ্চিমভাগ অর্থাৎ হিরাত অঞ্চল ইরানের সঙ্গে, পূর্বভাগ অর্থাৎ কাবুল জলালাবাদ খাস ভারতবর্ষ ও কাশ্মীরের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা যুগে নানা রঙ ধরেছে। আফগানিস্থানের তুলনায় সুইটজারল্যাণ্ডের ইতিহাস লেখা ঢের সোজা—যদিও সেখানে তিনটে ভিন্ন জাত আর চারটে ভাষা নিয়ে কারবার।

আর শেষ বিপদ, যে দু'চারখানা কেতাব পত্র আছে সেগুলো খুললেই দেখতে পাবেন, পণ্ডিতেরা সব রামদা উঁচিয়ে আছেন। 'গান্ধার' লিখেই সেই রামদা—'?'—উঁচিয়েছেন অর্থাৎ 'গান্ধার কোথায়?' 'কম্বোজ' বললেই সেই খড়্গ— '?'— অর্থাৎ 'কম্বোজ বলতে কী বোঝো?' 'কম্বুকণ্ঠি' বা 'কম্বুগ্রীব' বলতে বোঝায় যার গলায় শাঁখের গায়ের তিনটে দাগ কাটা রয়েছে—যেমনতর বুদ্ধের গলায়। কম্বোজ দেশ কি তবে গিরি উপত্যকার কণ্ঠি ঝোলানো দেশ আফগানিস্থান, অথবা কম্বু যেখানে পাওয়া যায় অর্থাৎ সমুদ্র-পারের দেশ বেলুচিস্থান? এমন কি দেশগুলোর নামের পর্যন্ত ঠিক ঠিক বানান নেই, যেমন ধরুন, 'বল্‌খ'—কখনো বল্‌হিকা কখনো বাল্‌হিকা কখনো বাল্‌হীকা। সে কি তবে ফেরদৌসী উল্লিখিত বল্‌খ—যেখানে জরথুস্ত্র রাজা গুশ্‌তআস্‌পকে আবেস্তা মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন? সেখান

থেকেই কি আজকের দিনের কাবুলীরা জাফরান আর হিঙ নিয়ে আসে? কারণ ঐ দুয়ের নামই তো সংস্কৃতে বাল্‌হিকম্‌।

রাসেল বলেছেন, 'পণ্ডিতজন যে স্থলে মতানৈক্য প্রকাশ করেন মূর্খ যেন তথায় ভাষণ না করে।'

আমার ঠিক উল্টো বিশ্বাস—আমার মনে হয় ঠিক ঐ জায়গাযই তাব কিছু বলার সুযোগ—পণ্ডিতরা তখন একজোট হতে পারেন না বলে সে বারোয়ারি কিল থেকে নিষ্কৃতি পায়।

পণ্ডিতে মূর্খে মিলে আফগানিস্থান সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার মোটামুটি তত্ত্ব এই ঃ

আর্যজাতি আফগানিস্থান, খাইবারপাস হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—পামির, দার্দিস্থান বা পৈশাচভূমি কাশ্মীর হয়ে নয়। বোগাজ কো-ই বর্ণিত মিতানি রাজ্য ধ্বংসের পরে যদি এসে থাকে তবে প্রচলিত আফগান কিংবদন্তী যে আফগানরা ইহুদীদের অন্যতম পথভ্রষ্ট উপজাতি সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। অর্থাৎ কিংবদন্তী দেশ ঠিক রেখেছে কিন্তু পাত্র নিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে।

গান্ধারী কান্দাহার থেকে এসেছিলেন। পাঠান মেয়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখেই বোধকরি মহাভারতকার তাকে শতপুত্রবতী রূপে কল্পনা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভাবতবর্ষ ও আফগানিস্থানেব ইতিহাস স্পষ্টতর রূপ নিতে আরম্ভ করে। উত্তর-ভারতের ষোলটি রাজ্যের নির্ঘণ্টে গান্ধাব ও কাম্বোজের উল্লেখ পাই। তাদের বিস্তৃতি প্রসার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে পণ্ডিতেরা সেই রামদা দেখান।

এ যুগে এবং তারপরও বহুযুগ ধরে ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে যে রকম কোনো সীমান্তরেখা ছিল না, ঠিক তেমনি আফগান ও ইন্দো-ইরানিয়ান ভূমি পারস্যের মধ্যে কোনো সীমান্তভূমি ছিল না। বক্ষু বা আমুদরিয়ার উভয় পারেব দেশকে সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতের অংশরূপে ধরা হয়েছে, প্রাচীন ইরানী সাহিত্যে তাকে আবার ইরানের অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে।

তারপর ইরানী রাজা সায়েরাস (কুরশ) সম্পূর্ণ আফগানিস্থান দখল করে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। সিকন্দর শাহের সিন্ধুদেশ জয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ও পশ্চিম-সিন্ধু ইরানের অধীনে থাকে।

সিকন্দর উত্তর-আফগানিস্থান হয়ে ভারতবর্ষে ঢোকেন কিন্তু তাঁর প্রধান সৈন্যদল খাইবারপাস হয়ে পেশাওয়ারে পৌঁছায়। খাইবার পেরোবার সময় সীমান্তের পার্বত্য জাতি পাহাড়ের চূড়াতে বসে সিকন্দরী সৈন্যদলকে এতই উদ্বাস্ত করেছিল যে গ্রীক সেনাপতি তাদের শহর গ্রাম জ্বালিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সিকন্দরের সিন্ধুজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে রকম জোর দাগ কেটে গিয়েছে তেমনি গ্রীক অধিকারের ফলে আফগানিস্থানও ভৌগোলিক আরিয়া, আরাখোসিয়া, গেদ্রোসিয়া, পারোপানিসোদাই ও দ্রাঙ্গিয়ানা অর্থাৎ হিরাত, বল্‌খ্‌, কাবুল, গজনী ও কান্দাহার প্রদেশে বিভক্ত হয়ে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপ নিতে আরম্ভ করে।

সিকন্দর শাহের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ত উত্তর-ভারতবর্ষ দখল করে গ্রীকদের মুখোমুখি হন—ফলে হিন্দুকুশের উত্তরের বাল্‌হিক প্রদেশ ছাড়া সমস্ত আফগানিস্থান তাঁর অধীনে আসে। মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ভারতবর্ষের অংশ হয়ে থাকে।

ভারতীয় আর্যদের চতুর্বেদ ও ইরানী আর্যদের আবেস্তা একই সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু মৌর্যযুগে এক দিকে যেমন বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয় অন্যদিকে তেমনি ইরানী ও গ্রীক ভাস্কর্য শিল্প ভারতীয় কলাকে প্রায় সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে। অশোকের বিজয়স্তম্ভের মসৃণতা ইরানী ও তার রসবস্তু গ্রীক। সে-যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় কলার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার আকার রূঢ়, গতি পঙ্কিল কিন্তু সে ভবিষ্যৎ বিকাশের আশায় পূর্ণগর্ভ।

অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মাধ্যান্তিক নামক শ্রমণকে আফগানিস্থানে পাঠান। সমস্ত দেশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল কিনা বলবার উপায় নেই কিন্তু মনে হয় আফগানিস্থানের অনুর্বরতা বর্ণাশ্রমধর্মের অন্তরায় ছিল বলে আফগান জনসাধারণের পক্ষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। দুই শতাব্দীর ভিতরেই আফগানিস্থানের বহু গ্রীক সিথিয়ান ও তুর্ক বুদ্ধের শরণ নিয়ে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বেদ-আবেস্তার ঐতিহ্য বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখে।

উত্তর-আফগানিস্থানের বল্‌খ্‌ প্রদেশ মৌর্য সম্রাটদের যুগে গ্রীক সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। মৌর্যবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বল্‌খ্‌ অঞ্চলে গ্রীকদের ভিতর অন্তঃকলহ সৃষ্টি হয় ও বল্‌খের গ্রীকগণ হিন্দুকুশ অতিক্রম করে কাবুল উপত্যকা দখল করে। তারপর পাঞ্জাবে ঢুকে গিয়ে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদের একজন রাজা মেনান্দের (পালিধর্মগ্রন্থ 'মিলিন্দপঞ্‌হোর' রাজা মিলিন্দ) নাকি পূর্বে পাটলিপুত্র ও দক্ষিণে (আধুনিক) করাচী পর্যন্ত আক্রমণ করেন।

মধ্য ও দক্ষিণ-আফগানিস্থান তথা পশ্চিম-ভারতের গ্রীক রাজাদের কোনো ভালো বর্ণনা পাবার উপায় নেই। শুধু এক বিষয়ে ঐতিহাসিকদের তৃষ্ণা তাঁরা মেটাতে জানেন। কাবুল থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বেগ্রাম উপত্যকায় এঁদের তৈরি হাজার হাজার মুদ্রা প্রতি বৎসর মাটির তলা থেকে বেরোয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০ রাজ্যকালের ভিতর অন্তত উনত্রিশজন রাজা ও তিনজন রানীর নামে চিহ্নিত মুদ্রা এ-যাবৎ পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর উপরে গ্রীক ও খরোষ্ঠী এবং শেষের দিকের মুদ্রাগুলোর উপরে গ্রীক ও ব্রাহ্মী হরফে লেখা রাজারানীর নাম পাওয়া যায়।

এ যুগে রাজায় রাজায় বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল কিন্তু আফগানিস্থান ও পশ্চিম ভারতের যোগসূত্র অটুট ছিল।

আবার দুর্যোগ উপস্থিত হল। আমুদরিয়ার উত্তরের শক জাতি ইউয়ে-চিদের হাতে পরাজিত হয়ে আফগানিস্থান ছেয়ে ফেলল। কাবুল দখল করে তারা দক্ষিণ পশ্চিম দু'দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশে তাদের বসতি পাকাপাকি হলে পর এই অঞ্চলের নাম সংস্কৃতে শকদ্বীপ ও ইরানীতে শকস্তান হয়। বর্বর শকেরা ইরানী, গ্রীক ও ভারতীয়দের সংস্রবে এসে কিছুটা সভ্য হয়েছিল বটে কিন্তু আফগানিস্থানের ইতিহাসে তারা কিছু দিয়ে যেতে পারেনি।

শকদের হারায় ইন্দো-পার্থিয়ানরা। এদের শেষ রাজা গন্ধ-ফারনেস্‌ নাকি যীশু গ্রীস্টের শিষ্য সেন্ট টমাসের হাতে খ্রীস্টান হন। কিন্তু এই সেন্ট টমাসের হাতেই নাকি আবিসিনিয়াবাসী হাবশীরাও খ্রীস্টান হয় ও এঁরই কাছে মালাবার ও তামিলনাড়ের হিন্দুরাও নাকি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। মাদ্রাজের কয়েক মাইল দূরে এক পাহাড়ের উপর সেন্ট টমাসের কবর দেখানো হয়। কাজেই আফগানিস্থানে খ্রীস্টধর্ম প্রচার বোধ করি বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কুষণ সম্রাটদের ইতিহাস ভারতে অজানা নয়। কুষণ-বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম শক এবং ইরানী পার্থিয়ানদের হারিয়ে আফগানিস্থান দখল করেন। কনিষ্ক পশ্চিমে ইরান সীমান্ত ও উত্তরে কাশগড়, খোটান, ইয়ারকন্দ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। পেশাওয়ারের বাইরে কনিষ্ক যে স্তূপ নির্মাণ করিয়ে বুদ্ধের দেহাস্থি রক্ষা করেন তার জন্য তিনি গ্রীক শিল্পী নিযুক্ত করেন। সে শিল্পী ভারতীয়-গ্রীক, না আফগান-গ্রীক বলা কঠিন—দরকারও নেই—কারণ পশ্চিম-ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে তখনো সংস্কৃতিগত কোনো পার্থক্য ছিল না।

যে স্তূপে কনিষ্ক শেষ বৌদ্ধ অধিবেশনের প্রতিবেদন তাম্রফলকে খোদাই করে রেখেছিলেন তার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। জলালাবাদে যে অসংখ্য স্তূপ এখনো খোলা হয়নি তারই একটার ভিতরে যদি সে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তাহলে আফগান ঐতিহাসিকেরা (?) আশ্চর্য হবেন না। কনিষ্ককে যদি ভারতীয় রাজা বলা হয় তাহলে তাঁকে আফগান রাজা বলতেও কোনো আপত্তি নেই। ধর্মের

কথা এখানে অবান্তর—কনিষ্ক বৌদ্ধ হওয়ার বহু পূর্বে আফগানিস্থান তথাগতের শরণ নিয়েছিল।

ভারতবর্ষে কুষণ রাজ্য পতনের পরও আফগানিস্থানে কিদার কুষণগণ দু'শ' বছর রাজত্ব করেন।

এ যুগের সবচেয়ে মহৎ বাণী গান্ধার শিল্পে প্রকাশ পায়। ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে কলা বৌদ্ধধর্মকে রূপায়িত করে তার শেষ নিদর্শন দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তার যৌবনমধ্যাহ্ন আফগানিস্থান ও পূর্ব-তুর্কীস্থানের ষষ্ঠ শতকের শিল্পে স্বপ্রকাশ। গুপ্তযুগের শিল্পপ্রচেষ্টা গান্ধারের কাছে কতটা ঋণী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। ভারতবর্ষের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ কখনো কখনো গান্ধার শিল্পের নিন্দা করেছে— যেদিন বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখব সেদিন জানব যে, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানকে পৃথক করে দেখা পরবর্তী যুগের কুসংস্কার। বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণায় ভারত অনুভূতির ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমিকত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল পরবর্তী যুগে তা আর কখনো সম্ভবপর হয়নি। আফগানিস্থানের ভূগর্ভ থেকে যেমন যেমন গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বেরোবে সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের চারুকলার ইতিহাস লেখা হয়ে ভারতবর্ষকে তার ঋণ স্বীকার করাতে বাধ্য হবে।

ভারতবর্ষে যখন গুপ্ত-সম্রাটদের সুশাসনে সনাতনধর্ম বৈষ্ণব রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল, আফগানিস্থান তখনো বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেনি। মৌর্যদের মত গুপ্তরা আফগানিস্থান জয় করার চেষ্টা করেনি, কিন্তু আফগানিস্থানের পরবর্তী যুগের শক শাসনপতিগণ হীনবল। পঞ্চম শতকের চীনা পর্যটক ফা হিয়েন কাবুল খাইবার হয়ে ভারতবর্ষে আসবার সাহস করেননি, খুব সম্ভব আফগান সীমান্তের অরাজকতা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে অনেক দূরের অনেক কঠিন রাস্তা পামির কাশ্মীর হয়ে ভারতবর্ষ পৌঁছান।

তারপর বর্বর হূণ অভিযান ঠেকাতে গিয়ে ইরানের রাজা ফিরোজ প্রাণ দেন। হূণ অভিযান আফগানিস্থানের বহু মঠ ধ্বংস করে ভারতবর্ষে পৌঁছয় --গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে তাদের যে সব লড়াই হয় সেগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা আছে। এই হূণ এবং আফগানদের সংমিশ্রণের ফলে পরবর্তী যুগে রাজপুত বংশের সূত্রপাত। সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙ তাশকন্দ সমরকন্দ হয়ে, আমুদরিয়া অতিক্রম করে কাবুল পৌঁছন। কাবুলে তখন কিছু হিন্দু, কিছু বৌদ্ধ। ততদিনে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের নবজীবন লাভের স্পন্দন কাবুল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। শান্ত ভারতবাসীই যখন বেশীদিন বৌদ্ধধর্ম সইতে পারল না তখন দুর্ধর্ষ আফগানের পক্ষে যে জীবে দয়ার বাণী মেনে চলতে কষ্ট হয়েছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ করার কারণ নেই। হিউয়েন-সাঙ কান্দাহার গজনী কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশরূপে গণ্য করেছেন।

এখন আরব ঐতিহাসিকদের যুগ। তাঁদের মতে আরবরা যখন প্রথম আফগানিস্থানে এসে পৌঁছায় তখন সে দেশ কনিষ্কের বংশধর তুর্কী রাজার অধীনে ছিল। কিন্তু পরে তার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে ব্রহ্মাণ্য রাজ্য স্থাপন করেন। ৮৭১ সনে ইয়াকুব-বিন-লয়েস কাবুল দখল করেন। শাহিয়া বংশ তখন পাঞ্জাবে এসে আশ্রয় নেন—শেষ রাজা ত্রিলোচন পাল গজনীর সুলতান মাহমুদের হাতে ১০২১ সনে পরাজিত হন। আফগানিস্থানের শেষ হিন্দু রাজবংশের বাকি ইতিহাস কাশ্মীরে। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে তাঁদের বর্ণনা আছে।

এখানে এসে ভারতীয় পণ্ডিতগণ এক প্রকাণ্ড ঢেরা কাটেন। আমি পণ্ডিত নই, আমার মনে হয় তার কোনোই কারণ নেই। প্রথম আর্য অভিযানের সময়--কিম্বা তারও পূর্ব থেকে— আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ নানা যুদ্ধ বিগ্রহের ভিতর দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একই ঐতিহ্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখবার চেষ্টা করেছে। যদি বলা হয় আফগানরা মুসলমান হয়ে গেল বলে তাদের অন্য ইতিহাস তাহলে বলি, তারা একদিন অগ্নি উপাসনা করেছিল, গ্রীক দেবদেবীর পূজা করেছিল, বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করেছিল। তবুও যখন দুই দেশের ইতিহাস পৃথক করা যায় না, তখন তাদের মুসলমান হওয়াতেই হঠাৎ কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? বুদ্ধের শরণ নিয়ে

কাবুলী যখন মগধবাসী হয়নি তখন ইসলাম গ্রহণ করে সে আরবও হয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুসলিম আফগানিস্থান—বিশেষ করে কান্দাহার, গজনী, কাবুল, জলালাবাদ—বাদ দিলে ফ্রন্টিয়ার, বান্নু, কোহাট এমন কি পাঞ্জাবও বাদ দিতে হয়।

পার্থক্য তবে কোথায়? যদি কোনো পার্থক্য থাকে তবে সে শুধু এইটুকু যে, মাহমুদ-গজনীর পূর্বে ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস নেই, মাহমুদের পরে প্রতি যুগে নানা ভূগোল, নানা ইতিহাস লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের শক্ত জমি চোরাবালির উপর তো আর ইতিহাসের তাজমহল খাড়া করা হয় না।

মাহমুদের ইতিহাস নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল-বীরূনীর কথা বাদ দেবার উপায় নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল-বীরূনীর নাম করতে হয়। সংস্কৃত-আরবী অভিধান ব্যাকরণ সে যুগে ছিল না (এখনো নেই), অল-বীরূনী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোনো মাধ্যম ভাষা ছিলনা। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কী করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সম্বন্ধে 'তহকীক-ই-হিন্দ' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে এক অবিশ্বাস্য প্রহেলিকা।

একাদশ শতাব্দীতে অল-বীরূনী ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ লিখেছিলেন—প্রত্যুত্তরে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় আফগানিস্থান সম্বন্ধে পুস্তক লেখেননি। এক দাবশীকূহ ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউই আরবী ও সংস্কৃতে এরকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাতে পারেননি। এই বিংশ শতকেই ক'টি লোক সংস্কৃত আরবী দুই-ই জানেন আঙুলে গুণে বলা যায়।

ভারতবর্ষের পাঠান তুর্কী সম্রাটেরা আফগানিস্থানের দিকে ফিরেও তাকাননি, কিন্তু আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। আলাউদ্দীন খিলজীর সভাকবি আমীর খুসরু ফার্সীতে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর নাম ইরানে কেউ শোনেননি, কিন্তু কাবুল কান্দাহারে আজকের দিনেও তাঁর প্রতিপত্তি হাফিজ-সাদীর চেয়ে কম নয়। 'ইশকিয়া' কাব্যে দেবলা দেবী ও খিজর খানের প্রেমের কাহিনী পড়েননি এমন শিক্ষিত মৌলবী আফগানিস্থানে আজও বিরল।

আফগানিস্থান—বিশেষ করে গজনীর—দৌত্যে উত্তর-ভারতবর্ষে ফার্সী ভাষা তার সাহিত্যসম্পদ, বাইজনটাইন সেরাসীন ইরানী স্থাপত্য, ইতিহাস-লিখনপদ্ধতি, ইউনানী ভেষজবিজ্ঞান, আরবী-ফার্সী শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদি প্রচলিত হয়ে, নতুন নতুন ধারা বয়ে নব নব বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। একদিন আফগানিস্থান গ্রীক ও ভারতবাসীকে মিলিয়ে দিয়ে গান্ধার-কলার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, পাঠান তুর্কী যুগে সেই আফগানিস্থান আরব-ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষের হাত মিলিয়ে দিল।

তারপর তৈমুরের অভিযান। তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ সমরকন্দ ও হিরাতে নতুন শিল্প প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আফগানিস্থানের হিরাত অতি সহজেই তুর্কীস্থানের সমরকন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৈমুরের পুত্র শাহ-রুখ চীন দেশ থেকে শিল্পী আনিয়ে ইরানীদের সঙ্গে মিলিয়ে হিরাতে নবীন চারুকলার পত্তন করেন। তৈমুরের পুত্রবধূ গৌহর শাদ শিক্ষাদীক্ষায় রানী এলিজাবেথ, ক্যাথরিনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাঁর আপন অর্থে তৈরি মসজিদ-মাদ্রাসা দেখে তৈমুরের প্রপৌত্র বাবুর বাদশাহ চোখ ফেরাতে পারেননি। এখনো আফগানিস্থানে যেটুকু দেখবার আছে, সে ঐ হিরাতে—যে কয়টি মিনার ইংরেজের বর্বরতা সত্ত্বেও এখনো বেঁচে আছে, সেগুলো দেখে বোঝা যায় মধ্য-এশিয়ার সর্বকলাশিল্প কী আশ্চর্য প্রাণবলে সম্মিলিত হয়ে অনুর্বর দেশে কী অপূর্ব মরুদ্যান সৃষ্টি করেছিল।

অল-বীরূনীর পর গৌহর শাদ, তারপর বাবুর বাদশাহ।

শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতের নির্লজ্জ জাত্যাভিমানের চূড়ান্ত প্রকাশ হয় যখন সে বাবুরের আত্মজীবনী অপেক্ষা

জুলিয়াস সীজারের আত্মজীবনীর বেশি প্রশংসা করে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মুলতুবি থাক।

আফগানিস্থান ভ্রমণে যাবার সময় একখানা বই সঙ্গে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট—সে বই বাবুরের আত্মজীবনী। বাবুর কান্দাহার গজনী কাবুল হিরাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আজকের আফগানিস্থানের বিশেষ তফাত নেই।

বাবুর ফরগনার রাজা নন, আফগানিস্থানের শাহানশাহ নন, দিল্লীর সম্রাটও নন। আত্মজীবনীর অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পায়, বাবুর এসবের অতীত অত্যন্ত সাধারণ মাটির-গড়া মানুষ। হিন্দুস্থানের নববর্ষার প্রথম দিনে তিনি আনন্দে অধীর, জলালাবাদের আখ খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ—সেই আখ আপন দেশ ফরগনায় পোঁতবার জন্য টবে করে হিন্দুকুশের ভিতর দিয়ে চালান করেছেন, আর ঠিক তেমনি হিরাত থেকে গৌহর শাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা টবে করে নিয়ে এসে দিল্লিতে পুঁতে ভাবছেন এর ভবিষ্যৎ কী, এ তরু মঞ্জরিত হবে তো?

হয়েছিল। তাজমহল।

বাবুর ভারতবর্ষ ভালবাসেননি। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে বুঝতে পেরেছিলেন, ফরগনা কাবুলের লোভে যে বিজয়ী বীর দিল্লির তখ্‌ৎ ত্যাগ করে সে মূর্খ। দিল্লিতে নতুন সাম্রাজ্য স্থাপনা করলেন তিনি আপন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু দেহ কাবুলে পাঠাবার হুকুম দিলেন মরবার সময়।

সমস্ত কাবুল শহরে যদি দেখবার মত কিছু থাকে, তবে সে বাবুরের কবর।

হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব। নব মৌর্য সাম্রাজ্য।

নাদির উত্তর-ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে ফেরার পথে আফগানিস্থানে নিহত হন। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য আফগান আহমদ শাহ আবদালীর (সাদদোজাই দূররানী) হস্তগত হয়। ১৭৪৭ সালে সমস্ত আফগানিস্থান নিয়ে সর্বপ্রথম নিজস্ব রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৭৬১ সালে পানিপথ। ১৭৯৩ সালে শিখদের নবজীবন।

ইতিমধ্যে মহাকাল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ভারতবর্ষে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করেছেন। ভারত-আফগানের ইতিহাসে এই প্রথম এক জাতের মানুষ দেখা দিল যে এই দুই দেশের কোনো দেশকেই আপন বলে স্বীকার করল না। এ যেন চিরস্থায়ী তৈমুর-নাদির।

উনবিংশ এবং বিংশ শতকে ইংরেজ হয় আফগানিস্থান জয় করে রাজ্য স্থাপনা করার চেষ্টা করেছে, নয় আফগান সিংহাসনে আপন পুতুল বসিয়ে রুশের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আফগানিস্থান জয় করা কঠিন না হলেও দখল করা অসম্ভব। বিশেষত 'কাফির' ইংরেজের পক্ষে। আফগান মোল্লার অজ্ঞতা তার পাহাড়েরই মত উঁচু, কিন্তু ইংরেজকে সে বিলক্ষণ চেনে।

ইংরেজদের পরম সৌভাগ্য যে, ১৮৫৭ সালে আমির দোস্ত মুহম্মদ ইংরেজকে দোস্তি দেখিয়েছিল। তার চরম সৌভাগ্য যে, ১৯১৫ সালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আমির হবীব উল্লাকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করতে পারেননি।

কিন্তু তিনবারের বার বেল টাকে পড়ল। আমান উল্লা ইংরেজকে সামান্য উত্তম-মধ্যম দিয়েই স্বাধীনতা পেয়ে গেলেন। তাই বোধ হয় কাবুলীরা বলে 'খুদা-দাদ' আফগানিস্থান অর্থাৎ 'বিধিদত্ত' আফগানিস্থান।

জিন্দাবাদ খুদা-দাদ আফগানিস্থান!

পনেরো

বাসা পেলুম কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে খাজামোল্লা গ্রামে। বাসার সঙ্গে সঙ্গে চাকরও পেলুম। অধ্যক্ষ জিরার জাতে ফরাসী। কাজেই কায়দামাফিক আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর নাম আবদুর রহমান। আপনার সব কাজ করে দেবে—জুতো বুরুশ থেকে খুনখারাবি।' অর্থাৎ ইনি 'হরফন-

মৌলা' বা 'সকল কাজের কাজী।'

জিরার সায়েব কাজের লোক, অর্থাৎ সমস্ত দিন কোনো না কোনো মন্ত্রীর দপ্তরে ঝগড়া-বচসা করে কাটান। কাবুলে এরই নাম কাজ। 'ও রভোয়া, বিকেলে দেখা হবে' বলে চলে গেলেন।

কাবুল শহরে আমি দুটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আবদুর রহমান—দ্বিতীয়টির কথা সময় এলে হবে।

পরে ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলুম—ছ'ফুট চার ইঞ্চি। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেবে এসে আঙুলগুলো দু'কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দুখানা ডিঙি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হল, আমার বাবুর্চি আবদুর রহমান না হয়ে সে যদি আমির আবদুর রহমান হত, তবে অনায়াসে গোটা আফগানিস্থানের ভার বইতে পারত। এ কান ও কান জোড়া মুখ—হাঁ করলে চওড়াচওড়ি কলা গিলতে পাবে। এবড়ো-খেবড়ো নাক—কপাল নেই। পাগড়ি থাকায় মাথার আকার প্রকার ঠাহর হল না, তবে আন্দাজ করলুম বেবি সাইজের হ্যাটও কান অবধি পৌঁছবে।

রঙ ফর্সা, তবে শীতে গ্রীষ্মে চামড়া চিরে ফেঁড়ে গিয়ে আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের চেহারা ধরেছে। দুই গাল কে যেন থাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে—কিন্তু কার এমন বুকের পাটা? রুজও তো মাখবার কথা নয়।

পরনে শিলওয়ার, কুর্তা আর ওয়াস্‌কিট্।

চোখ দুটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথম দিন ঘরে ঢুকে কার্পেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কার্পেটের অপরূপ রূপ থেকে তাকে বড় একটা চোখ ফেরাতে দেখিনি। গুরুজনের দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্থানেও নাকি এই ধরনের একটা সংস্কার আছে।

তবে তার নয়নে ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। দুটো চিনেমাটির ডাবরে যেন দুটো পান্তুয়া ভেসে উঠেছে।

জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হল। এ লোকটা ভীমসেনের মত রান্না তো করবেই, বিপদে-আপদে ভীমসেনেরই মত আমার মুশকিল-আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনোদিন বিগড়ে যায়? তবে? কোনো একটা হদিসের সন্ধানে মগজ আঁতিপাতি করে খুঁজতে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে কুইনিন খেতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে? কুইনিন সরাবে কে?'

তিনি কুইনিন খাননি। কিন্তু আমি মুসলমান—হিন্দু যা করে, তার উল্টো করতে হয়। তদ্দণ্ডেই আবদুর রহমান আমার মেজর ডোমো, শেফ্ দ্য কুইজিন, ফাই-ফরমাস-বরদার তিনেক্কে তিন হয়ে একরারনামা পেয়ে বিড়বিড় করে যা বলল, তার অর্থ 'আমার চশম্, শির ও জান দিয়ে হুজুরকে খুশ করার চেষ্টা করব।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'পূর্বে কোথায় কাজ করেছ?'

উত্তর দিল, 'কোথাও না, পল্টনে ছিলুম, মেসের চার্জে। এক মাস হল খালাস পেয়েছি।'

'রাইফেল চালাতে পার?'

একগাল হাসল।

'কী কী রাঁধতে জানো?'

'পোলাও, কুর্মা, কাবাব, ফালুদা—'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফালুদা বানাতে বরফ লাগে। এখানে বরফ তৈরি করার কল আছে?'

'কিসের কল?'

আমি বললুম, 'তাহলে বরফ আসে কোত্থেকে?'

বলল, 'কেন, ঐ পাগমানের পাহাড় থেকে।' বলে জানলা দিয়ে পাহাড়ের বরফ দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু সবচেয়ে উঁচু নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, বরফ আনতে ঐ উঁচুতে চড়তে হয়?'

বলল, 'না সায়েব, এর অনেক নিচে বড় বড় গর্তে শীতকালে বরফ ভর্তি করে রাখা হয়। এখন তাই খুঁড়ে তুলে গাধা বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়।'

বুঝলুম, খবর-টবরও রাখে। বললুম, 'তা আমার হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন তো কিছু নেই। বাজার থেকে সব কিছু কিনে নিয়ে এসো। রাত্তিরের রান্না আজ আর বোধহয় হয়ে উঠবে না। কাল দুপুরের রান্না কোরো। সকালবেলা চা দিয়ো।'

টাকা নিয়ে চলে গেল।

বেলা থাকতেই কাবুল রওনা দিলুম। আড়াই মাইল রাস্তা—মৃদুমধুর ঠাণ্ডায় গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছব। পথে দেখি এক পর্বত প্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এত বোঝা বইবার কী দরকার ছিল—একটা মুটে ভাড়া করলেই তো হত।'

যা বলল তার অর্থ এই, সে যে মোট বইতে পারে না, সে মোট কাবুলে বইতে যাবে কে?

আমি বললুম, 'দু'জনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসতে।'

ভাব দেখে বুঝলুম, অতটা তার মাথায় খেলেনি, অথবা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি।

বোঝাটা নিয়ে আসছিল জালের প্রকাণ্ড থলেতে করে। তার ভিতর তেল-নুন-লকড়ি সবই দেখতে পেলুম। আমি ফের চলতে আরম্ভ করলে বলল, 'সায়েব রাতে বাড়িতেই খাবেন।' যেভাবে বলল, তাতে অচিন দেশের নির্জন রাস্তায় গাইগুই করা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। 'হাঁ হাঁ, হবে হবে' বলে কী হবে ভালো করে না বুঝিয়ে হনহন করে কাবুলের দিকে চললুম।

খুব বেশি দূর যেতে হল না। লব-ই-দরিয়া অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখি মঁসিয়ো জিরার টাঙা হাঁকিয়ে টগবগাবগ করে বাড়ি ফিরছেন।

কলেজের বড়কর্তা বা বস হিসাবে আমাকে তিনি বেশ দু'-এক প্রস্থ ধমক দিয়ে বললেন, 'কাবুল শহরে নিশাচর হতে হলে যে তাগদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, সে দুটোর একটাও তোমার নেই।'

বসকে খুশি করবার জন্য যার ঘটে ফন্দি-ফিকিরের অভাব, তার পক্ষে কোম্পানীর কাগজ হচ্ছে তর্ক না করা। বিশেষ করে যখন বসের উত্তমার্ধ তাঁরই পাশে বসে 'উই, সার্তেনমাঁ, এভিদামাঁ' অর্থাৎ অতি অবশ্য, সার্টেনলি, এভিডেন্টলি বলে তাঁর কথায় সায় দেন। ইংলণ্ডে মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া আলবার্ট আঁতাত হয়েছিল; শুনতে পাই ফ্রান্সে নাকি নিত্যি-নিত্যি, ঘরে ঘরে।

বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই আবদুর রহমান একটা দর্শন দিয়ে গেল এবং আমি যে তার তম্বিতেই ফিরে এসেছি, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে ফট করে বেরিয়ে গেল।

তখন রোজার মাস নয়, তবু আন্দাজ করলুম সেহরির সময় অর্থাৎ রাত দু'টোয় খাবার জুটলেও জুটতে পারে।

তন্দ্রা লেগে গিয়েছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। দেখি আবদুর রহমান মোগল তসবিরের গাড়ু বদনার সমন্বয় আফতাবে বা ধারাযন্ত্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুতে গিয়ে বুঝলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু কাবুল নদীর বরফ-গলা জলে মুখ কিছুদিন ধরে ধুলে আমার মুখও আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের উঁচুনিচুর টক্করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে।

খানা-টেবিলের সামনে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমার ভৃত্য আগা আবদুর রহমান খান এককালে মিলিটারি মেসের চার্জে ছিলেন।

ডাবর নয়, ছোটখাটো একটা গামলা ভর্তি মাংসের কোর্মা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন ক্বাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস—তার মাঝে মাঝে কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু

অপাংক্তেয় হওয়ার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামী কাবাব। বারকোশ পরিমাণ থালায় এক ঝুড়ি কোফতা-পোলাও আর তার উপরে বসে আছে একটি আস্ত মুর্গী-রোস্ট।

আমাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভয়বাণী দিল— রান্নাঘরে আরো আছে।

একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিনজনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়। কিন্তু সে যদি ছ'জনের রান্না পরিবেশন করে বলে রান্নাঘরে আরো আছে, তখন আর কী করার থাকে? অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

রান্না ভালো, আমার ক্ষুধাও ছিল, কাজেই গড়পড়তা বাঙালীর চেয়ে কিছু কম খাইনি। তার উপর অদ্য রজনী প্রথম রজনী এবং আবদুর রহমানও ডাক্তারী কলেজের ছাত্র যে রকম তন্ময় হয়ে মড়া কাটা দেখে, সেই রকম আমার খাওয়ার রকম-বহর দুই-ই তার ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।

আমি বললুম 'ব্যস! উৎকৃষ্ট রেঁধেছ আবদুর রহমান—।'

আবদুর রহমান অন্তর্ধান। ফিরে এল হাতে এক থালা ফালুদা নিয়ে। আমি সবিনয়ে জানালুম যে, আমি মিষ্টি পছন্দ করি না।

আবদুর রহমান পুনরপি অন্তর্ধান। আবার ফিরে এল এক ডাবর নিয়ে—পেঁজা বরফের গুঁড়ায় ভর্তি। আমি বোকা বনে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ আবার কী?'

আবদুর রহমান উপরের বরফ সরিয়ে দেখাল নিচে আঙুর। মুখে বলল, 'বাগেবালার বরকী আঙুর—তামাম আফগানিস্থানে মশহুর।' বলেই একখানা সসারে কিছু বরফ আর গোটা কয়েক আঙুর নিয়ে বসল। আমি আঙুর খাচ্ছি, ও ততক্ষণে এক-একটা করে হাতে নিয়ে সেই বরফের টুকরোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘষে—মেয়েরা যে রকম আচারের জন্য কাগজী লেবু পাথরের শিলে ঘষেন। বুঝলুম, বরফ-ঢাকা থাকা সত্ত্বেও আঙুর যথেষ্ট হিম হয়নি বলে এই মোলায়েম কায়দা। ওদিকে তালু আর জিবের মাঝখানে এক একটা আঙুরে চাপ দিতেই আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিনঝিন করে উঠছে। কিন্তু পাছে আবদুর রহমান ভাবে তার মনিব নিতান্ত জংলী, তাই খাইবারপাসের হিম্মৎ বুকে সঞ্চয় করে গোটা আষ্টেক গিললুম। কিন্তু বেশীক্ষণ চালাতে পারলুম না; ক্ষান্ত দিয়ে বললুম, 'যথেষ্ট হয়েছে আবদুর রহমান, এবারে তুমি গিয়ে ভাল করে খাও।'

কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। এবারে আবদুর রহমান এলেন চায়ের সাজসরঞ্জাম নিয়ে। কাবুলী সবুজ চা। পেয়ালায় ঢাললে অতি ফিকে হলদে রঙ দেখা যায়। সে চায়ে দুধ দেওয়া হয় না। প্রথম পেয়ালায় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পেয়ালায় তাও না। তারপর ঐ রকম তৃতীয়, চতুর্থ--কাবুলীরা পেয়ালা ছয়েক খায়, অবিশ্যি পেয়ালা সাইজে খুব ছোট, কফির পাত্রের মত।

চা খাওয়া শেষ হলে আবদুর রহমান দশ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। ভাবলুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দি, না হলে আবার হয়ত কিছু একটা নিয়ে আসবে। আস্ত উটের রোস্টটা হয়ত দিতে ভুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আবদুর রহমান পুনরায় হাজির। এবার এক হাতে থলে-ভর্তি বাদাম আর আখরোট, অন্য হাতে হাতুড়ি। ধীরে সুস্থে ঘরের এককোণে পা মুড়ে বসে বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়াতে লাগল।

এক মুঠো আমার কাছে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয়নি।'

'কে বলল, পছন্দ হয়নি?'

'তবে ভাল করে খেলেন না কেন?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী আশ্চর্য, তোমার বপুটার সঙ্গে আমার তনুটা মিলিয়ে দেখো দিকিন—তার থেকে আন্দাজ করতে পারো না, আমার পক্ষে কী পরিমাণ খাওয়া সম্ভবপর?'

আবদুর রহমান তর্কাতর্কি না করে ফের সেই কোণে গিয়ে আখরোট বাদামের খোসা ছাড়াতে লাগল।

তারপর আপন মনে বলল, 'কাবুলের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। পানি তো পানি নয়, সে যেন গলানো পাথর। পেটে গিয়ে এক কোণে যদি বসল তবে ভরসা হয় না আর কোনো দিন বেরবে। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয়—আতসবাজির হল্কা। মানুষের ক্ষিদে হবেই বা কী করে।'

আমার দিকে না তাকিয়েই তারপর জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর, কখনো পানশির গিয়েছেন?'

'সে আবার কোথায়?'

'উত্তর-আফগানিস্থান। আমার দেশ—সে কী জায়গা! একটা আস্ত দুম্বা খেয়ে এক ঢোক পানি খান, আবার ক্ষিদে পাবে। আকাশের দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিন, মনে হবে তাজী ঘোড়ার সঙ্গে বাজী রেখে ছুটতে পারি। পানশিরের মানুষ তো পায়ে হেঁটে চলে না, বাতাসের উপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।

'শীতকালে সে কী বরফ পড়ে! মাঠ পথ পাহাড় নদী গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ, বরফের তলায় রাস্তা চাপা পড়ে গেছে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরনোর কথাই ওঠে না। আহা সে কী আরাম! লোহার বারকোশে আঙার জ্বালিয়ে তার উপর ছাই ঢাকা দিয়ে কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে বসবেন গিয়ে জানলার ধারে। বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, বরফ পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে—দু'দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ—কী রকম বরফ পড়ে।'

আমি বললুম, 'সাত দিন ধরে জানলার কাছে বসে থাকব?'

আবদুর রহমান আমার দিকে এমন করুণ ভাবে তাকালো যে মনে হল এ রকম বেরসিকের পাল্লায় সে জীবনে আর কখনো এতটা অপদস্থ হয়নি। ম্লান হেসে বলল, 'একবার আসুন, জানলার পাশে বসুন, দেখুন। পছন্দ না হয়, আবদুর রহমানের গর্দান তো রয়েছে।'

খেই তুলে নিয়ে বলল, ' সে কত রকমের বরফ পড়ে। কখনো সোজা, ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোব মত, তারি ফাঁকে ফাঁকে আসমান জমিন কিছু কিছু দেখা যায়। কখনো ঘুবঘুট্টি ঘন—চাদরের মত নেবে এসে চোখেব সামনে পর্দা টেনে দেয়। কখনো বয় জোর বাতাস—প্রচণ্ড ঝড়। বরফের পাঁজে যেন সে বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গুঁড়ো ডাইনে বাঁয়ে উপর নিচে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগায়—হু হু করে কখনো একমুখো হয়ে তাজী ঘোড়াকে হার মানিয়ে ছুটে চলে। কখনো সব ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু শুনতে পাবেন সোঁ—ওঁ—ওঁ— তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে যেন দারুল আমানের এঞ্জিনের শিটির শব্দ। সেই ঝড়ে ধরা পড়লে রক্ষে নেই, কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, না হয় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবেন বরফের বিছানায়, তারই উপর জমে উঠবে ছ'হাত উঁচু বরফের কম্বল—গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা। কিন্তু তখন সে বরফের পাঁজা সত্যিকার কম্বলের মত ওম দেয়। তার তলার মানুষকে দু'দিন পরেও জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছে।

'একদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখবেন বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে—সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না। কাবুলের বাজারে কালো চশমা পাওয়া যায়, তাই পরে তখন বেড়াতে বেরোবেন। যে হাওয়া দম নিয়ে বুকে ভরবেন তাতে একরত্তি ধুলো নেই, বালু নেই, ময়লা নেই। ছুরির মত ধারালো ঠাণ্ডা হাওয়া নাক মগজ গলা বুক চিরে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে ভিতরকার সব ময়লা ঝেঁটিয়ে নিয়ে। দম নেবেন, ছাতি এক বিঘৎ ফুলে উঠবে—দম ফেলবেন এক বিঘৎ নেমে যাবে। এক এক দম নেওয়াতে এক এক বছর আয়ু বাড়বে—এক

একবার দম ফেলতে একশ'টা বেমারি বেরিয়ে যাবে।

'তখন ফিরে এসে হুজুর একটা আস্ত দুম্বা যদি না খেতে পারেন তবে আমি আমার গোঁফ কামিয়ে ফেলব। আজ যা রান্না করেছিলুম তার ডবল দিলেও আপনি ক্ষিদের চোটে আমায় কতল করবেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আবদুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব।'

আবদুর রহমান গদগদ হয়ে বলল, 'সে বড় খুশির বাৎ হবে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার খুশির জন্য নয়, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য।'

আবদুর রহমান ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকাল।

আমি বুঝিয়ে বললুম, 'তুমি যদি সমস্ত শীতকালটা জানলার পাশে বসে কাটাও তবে আমার রান্না করবে কে?'

ষোল

শো' কেসে রবারের দস্তানা দেখে এক আইরিশম্যান আরেক আইরিশম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিল, জিনিসটা কোন কাজে লাগে। দ্বিতীয় আইরিশম্যানও সেই রকম, বলল, 'জানিসনে, এ দস্তানা পরে হাত ধোয়ার ভারি সুবিধে। হাত জলে ভেজে না, অথচ হাত ধোওয়া হল।'

কুঁড়ে লোকের যদি কখনো শখ হয় যে সে ভ্রমণ করবে অথচ ভ্রমণ করার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ হয়, তবে তার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত পন্থা কাবুলের সংকীর্ণ উপত্যকায়। কারণ কাবুলে দেখবার মত কোনো বালাই নেই।

তিন বছর কাবুলে কাটিয়ে দেশে ফেরবার পর যদি কোনো সবজান্তা আপনাকে প্রশ্ন করেন, 'দেহ্-আফগানান যেখানে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে মিশেছে তার পিছনে ভাঙা মসজিদের মেহরাবের বাঁ দিকে চেলমতিফে ঝোলানো মেডালিয়োনেতে আপনি পদ্মফুলের প্রভাব দেখেছেন?' তা হলে আপনি অম্লান বদনে বলতে পারেন 'না', কারণ ওরকম পুরোনো কোনো মসজিদ কাবুলে নেই।

তবু যদি সেই সবজান্তা ফের প্রশ্ন করেন, 'বুখারার আমির পালিয়ে আসার সময় যে ইরানী তসবিরের বাণ্ডিল সঙ্গে এনেছিলেন, তাতে হিরাতের জরীন-কলম ওস্তাদ বিহজাদের আঁকা সমরকন্দেব পোলো খেলার ছবি দেখেছেন?' আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন 'না', কারণ কাবুল শহরে ওরকম কোনো তসবিরের বাণ্ডিল নেই।

পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না। যে আস্তাবলে সিকন্দর শাহের ঘোড়া বাঁধা ছিল, সেখানে এখন হয়ত বেগুন ফলছে। পণ্ডিতরা কম্পাস নিয়ে তার নিশানা লাগাতে পারলে আনন্দে বিহ্বল। কোথায় এক টুকরো পাথরে বুদ্ধের কোঁকড়া চুলের আড়াই গাছা ঘষে ক্ষয়ে প্রায় হাতের তেলোর মত পালিশ হয়ে গিয়েছে; তাই পেয়ে পণ্ডিত পঞ্চমুখ—পাড়া অতিষ্ঠ করে তোলেন। এঁদের কথা হচ্ছে না। আমি সাধারণ পাঁচজনের কথা বলছি, যারা দিল্লি আগ্রা সেকেন্দ্রার জেল্লাই দেখেছে। তাদের চোখে চটক, বুকে চমক লাগাবার মত রসবস্তু কাবুলে নেই।

কাজেই কাবুলে পৌঁছে কাউকে তুর্কীনাচের চর্কিবাজি খেতে হয় না। পাথর-ফাটা রোদ্দুরে শুধু পায়ে শান বাঁধানো ছ'ফার্লোঙ্গী চত্বর ঘষ্টাতে হয় না, নাকে মুখে চামচিকে বাদুড়ের থাবড়া খেয়ে খেয়ে পচা বোটকা গন্ধে আধা ভিরমি গিয়ে মিনার-শিখর চড়তে হয় না।

আইরিশম্যানের মত দিব্যি হাত ধোওয়া হল, অথচ হাত ভিজল না।

তাই কাবুল মনোরম জায়গা। এবং সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে যে, যা কিছু দেখবার তা বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। বন্ধুবান্ধবের কেউ না কেউ কোনো একটা বাগানে সমস্ত দিন কাটাবার জন্য একদিন ধরে নিয়ে যাবেই।

গুলবাগ কাবুলের কাছেই—হেঁটে, টাঙায়, মোটরে যে কোনো কৌশলে যাওয়া যায়।

তিন দিকে উঁচু দেওয়াল, একদিকে কাবুল নদী; তাতে বাঁধ দিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা পুকুরের মত শান্ত স্বচ্ছ করা হয়েছে। বাগানে অজস্র আপেল-নাসপাতির গাছ, নরগিস ফুলের চারা, আর ঘন সবুজ ঘাস। কার্পেট বানাবার অনুপ্রেরণা মানুষ নিশ্চয়ই এই ঘাসের থেকেই পেয়েছে। সেই নরম তুলতুলে ঘাসের উপর ইয়ারবক্সী ভালো ভালো কার্পেট পেতে গোব্দাগোব্দা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবেন। পাঁচ মিনিট যেতে-না-যেতেই সবাই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বেন।

দীর্ঘ তন্বঙ্গী চিনারের ঘন-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন অস্বচ্ছ ফিরোজা আকাশ। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখবেন কাবুল পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘের হুটোপুটি। কিম্বা দেখবেন হুটোপুটি নয়, এক পাল সাদা মেঘ যেন গৌরীশঙ্কর জয় করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কোমর বেঁধে প্ল্যানমাফিক একজন আরেকজনের পিছনে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চূড়ো পেরিয়ে ওদিকে চলে যাবার তাদের মতলব। ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটে চড়ার পর কোন এক অদৃশ্য নন্দীর ত্রিশূলে ঘা খেয়ে নেমে আসছে, আবার এগোচ্ছে আবার ধাক্কা খাচ্ছে। তারপর আলাদা ট্যাকটিক্স চালাবার জন্য দু'তিনজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বিলকুল এক হয়ে গিয়ে নতুন করে পাহাড় বাইতে শুরু করবে। হঠাৎ কখন পাহাড়ের আড়াল থেকে আরেক দল মেঘের চূড়োয় পৌঁছতে পেরে খানিকটা মাথা দেখিয়ে এদের যেন লজ্জা দিয়ে আড়ালে ডুব মারবে।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিনারপল্লব, পাহাড় সব কিছু ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে অতি ঊর্ধ্বে আপনারই মত নীল গালচেয় শুয়ে একখানা টুকরো মেঘ অতি শান্ত নয়নে নিচের মেঘের গৌরীশঙ্কর অভিযান দেখছে—আপনারই মত। ওকে 'মেঘদূত' করে হিন্দুস্থানে পাঠাবার যো নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় যেন বাবুরশাহের আমল থেকে সে ঐখানে শুয়ে আছে, আর কোথাও যাবার মতলব নেই। পানশিরের আবদুর রহমান এরই কাছ থেকে চুপ করে বসে থাকার কায়দাটা রপ্ত করেছে।

নাকে আসবে নানা অজানা ফুলের মেশা গন্ধ। যদি গ্রীষ্মের অন্তিম নিশ্বাস হয়, তবে তাতে আরো মেশানো আছে পাকা আপেল, অ্যাপ্রিকটের বাসি বাসি গন্ধ। তিন পাঁচিলের বন্ধ হাওয়াতে সে গন্ধ পচে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি নেশার আমেজ লাগায়। চোখ বন্ধ হয়ে আসে—তখন শুনতে পাবেন উপরের হাওয়ার দোলে তরুপল্লবের মর্মর আর নাম-না-জানা পাখির জান-হানা-দেওয়া ক্লান্ত কূজন।

সব গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ভেসে আসবে বাগানের এক কোণ থেকে কোর্মা-পোলাও রান্নার ভারি খুশবাই। চোখে তন্দ্রা, জিভে জল। দ্বন্দ্বের সমাধান হবে হঠাৎ গুড়ুম শব্দে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে মিনিটখানেক ধরে তার প্রতিধ্বনি শুনে।

কাবুলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে বেলা বারোটার কামান দাগার শব্দ। সবাই আপন আপন ট্যাকঘড়ি খুলে দেখবেন—হাতঘড়ির রেওয়াজ কম—ঘড়ি ঠিক চলছে কিনা। কাবুলে এ রেওয়াজ অলঙ্ঘনীয়। ঘড়ি না বের করা স্নবের লক্ষণ—'আহা যেন একমাত্র ওঁয়ার ঘড়িরই চেক-আপের দরকার নেই—'।

যাঁদের ঘড়ি কাঁটায় কাঁটায় বারোটা দেখালো না, তাঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। কাবুলের কামান নাকি ইহজন্মে কখনো ঠিক বারোটার সময় বাজেনি। কারো ঘড়ি যদি ঠিক বারোটা দেখাল তার তবে রক্ষে নেই। সকলেই তখন নিঃসন্দেহ যে, সে ঘড়িটা দাগী খুনী—ওঁদের ঘড়ির মত বেনিফিট অব ডাউট পেতে পারে না। গান্ধার শিল্পের বুদ্ধমূর্তির চোখে মুখে যে অপার তিতিক্ষা, তাই নিয়ে সবাই সে ঘড়িটার দিকে করুণ নয়নে তাকাবেন।

মির আসলম আরবী ছন্দে ফার্সী বলতেন অর্থাৎ আমাদের দেশে ভট্‌চায্‌রা যে রকম সংস্কৃতের তেলে ডোবানো সপসপে বাংলা বলে থাকেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভ্রাতঃ, 'চহার মগজ্ শিকন' কী বস্তু তস্য সন্ধান করিয়াছ কি?'

আমি বললুম, 'চহার' মানে 'চার' আর 'মগজ্' মানে 'মগজ', 'শিকন' মানে 'টুকরো টুকরো করা

অর্থাৎ যা দিয়ে চারটে মগজ ভাঙা যায়, এই আরবী ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কিছু হবে আর কী?'

মির আসলম বললেন, 'চহার-মগজ্' মানে 'চতুর্মস্তিষ্ক' অতি অবশ্য সত্য, কিন্তু যোগরূঢ়ার্থে ঐ বস্তু আক্ষোট অথবা আখরোট। অতএব 'চহার-মগজ্-শিকন' বলিতে শক্ত লোহার হাতুড়ি বোঝায়।' তারপর দাগী ঘড়িওয়ালা প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আয় বরাদরে আজীজে মন্, হে আমার প্রিয় ভ্রাতঃ, যোগরূঢ়ার্থে খটিকাযন্ত্র অথচ ধর্মত কার্যত যে দ্রব্য 'চহার মগজ্ শিকন' সে বস্তু তুমি তোমার যাবনিক অঙ্গরক্ষার আস্তরণ মধ্যে পরম প্রিয়তমার ন্যায় বক্ষ-সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছ কেন? অপিচ পশ্য, পশ্য, অদূরে উদ্যানপ্রান্তে পরিচারকবৃন্দ উপযুক্ত যন্ত্রাভাবে উপলখণ্ড দ্বারা অক্ষরোট ভগ্ন করিবার চেষ্টায় গলদ্ঘর্ম হইতেছে; তোমার হৃদয় কি ঐ উপলখণ্ডের ন্যায় কঠিন অথবা বজ্রাদপি কঠোর?'

দাগী ঘড়ি রাখা এমনি ভয়ঙ্কর পাপ যে, প্যারিসফের্তা বাকচতুর সইফুল আলম পর্যন্ত একটা জুতসই উত্তর দিকে পারলেন না। সাদামাটা কী একটা বিড় বিড় করলেন যার অর্থ 'এক মাঘে শীত যায় না।'

মির আসলম বললেন, 'ঐ সহস্র হস্ত উচ্চ পর্বতশিখর হইতে তথাকথিত দ্বাদশ ঘটিকার সময় এক সনাতন কামান ধূম্র উদ্‌গিরণ করে—কখনো কখনো তজ্জনিত শব্দও কাবুল নাগরিকরাজির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শুনিয়াছি, একদা, দ্বিপ্রহরে তোপচী লক্ষ্য করিল যে, বিস্ফোরকচূর্ণের অনটন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আদেশ করিল সে যেন নগরপ্রান্তের অস্ত্রশালা হইতে প্রয়োজনীয় চূর্ণ আহরণ করিয়া লইয়া আসে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই সহস্র হস্ত পরিমাণ পর্বত অবতরণ করিল, শ্রান্তি দূরার্থে বিপণি মধ্যে প্রবেশ করতঃ অষ্টাধিক পাত্র চৈনিক যূষ পান করিল, প্রয়োজনীয় ধূম্রচূর্ণ আহরণ করতঃ পুনরায় সহস্রাধিক হস্ত পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। স্বীকার করি, অপ্রশস্ত দিবালোকেই সেইদিন নাগরিকবৃন্দ কামানধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু ভ্রাতঃ সইফুল আলম, সেইদিনও কি তোমার 'চহার-মগজ্-শিকন' কণ্টকে কণ্টকে দ্বাদশ ঘটিকার লাঞ্ছন অঙ্কন করিয়াছিল?'

আমি বললুম, 'এ রকম ঘড়ি আমাদের দেশেও আছে—তাকে বলা হয়, আঁব-পাড়ার ঘড়ি।'

সইফুল আলম আর মির আসলম ছাড়া সবাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আঁব' কী? সইফুল আলম বোম্বাই হয়ে প্যারিস যাওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু মির আসলম?

তিনিই বললেন, 'আম্র অতীব সুরসাল ভারতীয় ফলবিশেষ। দ্রাক্ষা আম্রের মধ্যে কাহাকে রাজমুকুট দিব সেই সমস্যা এ যাবৎ সমাধান করিতে পারি নাই।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম 'কিন্তু আপনি আম খেলেন কোথায়?'

মির আসলম বললেন, 'চতুর্দশ বৎসর হিন্দুস্থানের দেওবন্দ রামপুরে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অদ্য তোমার নিকট হইতে এই প্রশ্ন শুনিতে হইল? কিন্তু শোকাতুর হইব না, লক্ষ্য করিয়াছি তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা। শুভলগ্নে একদিন তোমাকে ভারত-আফগানিস্থানের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিব। উপস্থিত পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে তোমার অনুগত ভৃত্য আবদুর রহমান খান তোমার মুখারবিন্দ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া দণ্ডায়মান।'

কী আপদ, এ আবার জুটল কোত্থেকে?

দেখি হাতে লুঙ্গি তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলল, 'খানা তৈরি হতে দেরি নেই, যদি গোসল করে নেন!'

ইয়ারদোস্তের দু'চারজন ততক্ষণে বাঁধে নেমেছে। সবাই কাবুল-বাসিন্দা, সাঁতার জানেন না, জলে নামলেই পাথরবাটি। মাত্র একজন চতুর্দিকে হাত-পা ছুঁড়ে, বারিমন্থনে গোয়ালন্দী জাহাজকে হার মানিয়ে বিপুল কলরবে ওপারে পৌঁছে হাঁপাচ্ছেন। এপারে অফুরন্ত প্রশংসাধ্বনি, ওপারে বিরাট আত্মপ্রসাদ। কাবুল নদী সেখানটায় চওড়ায় কুড়ি গজও হবে না।

কিন্তু সেদিন গুলবাগে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। কাবুলীরা কখনো ডুব-সাঁতার দেখেনি।

ঐ একটিবারই এপার-ওপার সাঁতার কেটেছিলুম। ও রকম ঠাণ্ডা জল আমাদের দেশের শীতকালের রাতদুপুরে পানাঠাসা এঁদো পুকুরেও হয় না। সেই দু'মিনিট সাঁতার কাটার খেসারতি দিয়েছিলুম ঝাড়া একঘণ্টা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে, দাঁতে দাঁতে কত্তাল বাজিয়ে, সর্ব্বাঙ্গে অশত্থপাতার কাঁপন জাগিয়ে।

মির আসলম অভয় দিয়ে বললেন, 'বরফগলা জলে নাইলে নিউমোনিয়ার ভয় নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'মানসসরোবরে ডুব দিয়ে যখন মানুষ মরে না, তখন আর ভয় কীসের?' কিন্তু বুঝতে পারলুম বন্ধু বিনায়করাও মসোজী মানসসরোবরে ডুব দেবার পর কেন তিন ঘণ্টা ধরে রোদ্দুরে ছুটোছুটি করেছিলেন। মানস বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি, কাবুল সাত হাজারও হবে না।

কিন্তু সেদিন মির আসলম আর সইফুল আলম ছাড়া সক্কলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমি মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় তখনো প্রাণের ভয়ে কাঁপছি। শেষটায় বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আবার না হয় ডুব-সাঁতার দেখাচ্ছি।'

সবাই 'হাঁ হাঁ, কর কী, কর কী,' বলে ঠেকালেন। অবশ্যমৃত্যুর হাত থেকে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের বাঁচানো অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

তিন টুকরো পাথর, বাগান থেকেই কুড়ানো শুকনো ডাল-পাতা আর দু'চারটে হাঁড়িবাসন দিয়ে উত্তম রান্না করার কায়দায় ভারতীয় আর কাবুলী রাঁধুনিতে কোনো তফাত নেই। বিশেষত মির আসলম ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা পণ্ডিত। অর্থাৎ গুরুগৃহে থাকার সময় ইনি রান্না করতে শিখেছিলেন। তাঁর তদারকিতে সেদিনের রান্না হয়েছিল যেন হাফিজের একখানা উৎকৃষ্ট গজল।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি সমস্ত বাগান নাক ডাকাচ্ছে—একমাত্র হুঁকোটা ছাড়া। তা আমরা যতক্ষণ জেগেছিলুম, সে এক লহমার তরেও নাক ডাকানোতে কামাই দেয়নি। কিন্তু কাবুলী তামাক ভয়ঙ্কর তামাক—সাক্ষাৎ পেল্লাদ মারা গুলি। প্রহ্লাদকে হাতির পায়ের তলায়, পাহাড় থেকে ফেলে, পাষাণ চাপা দিয়ে মারা যায়নি, কিন্তু এ তামাকে তিনি দুটি দম দিলে আর দেখতে হত না। এ তামাক লোকে যত না খায়, তার চেয়ে বেশি কাশে। ঠাণ্ডা দেশ বলে আফগানিস্থানের তামাক জাতে ভালো, কিন্তু সে তামাককে মোলায়েম করার জন্য চিটে-গুড়ের ব্যবহার কাবুলীরা জানে না, আর মিষ্টি গরম ধিকিধিকি আগুনের জন্য টিকে বানাবার কায়দা তারা এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি।

পড়ন্ত রোদে দীর্ঘ তরুর দীর্ঘতর ছায়া বাগান জুড়ে ফালি ফালি দাগ কেটেছে। সবুজ কালোর ডোরাকাটা নাদুসনুদুস জেব্রার মত বাগানখানা নিশ্চিন্দি মনে ঘুমচ্ছে। নরগিস ফুল ফোটার তখনো অনেক দেরি, কিন্তু চারা-ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা যেন রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কল্পনা না সত্যি বলতে পারব না, কিন্তু মনে হল যেন অল্প অল্প গন্ধ সেদিক থেকে ভেসে আসছে। রাত্তিরে যে খুশবাইয়ের মজলিস বসবে, তারি মোহড়ার সেতারে যেন অল্প-অল্প পিড়িং পিড়িং মিঠা বোল ফুটে উঠছে। জলে ছাওয়ায়, মিঠে হাওয়ায় সমস্ত বাগান সুধাশ্যামলিম, অথচ এই বাগানের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার ফুট উঁচু কালো নেড়া পাথরের খাড়া পাহাড়। তাতে এক ফোঁটা জল নেই, এক মুঠো ঘাস নেই। বুকে একরত্তি দয়ামায়ার চিহ্ন নেই—যেন উলঙ্গ সাধক মাথায় মেঘের জটা বেঁধে কোনো এক মন্বন্তরব্যাপী কঠোর সাধনায় মগ্ন। পদপ্রান্তে গুলবাগের সবুজপরী কেঁদে কেঁদে কাবুল নদী ভরে দিয়েছে। ফকিরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাড়ি ফিরে কোনো কাজে মন গেল না। বিছানায় শুয়ে আবদুর রহমানকে বললুম, জানালা খুলে দিতে। দেখি পাহাড়ের চূড়ায় সপ্তর্ষি। 'আঃ' বলে চোখ বন্ধ করলুম। সমস্ত দিন দেখেছি অজানা ফুল, অজানা গাছ, আধচেনা মানুষ, আর অচেনার চেয়েও পীড়াদায়ক অপ্রিয়দর্শন শুষ্ক কঠিন পর্বত। হঠাৎ চেনা সপ্তর্ষি দেখে সমস্ত দেহমন জুড়ে দেশের চেনা ঘর-বাড়ির জন্য কী এক আকুল আগ্রহের আঁকুবাঁকু ছড়িয়ে পড়ল।

স্বপ্নে দেখলুম, মা এষার নমাজ পড়ে উত্তরের দাওয়ায় বসে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে আছেন।

সতেরো

কাবুলে দুই নম্বরের দ্রষ্টব্য তার বাজার। অমৃতসর, আগ্রা, কাশীর পুরোনো বাজার যাঁরা দেখেছেন, এ বাজারের গঠন তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। সরু রাস্তা, দু'দিকে বুক-উঁচু ছোট ছোট খোপ। পানের দোকানের দুই বা তিন-ডবল সাইজ। দোকানের সামনের দিকটা খোলা বাক্সের ঢাকনার মত এগিয়ে এসে রাস্তার খানিকটা দখল করেছে। কোনো কোনো দোকানের বাক্সের আধখানা বন্ধ করা যায়—অনেকটা ইংরেজীকে যাকে বলে 'পুটিঙ আপ দি শাটার।'

বুকের নিচ থেকে রাস্তা অবধি কিংবা তারো কিছু নিচে দোকানেরই একতলা গুদাম-ঘর, অথবা মুচির দোকান। কাবুলের যে কোনো বাজারে শতকরা ত্রিশটি দোকান মুচির। পেশাওয়ারের পাঠানরা যদি হপ্তায় একদিন জুতোতে লোহা পোঁতায়, তবে কাবুলে তিন দিন। বেশিরভাগ লোকেরই কাজ-কর্ম নেই— কোনো একটা দোকানে লাফ দিয়ে উঠে বসে দোকানির সঙ্গে আড্ডা জমায়, ততক্ষণ নিচের অথবা সামনের দোকানের একতলায় মুচি পয়জারে গোটাকয়েক লোহা ঠুকে দেয়।

আপনি হয়ত ভাবছেন যে, দোকানে বসলে কিছু একটা কিনতে হবে। আদপেই না। জিনিসপত্র বেচার জন্য কাবুলী দোকানদার মোটেই ব্যস্ত নয়। কুইক টার্নওভার নামক পাগলা রেসের রেওয়াজ প্রাচ্যদেশীয় কোনো দোকানে নেই। এমন কি কলকাতা থেকেও এই গদাইলস্করী চাল সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। চিৎপুরের শালওয়ালা, বড়বাজারের আতরওয়ালা এখনো এই আরামদায়ক ঐতিহ্যটি বজায় রেখেছে।

সুখদুঃখের নানা কথা হবে—কিন্তু পলিটিক্স ছাড়া। তাও হবে, তবে তার জন্য দোস্তি ভালো করে জমিয়ে নিতে হয়। কাবুলের বাজার ভয়ঙ্কর ধূর্ত—তিনদিন যেতে না যেতেই তামাম বাজার জেনে যাবে আপনি লিগেশনে ঘন ঘন যাতায়াত করেন কি না। ভারতবাসীর পক্ষে রাশিয়ান দূতাবাসের অথবা আফগান ফরেন আপিসের গোয়েন্দা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। যখন দোকানি জানতে পারে যে, আপনি হাই-পলিটিক্স নিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় খেলাধুলো করেন না, তখন আপনাকে 'বাজারগপ্' বলতে তার আর বাধবে না। আর সে অপূর্ব গপ্— বলশেভিক তুর্কীস্থানের স্ত্রী-স্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে, পেশাওয়ারের জানকীবাঈকে ছাড়িয়ে দিল্লির বড়লাটের বিবিসায়েবের বিনে পয়সায় হীরে-পান্না কেনা পর্যন্ত। সে সব গল্পের কতটা গাঁজা কতটা নীট ঠাহর হবে কিছুদিন পরে, যদি নাক-কান খোলা রাখেন। তখন বাদ দরকসর টাকায় বারো আনা, চোদ্দ আনা ঠিক ঠিক ধরতে পারবেন।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের পক্ষে এই 'বাজারগপ্' অতীব অপরিহার্য। মোগল ইতিহাসে পড়েছি, দিল্লিকে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র করে এককালে সমস্ত ভারতবর্ষ এমন কি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তুর্কীস্থান ইরান পর্যন্ত ভারতীয় হুণ্ডীর তাঁবেতে ছিল। গুণীদের মুখে শুনেছি বাঙলার রাজা জগৎশেঠের হুণ্ডী দেখলে বুখারার খান পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে কাঁচা টাকা ঢেলে দিতেন। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ব্যবসা চালু রাখার জন্য ভারতীয় বণিকদের আপন আপন ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত ছিল। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। হয়ত দিল্লির শাহনশাহ আহমদাবাদের সুবেদারের (গভর্নর) উপর বীতরাগ হয়ে তাকে ডিসমিসের ফরমান জারি করলেন—সে ফরমান আহমদাবাদ পৌঁছতে অন্তত দিন সাতেক লাগার কথা। ওদিকে সুবেদার হয়ত দু'হাজার ঘোড়া কেনার জন্য আহমদাবাদী বেনেদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন—ফরমান পৌঁছলে সুবেদার পত্রপাঠ দিল্লি রওনা দেবেন। সে টাকাটা বের করতে বেনেদের তখন ভয়ঙ্কর বেগ পেতে হত। সুবেদার বাদশাহকে খুশি করে নতুন সুবা, নিদেনপক্ষে নতুন জায়গীর না পেলে সে টাকাটা একেবারেই মারা যেত।

তাই যে সন্ধ্যায় বাদশা ফরমানে মোহর বসালেন, সেই সন্ধ্যায়ই বেনেদের দিল্লির হৌস থেকে আপন ডাকের ঘোড়সওয়ার ছুটত আহমদাবাদে। সেখানকার বিচক্ষণ বেনে বাদশাহী ফরমান পৌঁছবার

পূর্বেই সুবেদারের হিসেবে ঢেরা কেটে দিত—পাওনা টাকা যতটা পারত উশুল করত—নতুন ওভারড্রাফট কিছুতেই দিত না, ও দরকার হলে দেবার দায় এড়াবার জন্য হঠাৎ পালিতাণায় 'তীর্থভ্রমণে' চলে যেত। তিনদিন পর ফরমান পৌঁছলে পর সুবেদারের চোখ খুলত। তখন বুঝতে পারতেন বেনে ধর্মানুরাগী হয়ে পালিতাণায় কোন তীর্থ করতে চলে গিয়েছিল।

আফগানিস্থানে এখনো সেই অবস্থা। বাদশা কাবুলে বসে কখন হিরাত অথবা বদখশান সুবার কোন কর্ণধারের কর্ণ কর্তন করলেন, তার খবর না জেনে বড় ব্যবসা করার উপায় নেই। তাই 'বাজার গপের' ধারা কখন কোনদিকে চলে, তার দিকে কড়া নজর রাখতে হয়, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফিলটার যদি আপনার থাকে, তবে সেই ঘোলাটে 'গপ্' থেকে খাঁটি তত্ত্ব বের করে আর দশজনের চেয়ে বেশি মুনাফা করতে পারবেন।

আফগানিস্থানের ব্যাঙ্কিং এখনো বেশিরভাগ ভারতীয় হিন্দুদের হাতে। ভারতীয় বলা হয়ত ভুল, কারণ এদের প্রায় সকলেই আফগানিস্থানের প্রজা। এদের জীবনযাত্রার প্রণালী, সামাজিক সংগঠন, পালাপরব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো গবেষণা করেননি।

আশ্চর্য বোধ হয়। মরা বোরোবোদুর নিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পড়ে, একই ফোটোগ্রাফের বিশখানা হাজা-ভোঁতা প্রিন্ট দেখে দেখে সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায়, কিন্তু এই জ্যান্ত ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে 'বৃহত্তর ভারতের' পাণ্ডাদের কোনো অনুসন্ধিৎসা, কোনো আত্মীয়তাবোধ নেই।

মৃত বোরোবোদুর গোত্রভুক্ত, জীবন্ত ভারতীয় উপনিবেশ অপাংক্তেয়, ব্রাত্য। ভারতবর্ষের সধবারা তাজা মাছ না খেয়ে শুঁটকি মাছের কাঁটা দাঁতে লাগিয়ে একাদশীর দিনে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখেন।

কাবুলের বাজার পেশাওয়ারের চেয়ে অনেক গরীব, কিন্তু অনেক বেশি রঙিন। কম করে অন্তত পঁচিশটা জাতের লোক আপন আপন বেশভূষা চালচলন বজায় রেখে কাবুলের বাজারে বেচাকেনা করে। হাজারা, উজবেগ (বাঙলা উজবুক), কাফিরিস্থানী, কিজিলবাশ (ভারতচন্দ্রে কিজিলবাসের উল্লেখ আছে, আর টীকাকার তার অর্থ করেছেন 'একরকম পর্দা'!), মঙ্গোল, কুর্দ এদের পাগড়ি, টুপি, পুস্তিনের জোব্বা, রাইডিং বুট দেখে কাবুলের দোকানদার এক মুহূর্তে এদের দেশ, ব্যবসা, মুনাফার হার, কঞ্জুশ না দরাজ-হাত চট করে বলে দিতে পারে।

এই সব পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তারা নির্বিকার চিত্তে রাস্তা দিয়ে চলে। আমরা মাড়োয়ারী কিংবা পাঞ্জাবীর সঙ্গে লেনদেন করার সময় কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, তারা বাঙালী নয়—দু'পয়সা লাভ করার পর কোনো পক্ষই অন্য পক্ষকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা হোটেলে ডেকে নেওয়ার রেওয়াজ পর্যন্ত নেই। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত।

স্বপ্নসম লোকযাত্রা। খাস কাবুলের বাসিন্দারা চিৎকার করে একে অন্যকে আল্লারসুলের ডরভয় দেখিয়ে সওদা করছে, বিদেশিরা খচ্চর গাধা ঘোড়ার পিঠে বসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফার্সীতে দরকসর করছে, বুখারার বড় কারবারি ধীরে গম্ভীরে দোকানে ঢুকে এমনভাবে আসন নিচ্ছেন যে, মনে হয় বাকি দিনটা ঐখানেই বেচাকেনা, চা-তামাক-পান আর আহারাদি করে রাত্রে সরাইয়ে ফিরবেন—তাঁর পিছনে চাকর হুঁকো-কল্কি সঙ্গে নিয়ে ঢুকছে। তারও পিছনে খচ্চর-বোঝাই বিদেশি কার্পেট। আপনি উঠি উঠি করছিলেন, দোকানদার কিছুতেই ছাড়বে না। হয়ত মোটা রকমের ব্যবসা হবে, খুদা মেহেরবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রসুলেরও আশীর্বাদ আছে, আপনারও যখন ভয়ঙ্কর তাড়া নেই, তখন দাওয়াতটা খেয়ে গেলেই পারেন।

রাস্তায় অনেক অকেজো ছেলে-ছোকরা ঘোরাঘুরি করছে, তাদেরই একটাকে ডেকে বলবে, 'ও বাচ্চা, চাওয়ালাকে বলতো আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে যেতে।'

তারপর সেই সব কার্পেটের বস্তা খোলা হবে। কত রঙ, কত চিত্রবিচিত্র নক্সা, কী মোলায়েম

স্পর্শসুখ। কার্পেট-শাস্ত্র অগাধ শাস্ত্র—তার কূল-কিনারাও নেই। কাবুলের বাজারে অন্তত ত্রিশ জাতের কার্পেট বিক্রি হয়, তাদের আবার নিজের জাতের ভিতরে বহু গোত্র, বহু বর্ণ। জন্মভূমি, রঙ, নক্সা মিলিয়ে সরেস নিরেস মালের বাছবিচার হয়। বিশেষ রঙের নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট পশম দিয়ে তৈরি হয়—সে মালের সস্তা জিনিস হয় না। এককালে বেনারসী শাড়িতে এই ঐতিহ্য ছিল—আড়িবেল শাড়ির বিশেষ নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট রেশমেই হত—সে নক্সায় নিরেস মাল দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা ছিল না।

আজকের দিনে কাবুলের বাজারে কেনবার মত তিনটে ভালো জিনিস আছে—কার্পেট, পুস্তিন আর সিল্ক। ছোটখাটো জিনিসের ভিতর ধাতুর সামোভার আর জড়োয়া পয়জার। বাদ-বাকি বিলাতী আর জাপানী কলের তৈরি সস্তা মাল, ভারতবর্ষ হয়ে আফগানিস্থানে ঢুকেছে।

কাবুলের বাজার ক্রমেই গরীব হয়ে আসছে। তার প্রধান কারণ ইরান ও রুশের নবজাগরণ। আমুদরিয়ার ওপারের মালে বাঁধ দিয়ে রাশানরা তার স্রোত মস্কোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, ইরানীরা তাদের মাল সোজাসুজি ইংরেজ অথবা রাশানকে বিক্রি করে। কাবুলের পয়সা কমে গিয়েছে বলে সে ভারতের মাল আর সেই পরিমাণে কিনতে পারে না—আমাদের রেশম মলমল মসলিন শিল্পেরও কিছু মরমর, বেশিরভাগ ইংরেজ সাত হাত মাটির নিচে কবর দিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি করে চুকিয়ে দিয়েছে।

বাবুর বাদশা কাবুলের বাজার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বহু জাতের ভিড়ে কান পেতে যেসব ভাষা শুনেছিলেন, তার একটা ফিরিস্তিও তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন—

আরবী, ফার্সী, তুর্কী, মোগলী, হিন্দী, আফগানী, পশাঈ, প্রাচী, গেবেরী, বেরেকী ও লাগমানী।

'প্রাচী' হল পূর্ব-ভারতবর্ষের ভাষা, অযোধ্যা অঞ্চলের পূরবীয়া—বাঙলা ভাষা তারই আওতায় পড়ে।

সে সব দিন গেছে; তামাম কাবুলে এখন যুক্তপ্রদেশের তিনজন লোকও আছে কিনা সন্দেহ।

তবু প্রাণ আছে, আনন্দ আছে। বাজারের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড সরাই। সেখানে সন্ধ্যার নমাজের পর সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে বেঁচে থাকার মূল চৈতন্যবোধকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের রসগ্রহণ দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে। মঙ্গোলরা পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে, ভারী রাইডিং বুট পরে, বাবরি চুলে ঢেউ খেলিয়ে গোল হয়ে সরাই-চত্বরে নাচতে আরম্ভ করে। বুটের ধমক, তালে তালে হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুল শহরের চতুর্দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনিত করে তীব্র কণ্ঠে আমুদরিয়া-পারের মঙ্গোল সঙ্গীত। থেকে থেকে নাচের তালের সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নিচু করে দেয়, আর কানের দু'পাশের বাবরি চুল সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলে। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু'পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটে, আর দু'হাত মেলে দিয়ে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনের দিকে ঠেলে বাবরী চুল দিয়ে সবুজ জামা ঢেকে দেয়। কখনো কোমর দু'ভাঁজ করে নিচু হয়ে বিলম্বিত তালে আস্তে আস্তে হাততালি, কখনো দু'হাত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে ঘূর্ণি হাওয়ায় চর্কিবাজি। সমস্তক্ষণ চত্বর ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

আবার এই সমস্ত হট্টগোল উপেক্ষা করে দেখবেন, সরাইয়ের এক কোণে কোনো ইরানী কানের কাছে সেতার রেখে মোলায়েম বাজনার সঙ্গে হাফিজের গজল গাইছে। আর পাঁচজন চোখ বন্ধ করে বুঁদ হয়ে দূর ইরানের গুল বুলবুল আর নিঠুরা নিদয়া প্রিয়ার ছবি মনে মনে এঁকে নিচ্ছে।

আরেক কোণে পীর-দরবেশ চায়ের মজলিসের মাঝখানে দেশ-বিদেশের ভ্রমণকাহিনী, মেশেদ-কারবালা, মক্কা-মদিনার তীর্থের গল্প বলে যাচ্ছেন। কান পেতে সবাই শুনছে, বুড়োরা ভাবছে কবে তাদের উপর আল্লার করুণা হবে, মৌলা কবে তাদের মদিনায় ডেকে নিয়ে যাবেন; প্রাণ তো ওষ্ঠাগত—

লবোঁ পর হৈ দম আয় মুহম্মদ সমহালো,
মেরে মৌলা মুঝে মদিনে বোলা লো!
ঠোঁটের উপর দম এসে গেছে বাঁচাও মুহম্মদ,
হে প্রভু আমায় ডাকো মদিনায় পরশিতে তোমার পদ।

পুস্তিন ব্যবসায়ীর কুঠরিতে কবির মজলিস। অজাতশ্মশ্রু সুনীল গুম্ফ, কাজল-চোখ, তরুণ কবি মোমবাতির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তুলোট কাগজে লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। তাঁর এক পদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তামাম মজলিস একগলায় পদের পুনরাবৃত্তি করছে—মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে মরহাবা, আফরীন, শাবাশ বলে উচ্চকণ্ঠে কবির তারিফ করছে।

চার সর্দারজীতে মিলে একটা পুরানো গ্রামোফোনে নখের মত পালিশ তিনখানা রেকর্ড ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজাচ্ছে—

হরদি বোতলাঁ
ভরদি বোতলাঁ
পাঞ্জাবী বোতলাঁ
লাল বোতলাঁ—

হায়, কাবুলে বোতল বারণ। কে জানত, শ্রবণেও অর্ধপান।

আর আসল মজলিস বসেছে কুহিস্থানের তাজিকদের আড্ডায়। হেঁড়ে গলায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, দেয়াল-পাথর ফাটিয়ে কোরাস গান—

আয় ফতু, জানে মা—
ফতুজান,
বর তু শওম কুরবা—া—া—ন।

কুরবানের 'আ' দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব, অবস্থাভেদে—সম মেলাবার জন্য। উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি নয়, তবু দরদ আছে—

ওগো ফতুজান,
তুঁহারি লাগিয়া দিল-জান দিয়া
হব আমি কুরবান

উত্তরে ফতুজান যেন অবিশ্বাসের সুরে বলছেন—

—চেরা রফতী
হীচ ন্ গুফতী
দূর হিন্দুস্থান?

অর্থাৎ,

কেন গেলে
আমায় ফেলে
দূর হিন্দুস্থান?

সহস্রপাদ বৈষ্ণব পদাবলীতে যখন এ প্রশ্নের উত্তর নেই, তখন তাজিক ছোকরার লোকসঙ্গীতে তার উত্তরের আশা করেন কোন অভিনব মম্মট? মথুরার সিংহাসন জয়, হিন্দুস্থানে রাইফেল ক্রয়, দুটোই বদখদ বেতালা উত্তর। হাজারো যুক্তি দিয়ে গীতা বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু মথুরাজয়ের যুক্তির হাল যমুনায় পানি পাবে না বলেই তিনি সেটা ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধার দরবারে পেশ করেননি।

বল্‌হীকের বল্লভও তাই নীরব।

আঠারো

কাবুলের সামাজিক জীবন তিন হিস্যায় বিভক্ত। তিন শরিকে মুখ দেখাদেখি নেই।

পয়লা শরিক খাস কাবুলী; সে-ও আবার দু'ভাগে বিভক্ত—জনানা, মর্দানা। কাবুলী মেয়েরা কট্টর

পর্দার আড়ালে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে নিকট আত্মীয় ছাড়া কারো আলাপ হওয়ার জো নেই। পুরুষের ভিতরে আবার দু'ভাগ। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের মোল্লা সম্প্রদায়, আর অন্যদিকে প্যারিস-বার্লিন-মস্কো ফের্তা এবং তাদের ইয়ারবক্সীতে মেশানো ইয়োরোপীয় ছাঁচে ঢালা তরুণ সম্প্রদায়। একে অন্যকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু মুখ দেখাদেখি বন্ধ নয়। কারণ অনেক পরিবারেই বাপ মশাই, বেটা মসিয়ো।

দুসরা শরিক ভারতীয় অর্থাৎ পাঞ্জাব, ফ্রন্টিয়ারের মুসলমান ও ১৯২১ সনের খেলাফৎ আন্দোলনের ভারতত্যাগী মুহাজিরগণ। এঁদের কেউ কেউ কাবুলী মেয়ে বিয়ে করেছেন বলে শ্বশুরবাড়ির সমাজের সঙ্গে এঁরা কিছু কিছু যোগাযোগ বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিসরা শরিক ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, রুশ ইত্যাদি রাজদূতাবাস। আফগানিস্থান ক্ষুদে গরীব দেশ। সেখানে এতগুলো রাজদূতের ভিড় লাগাবার কোনো অর্থনৈতিক কারণ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক কারণ বিস্তর। ফরাসী জর্মন ইতালী তুর্ক সব সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস, ইংরেজ-রুশের মোষের লড়াই একদিন না একদিন হয় খাইবারপাসে, নয় হিন্দুকুশে লাগবেই লাগবে। তাই দু'দলের পাঁয়তারা কষার খবর সরেজমিনে রাখার জন্য একগাদা রাজদূতাবাস।

তবু পয়লা শরিক আর দুসরা শরিকে দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয়। দুসরা শরিকের অধিকাংশই হয় কারবারি, নয় মাস্টার প্রোফেসর। দু'দলের সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু পয়লা ও তেসরা ও দুসরা-তেসরাতে কখনো কোনো অবস্থাতেই যোগাযোগ হতে পারে না।

যদি কেউ করার চেষ্টা করে, তবে সে স্পাই।

মাত্র একটি লোক নির্ভয়ে কাবুলের সব সমাজে অবাধে গতায়াত করতেন। বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নাম দোস্ত মুহম্মদ খান—জাতে খাস পাঠান।

প্রথম দিনের পরিচয়ে শেকহ্যাণ্ড করে ইংরেজি কায়দায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হাও ডু ইয়ু ডু?'

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ রাস্তায়। দূরের থেকে কাবুলী কায়দায় সেই প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন, 'খুব হাস্তী, জোর হাস্তী' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?'

তৃতীয় সাক্ষাৎ তাঁর বাড়িরই সামনে। আমাকে দেখা মাত্র চিৎকার করে বললেন, 'বফরমাইদ, বফরমাইদ (আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক), কদমে তান মবারক (আপনার পদদ্বয় পূতপবিত্র হোক), চশমে তান রওশন (আপনার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বলতর হোক), শানায়ে তান দরাজ (আপনার বক্ষস্কন্ধ বিশালতর হোক)—।'

তারপর আমার জন্য যা প্রার্থনা করলেন সেটা ছাপালে এদেশের পুলিশ আমাকে জেলে দেবে।

আমি একটু থতমত খেয়ে বললুম, 'কী যা তা সব বলছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ চোখ পাকিয়ে তম্বি লাগালেন, 'কেন বলব না? আলবাৎ বলব, একশ' বার বলব। আমি কি কাবুলের ইরানী যে ভদ্রতা করে সব কিছু বলব, সত্যি কথাটি ছাড়া? আমি পাঠান—আমার ঘোড়ার লাগাম নেই, আমার জিভেরও লাগাম নেই।'

ঘরে বসিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'বাড়িঘরদোর গুছিয়ে নিয়েছেন তো? চাকরবাকর? রুটি-গোস্ত? কিছু যদি দরকার হয় আমাকে বলবেন। সব যোগাড় করে দিতে পারি—কাবুলের তখ্‌ৎটি ছাড়া। তাও পারি—কিন্তু মাত্র একটা কিনা, খোঁজ খোঁজ পড়ে যাবে। কিন্তু ওটায় নজর দিয়ে কোনো লাভ নেই। বড্ড শক্ত, আমি বসে দেখেছি।'

আমি বললুম, 'কাবুলের সিংহাসনে বসা যে শক্ত সে তো আর গোপন কথা নয়।'

দোস্ত মুহম্মদ আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ভয় পেয়ে ভাবলুম বোধহয় বেফাঁস রসিকতা করে ফেলেছি। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদের উত্তর শুনে অভয় পেলুম। বললেন, 'আহা-হা-হা, বাঁচালে দাদা। তোমার তাহলে রসকষ আছে। তোমার দেশের লোকগুলোর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, বড্ড

বেহুল্লোড়, বে-আড্ডা, বেরসিক। কী গম্ভীর মুখ! দেখে মনে হয় হিন্দুস্থান স্বাধীন করার দুর্ভাবনা যেন একমাত্র ওদেরই ঘাড়ে।'

অদ্ভুত লোক! অশ্লীল কথা বললেন রাস্তায় চেঁচিয়ে, চাকরবাকর বন্দোবস্ত করে দেবেন বললেন ঘরের ভিতর বসিয়ে ফিসফিস করে, রসিকতা শুনে যখন খুশি তখন মুখ হল গম্ভীর। ভাবলুম এবার যদি দুটো একটা কটুবাক্য বলি তবে বোধহয় অট্টহাস্য করে উঠবেন।

ততক্ষণে তিনি একটা কুশনে মাথা দিয়ে কার্পেটের উপরে শুয়ে পড়েছেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, 'কী খাবে? চা-রুটি, পোলাও-গোস্ত, আঙুর-নাসপাতি? যা খুশি। বাজারে সব পাওয়া যায়। বাড়িতে কিছু নেই।'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'না, না, আছে; আছে। সিগারেট আছে। দাঁড়াও।'

বলে দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে গভীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে সোফার পিছনে হাঁটু গেড়ে সোফা আর দেয়ালের মাঝখানের কার্পেট তুলে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলেন।

আমি তো অবাক। সামান্য সিগারেট; মদের বোতল নয়, প্যারিসের ছবি নয়, এত লুকিয়ে রাখবেন! আর কার কাছ থেকেই বা এত লুকোনো?

শুনি দোস্ত মুহম্মদ করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠেছেন, 'ওরে ও হারামজাদা আগা আহমদ, তোকে আমি আজ খুন করব। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে আয় ব্যাটা। ওরে নেমকহারাম, তোকে খুন করে আজ আমি গাজী হব, ফাঁসী গিয়ে শহীদ হব।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঃ, কী পাষণ্ড! দরজা বন্ধ করে, হুড়কো মেরে সিগারেট বের করি, লুকিয়ে রাখি যেন আলাদীনের পিদিম। তবু ব্যাটা সন্ধান পেয়েছে। আর কী বেহায়া বেশরম! দশটা সিগারেটই মেরে দিয়েছে। ওঃ!'

ততক্ষণে আগা আহমদ দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে। কারো দিকে না তাকিয়ে, দোস্ত মুহম্মদের কোনো কথায় সাড়া না দিয়ে সোজা সোফার পিছনে গিয়ে কার্পেটের তলায় আরো বেশিদূর হাত চালিয়ে আরেক প্যাকেট পুরো সিগারেট বের করে আমার হাতে দিল।

বেরবার সময় দোরের গোড়ায় একবার দাঁড়াল। এক ঝলকের তরে দোস্ত মুহম্মদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খালি প্যাকেটটা আমার—লুকিয়ে রেখেছিলুম।'

দোস্ত মুহম্মদের চোখের পাতা পড়ছে না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'কী অসম্ভব বদমায়েশ! আর আমাকে বেকুব বানাবার কায়দাটা দেখলেন গর্ভস্রাবটার! শুধু তাই, নিত্য নিত্য আমাকে বেকুব বানায়।'

তারপর মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আপন মনেই বললেন, 'কিন্তু দাঁড়াও বাচ্চা, স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্, কামারের এক ঘা।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর পাঁচ বছরের মাইনে তিন শ' টাকা আমার কাছে জমা আছে। সেই টাকাটা লোপাট মেরে রাইফেল কাঁধে করে একদিন পাহাড়ে উধাও হয়ে যাব; তখন যাদু টেরটি পাবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কলেজ যাবার সময় ঘরে তালা লাগান?'

তিনি বললেন, 'একদিন লাগিয়েছিলুম। কলেজ থেকে ফিরে দেখি সে তালা নেই, আরেকটা পর্বতপ্রমাণ তালা তার জায়গায় লাগানো। ভাঙবার চেষ্টা করে হার মানলুম। ততক্ষণে পাড়ার লোক জমে গিয়েছে—আগা আহমদের দর্শন নেই। কী আর করি, বসে রইলুম হি হি শীতে বারান্দায়। হেলে দুলে আগা আহমদ এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। পাষণ্ড কী বলল জানো? 'ও তালাটা ভালো নয় বলে একটা ভালো দেখে তালা লাগিয়েছি।' আমি যখন মার মার করে ছুটে গেলুম তখন শুধু বললো, 'কারো উপকার করতে গেলেই মার খেতে হয়।'

আমি বললুম, 'তালা তা হলে আর লাগাচ্ছেন না বলুন।'

'কী হবে? আগা আহমদ আফ্রিদী, ওরা সব তালা খুলতে পারে। জানো, এক আফ্রিদী বাজি ফেলে আমির হবীব উল্লার নিচের থেকে বিছানার চাদর চুরি করেছিল।'

আমি বললুম, 'তালা যদি না লাগান তবে একদিন দেখবেন আগা আহমদ আপনার দামী রাইফেল নিয়ে পালিয়েছে।'

দোস্ত মুহম্মদ খুশি হয়ে বললেন, 'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তত কাঁচা ছেলে নই। আগা আহমদের দাদা আমাকে আর বছরে ছ'শ' টাকা দিয়েছিল ওর জন্য দাঁও মত একটা রাইফেল কেনার জন্য। এটা সেই টাকায় কেনা কিন্তু আগা আহমদ জানে না। ও যদি রাইফেল নিয়ে উবে যায়, তবে আমি তার ভাইকে তক্ষুণি চিঠি লিখে পাঠাব, ' তোমার ভ্রাতৃহস্তে রাইফেল পাঠাইলাম; প্রাপ্তি-সংবাদ অতি অবশ্য জানাইবা।' তারপর দুই ভাইয়েতে—'

আমি বললুম, 'সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই।'

দোস্ত মুহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাইফেলের জন্য তারা লড়েছিল?'

আমি বললুম, 'না, সুন্দরীর জন্য।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তওবা! তওবা! স্ত্রীলোকের জন্য কখনো জব্বর লড়াই হয়? মোক্ষম লড়াই হয় রাইফেলের জন্য। রাইফেল থাকলে সুন্দরীর স্বামীকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করা যায়। উত্তম বন্দোবস্ত। সে বেহেস্তে গিয়ে হুরী পেল তুমিও সুন্দরী পেলে।'

রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ভেবো না, লক্ষ্য করিনি যে, তুমি আমাকে 'আপনি' বলছো আর আমি 'তুমি' বলে যাচ্ছি। কিন্তু বেশি দিন চালাতে পারবে না। সমস্ত আফগানিস্থানে আমাকে কেউ 'আপনি' বলে না, ইস্তেক আগা আহমদ পর্যন্ত না।'

টাঙায় চড়বার সময় 'দাঁড়াও' বলে ছুটে গিয়ে একখানা বই নিয়ে এসে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'ভালো বই, কর্সিকা আর আফগানিস্থানে একই রকম প্রতিশোধের ব্যবস্থা।' চেয়ে দেখি 'কলঁবা'।*

উনিশ

দিন দশেক পরে একদিন জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দোস্ত মুহম্মদ। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে কাবুলী কায়দায় 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো', বলতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, দোস্ত মুহম্মদ কোনো সাড়া-শব্দ না দিয়ে আপন মনে কী সব বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছেন। কাছে এসে কান পেতে যা শুনলাম, তাতে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। বলছেন, 'কমরত ব শিকনদ, খুদা তোরা কোর সাজদ, ব পুন্দী, ব তরকী ইত্যাদি।'

সরল বাঙলায় তর্জমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, 'তোর কোমর ভেঙে দু'টুকরো হোক, খুদা তোর দু' চোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা।'

আমি কোনো গতিকে সামলে নিয়ে বললুম, ' দোস্ত মুহম্মদ, কী সব আবোল-তাবোল বকছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ আমাকে আলিঙ্গন করে দু'গালে দুটো বম্‌শেল চুমো লাগালেন। বললেন, 'আমি কক্ষনো আবোল-তাবোল বকিনে।'

আমি বললুম, 'তবে এসব কী?'

বললেন, 'এসব তোর বালাই কাটাবার জন্য। লক্ষ্য করিসনি, এদেশে বাচ্চাদের সাজিয়ে-গুজিয়ে কপালের একপাশে খানিকটে ভুসো মাখিয়ে দেয়। তোর কপালে তো আর ভুসো মাখাতে পারিনে—

*'আগুনের ফুলকি' নাম দিয়ে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন।

তাই কথা দিয়ে সেরে নিলুম। যাকে এত গালাগাল দিচ্ছি, যম তাকে নেবে কেন? পরমায়ু বেড়ে যাবে। বুঝলি?'

লক্ষ্য করলুম গেল বার দোস্ত মুহম্মদ আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছিলেন, এবারে সেটা 'তুই'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফার্সী ভাষায় 'আপনি, তুমি, তুই' তিন বাক্য নেই—আছে শুধু 'শোমা' আর 'তো'। কিন্তু ঐ 'তো' দিয়ে 'তুমি', 'তুই' দুই-ই বোঝানো যায়—যেরকম ইংরিজিতে যখন বলি, 'ড্যাম ইউ', তখন তার অর্থ 'আপনি চুলোয় যান' নয়, অর্থ তখন 'তুই চুলোয় যা'। খাঁটি পাঠান আবার 'শোমা' কথাটাও ব্যবহার করে না, ইংরেজের মত শুধু ঐ এক 'ইউ'-ই জানে। বেদুইনের আরবীতেও মাত্র এক 'আনতা'। বোধহয় পাঠান, ইংরেজ, বেদুইনের ডিমোক্র্যাসি তার সম্বোধনের সমতায় প্রকাশ পেয়েছে।

দোস্ত মুহম্মদ স্মরণ করিয়ে দিলেন প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের ছোট ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন। সইফুল আলম তাঁকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে। গাড়ি তৈরি।

সিগারেট দিয়ে বললুম, 'খান।'

বললেন, 'না। আবদুর রহমানকে বলো তামাক দিতে।'

আমি বললুম, 'আবদুর রহমানকে চেনেন তাহলে?'

বললেন, 'তোমাকে কে চেনে বাপু, তুমি তো দু'দিনের চিড়িয়া। আমাকে কে চেনে বাপু, আমিও তিন দিনের পাখি—যে পাহাড় থেকে নেমে এসেছি, সে পাহাড়ের গর্ভে আবার ঢুকে যাব, আগা আহমদের টাকাটা মেরে। আমি কে? মকতবে আমানিয়ার অধ্যাপক অবশ্যি বটি, কিন্তু ক'টা লোকে জানে? অথচ বাজারে গিয়ে পুছো, দেখবে সবাই জানে, আমি হচ্ছি সেই মূর্খ, যার কাঁধে বন্দুক রেখে আগা আহমদ শিকার করে, অর্থাৎ আগা আহমদের মনিব। তুমি কে? যার কাঁধে আবদুর রহমান বন্দুক রেখেছে—শিকার করে কি না করে পরে দেখা যাবে। চাকর দিয়ে মনিব চিনতে হয়।'

আমি বললুম, 'বেশক্, বেশক্।' তারপর বাঙলায় বললুম, 'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

বললেন, 'বুঝিয়ে বল।'

তর্জমা শুনে দোস্ত মুহম্মদ আনন্দে আত্মহারা। শুধু বলেন 'আফরীন, আফরীন, সাবাস, সাবাস, উম্‌দা কবিতা, জরির কলম।' তারপর মুখে মুখে শেষ লাইনের একটা অনুবাদও করে ফেললেন,

'মনে বুরুৎ, তনে বুরুৎ, বুরুৎ সনাক্তদার।'

তারপর বললেন, 'আমি আরবী, ফার্সী, আর তুর্কী নিয়ে কিছু কিছু নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু ভাল রসিকতা কোথাও বিশেষ দেখিনি। পদ্যে তো প্রায় নেই-ই। বাঙলায় বুঝি এরকম অনেক মাল আছে?'

আমি বললুম, 'না, মাত্র দু'খানা কি আড়াইখানা বই।'

দোস্ত মুহম্মদ নিরাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে আর বাংলা শিখে কী হবে।'

পেশাওয়ারের আহমদ আলী আর কাবুলের দোস্ত মুহম্মদে একটা মিল দেখতে পেলুম—দু'জনই অল্প রসিকতায় মুগ্ধ হন। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, আহমদ আলীর জীবনের ধারা বয়ে চলেছে আর পাঁচজনের মত, আর দোস্ত মুহম্মদের জীবন যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, মাঝখানে রসিকতার সূর্যকিরণ পড়লেই রামধনুর রঙ মেখে নিচ্ছে। দু'-একবার মামুলি দুঃখকষ্টের কথা বলতে গিয়ে দেখলুম, সে সব কথা তার কানে যেন পৌঁচচ্ছেই না। বিলাসব্যসনেও শখ নেই। তিনি যেন সমস্তক্ষণ বোম্বাগড়ের সন্ধানে, যেখানে রাজার পিসী পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকেন, যেখানে পণ্ডিতেরা টাকের উপর ডাকের টিকিট আঁটেন।

তাই যখন আমরা বিয়ের মজলিসে গিয়ে কাবুল শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝখানে আসন পেলুম, তখন দোস্ত মুহম্মদের জন্য দুঃখ হল। খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি চোখ বন্ধ করে বিড়

বিড় করে কী যেন আপন মনে বলে যাচ্ছেন। তাঁর দিকে একটু ঝুঁকতেই তিনি বললেন, 'ফয়েজ মুহম্মদের গুণে শিক্ষামন্ত্রীর নাম, না শিক্ষামন্ত্রীর পদের জোরে ফয়েজ মুহম্মদের নাম—মুহম্মদ তর্জীর গুণে বিদেশ সচিবের নাম, না বিদেশ সচিবের পদের জোরে মুহম্মদ তর্জীর নাম? বাঙালী কবি লাখ কথার এক কথা বলেছে—

'গোঁপের আমি, গোঁপেব তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

আমি বললুম, 'চুপ, মন্ত্রীরা সব আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন, শুনতে পেলে আপনাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।'

বললেন, 'হ্যাঁ তা বটে, বিশেষ করে ঐ ফয়েজটা।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফয়েজ মুহম্মদ খান, মিনিস্টার অব পাবলিক-ইনস্ট্রাকশন?'

উত্তর দিলেন, 'না, মিনিস্টার অব পাবলিক ডিস্ট্রাকশন। কত ছেলের মগজ ডেস্ট্রয় করছে। আমাকে মারবে তার আর নতুন কী?'

আমি ভয় পেয়ে 'চুপ চুপ' বলে উজির সায়েবদের 'জ্ঞানগর্ভ' কথাবার্তায় কান দেবার চেষ্টা করলুম।

দোস্ত মুহম্মদকে দোষ দেওয়া অন্যায়। অনেক ভেবেও কুল কিনারা পাওয়া যায় না, এঁরা সব কোন গুণে মন্ত্রী হয়েছেন। লেখাপড়ায় এক-একজন যেন বিদ্যাসাগর। দুনিয়ার কোনো খবর রাখার চাড়ও কারো নেই। বেশির ভাগই একবার দু'বার ইয়োরোপ হয়ে এসেছেন, কিন্তু সেখান থেকে দু'একটা শক্ত ব্যাধি ছাড়া যে কিছু সঙ্গে এনেছেন, তা তো কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে না। ছোকরাদের মধ্যে যারা গালগল্পে যোগ দিল, তারা তবু দু'-একটা পাশ দিয়ে এসেছে, বুড়োদের যাঁরা অবজ্ঞা অবহেলা সত্ত্বেও মুখ খুললেন, তাঁদের কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে যে আর কিছু না হোক তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এই উজিরদের দল না পারে উড়তে, না পারে সাঁতার কাটতে—চলন যেন ব্যাঙের মত, এলোপাতাড়ি, থপথপে। কাবুলের বহু জিনিস, বহু প্রতিষ্ঠান দেখে মনে দুঃখ হয়, কিন্তু এই মন্ত্রীমণ্ডলীকে দেখে কনফুৎসিয়াসের মত বলতে হয়—

'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র, সংসারে প্রণিপাত।'

সইফুল আলম এসে কানে কানে বললেন, 'একটু বাদে দক্ষিণের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন; আমি দোরের গোড়ায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।' দোস্ত মুহম্মদ না শুনেও মাথা নাড়িয়ে প্রকাশ করলেন যে, তিনিও আসছেন।

মজলিস থেকে বেরিয়ে যেন দম ফেলে বাঁচলুম। দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, গরগরা শুদম—আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

সত্যিকার বিয়ের মজলিসে তখন প্রবেশ পেলুম। সেখানে দেখি জনবিশেক ছোকরা, কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ গড়াগড়ি দিয়ে আড্ডা জমাচ্ছে। একজন গামছা দিয়ে গ্রামোফোনটার মুখ গুঁজে সাউণ্ড-বক্সের পাশে কান পেতে গান শুনছে। জনতিনেক তাস খেলছে। বিদগ্ধ মোল্লা মির আসলম এক কোণে কী একখানা বই পড়ছেন। আরেক কোণে এক বুড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন, অথবা ঘুমচ্ছেন—মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি, বরফের মত সাদা দাড়ি আর কালো মিশমিশে জোব্বা। শান্ত মুখচ্ছবি—একপাশে ছোট একখানা সেতার। সব ছেলে-ছোকরার পাল, ঐ মির আসলম আর সেতারওয়ালা বৃদ্ধ ছাড়া। মজলিসে আসবাবপত্র কিছু নেই, শুধু দামি গালচে আর রঙিন তাকিয়া।

কেউ কেউ 'বফরমাইদ', আসতে আজ্ঞা হোক, বলে অভ্যর্থনা করলেন।

আমি দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এইখানে সোজা এলেই তো হত।'

তিনি বললেন, 'সেটি হবার জো নেই, আসল মজলিসে বসে নাভিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত এখানে

প্রোমোশন নদারদ। তা তুমি তো বাপু বেশ চাঁদপানা মুখ করে বসেছিলে। তোমাকে সেখানে উসখুস না করে বসে থাকতে দেখে আমার মনে তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় ভয় জেগেছে। এদেশে উজির হবার আসল গুণ তোমার আছে—To sit among bores without being bored, কিন্তু খবরদার, সাবধানে পা ফেলে চলো দাদা, নইলে রক্ষে নেই— দেখবে একদিন বলা নেই কওয়া নেই ক্যাঁক করে ধরে নিয়ে উজির বানিয়ে দিয়েছে।'

সইফুল আলম আমাকে আদর করে বসালেন।

তরুণদের আড্ডা যে উজিরদের মজলিসের চেয়ে অনেক বেশি মনোরঞ্জক তা নয়, তবে এখানে লৌকিকতার তর্জনী নেই বলে যা খুশি করার অনুমতি আছে। এরা নির্ভয়ে পলিটিক্স পর্যন্ত আলোচনা করে এবং যৌবনের প্রধান ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে কারো মুখে আর কোনো লাগাম থাকে না। কথাবার্তায় ভারতীয় তরুণদের সঙ্গে এদের আসল তফাত এই যে, এদের জীবনে নৈরাশ্যের কোনো চিহ্ন নেই, বর্তমান থেকে পালিয়ে গিয়ে অতীতে আশ্রয় তো এরা খোঁজেই না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা আশা-ভরসা, তাও স্বপ্নে গড়া পরিস্থান নয়। শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে অচেতন এরকম জোয়ান আমি আর কোথাও দেখিনি। এদেরই একজন আর বসন্তে কী করে ট্রান্সফার হয়ে বদখশান থেকে হিন্দুকুশ পার হয়ে কাবুল এসেছিল তার বর্ণনা দিচ্ছিল। সমস্ত দিন হেঁটে মাত্র তিন মাইল রাস্তা এগোতে পেরেছিল, কারণ একই নদীকে ছ'বার পার হতে হয়েছিল, কিছুটা সাঁতরে, কিছুটা পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে। দুটো খচ্চর ভেসে গেল জলের তোড়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল খাবার-দাবার সবকিছু। দলে সাতজনের মধ্যে দুজন অনাহারে মারা যান।

এসব বর্ণনা আমি যে জীবনে প্রথম শুনলুম তা নয়, কিন্তু এর বর্ণনাতে কোনো রোমান্স মাখানো ছিল না, পর্যটকদের গতানুগতিক দম্ভ ছিল না আর আফগান সরকারের নিরর্থক অসময়ে ট্রান্সফার করার বাতিকের বিরুদ্ধে কণামাত্র নালিশ-ফরিয়াদ ছিল না। ভাবখানা অনেকটা 'ছাতা ছিল না তাই বিষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরলুম। কাল আবার বেরুতে পারি দরকার হলে—ছাতা যে সঙ্গে নেবই সে রকম কথাও দিচ্ছিনে।' অর্থাৎ আগামী বসন্তে যদি তাকে ফের বদখশান যেতে হয় তবে সে আপত্তি জানাবে না।

অথচ যখন বার্লিনে পড়াশোনা করত তখন তিন বছর ধরে মাসে চার শ' মার্ক খরচা করে আরামে দিন কাটিয়েছে।

অনেক রাতে খাবার ডাক পড়ল। গরম বাঙলাদেশেই যখন বিয়ের রান্না ঠাণ্ডা হয় তখন ঠাণ্ডা কাবুলে যে বেশির ভাগ জিনিসই হিম হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

মির আসলম তাই খানিকটে মাংস এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিঞ্চিৎ শূল্যপক্ক অজমাংস ভক্ষণ কর। আভ্যন্তরিক উষ্মার জন্য ইহাই প্রশস্ততম।'

তারপর দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো জিনিসের অপ্রাচুর্য হয় নাই তো?' দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, গরগরা শুদম—আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

কোনো জিনিসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার এই হল ফার্সী সংস্করণ।

আফগান বিয়ের ভোজে যে বিস্তর লোক প্রচুর পরিমাণে খাবে সে কথা কাবুলে না এসেও বলা যায়, কিন্তু তারো চেয়ে বড় তত্ত্বকথা এই যে, যত খাবে তার চেয়ে বেশি ফেলবে, বাঙলাদেশের এই সুসভ্য বর্বরতার সন্ধান আফগানরা এখনো পায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর গালগল্প জমল ভালো করে। শুধু দোস্ত মুহম্মদ কাউকে কিছু না বলে তিনটে কুশনে মাথা দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আবহাওয়া থেকে অনুমান করলুম যে, রেওয়াজ হচ্ছে, হয় মজলিসের পাঁচজনের সঙ্গে গুষ্টিসুখ

অনুভব করা, নয় নির্বিকারচিত্তে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়া। বিয়েবাড়ির হৈ-হল্লা, কড়া বিজলি বাতি আফগানের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।

রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন একজন করে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সইফুল আলম আমাদের আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে গেলেন। মির আসলমের ভাষা বিদগ্ধ হতে বিদগ্ধতর হয়ে যখন প্রায় যজ্ঞভস্মের মত পূতপবিত্র হবার উপক্রম করেছে, তখন তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। চেয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ সেতারখানা কোলে তুলে নিয়েছেন।

মির আসলম আমাকে কানে কানে বললেন, 'তোমার অদৃষ্ট অদ্য রজনীর তৃতীয় যামে সুপ্রসন্ন হইল।'

সমস্ত সন্ধ্যা বৃদ্ধ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। 'পিড়িং' করে প্রথম আওয়াজ বেরতেই মনে হল, এঁর কিন্তু বলবার মত অনেক কিছু আছে।

প্রথম মৃদু টঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই দোস্ত মুহম্মদও সোজা হয়ে উঠে বসলেন—যেন এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় শুয়ে শুয়ে প্রহর গুনছিলেন।

সেতারের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পূর্বেই বুড়োর গলা থেকে গুঞ্জরন ধ্বনি বেরল—কিন্তু ভুল বললুম গলা থেকে নয়, বুক, কলিজা থেকে, তার প্রতি লোমকূপ ছিন্ন করে যেন সে শব্দ বেরল। সেতার বাঁধা হয়েছিল কোন সন্ধ্যায় জানিনে কিন্তু তাঁর গলার আওয়াজ শুনে মনে হল, এঁর সর্বশরীর যেন আর কোনো ওস্তাদের ওস্তাদ বহুকাল ধরে বেঁধে বেঁধে আজ যামিনীর শেষ যামে এই প্রথম পরিপূর্ণতায় পৌঁছলেন।

ওস্তাদী বাজনা নয়—বুড়োর গলা থেকে যে পরি হঠাৎ ডানা মেলে বেরল, সেতারের আওয়াজ যেন তার ছায়া হয়ে গিয়ে তারই নাচে যোগ দিল।

ফার্সী গজল। বুড়োর চোখ বন্ধ; শান্ত-প্রশান্ত মুখচ্ছবি, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপছে না, ওষ্ঠ অধরের মৃদু স্ফুরণের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে গম্ভীর নিষ্কম্প গুঞ্জরন। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আওয়াজ যেন বন্ধনমুক্ত আতরের মত সভাস্থল ভরে দিল।

গানের কথা শুনব কি, সেতারে গলায় মিশে গিয়েছে, যেন সন্ধ্যাবেলাকার নীল আকাশ সূর্যাস্তের লাল আবির মেখে নিয়ে ঘন বেগুনী থেকে আস্তে আস্তে গোলাপির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর পাঁচজনের কথা বলতে পারিনে—এরকমের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। জন্মান্ধ যেন চোখ মেলল, সূর্যাস্তের মাঝখানে। আমি তখন রঙের মাঝখানে ডুবে গিয়েছি—সমুদ্র, বেলাভূমি, তরুপল্লব কিছুই চোখে পড়ছে না।

ধ্বনির ইন্দ্রজালে মোহাচ্ছন্ন করে বৃদ্ধ যেন একমাত্র আমারই কানে কানে তাঁর গোপন মন্ত্র পড়তে লাগলেন—

'শবি আগর, শবি আগর, শবি আগর—'

'যদি এক রাত্রের তরে, মাত্র একটি রাতের তরে, একবারের তরে—'

আমি যেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, 'কী? কী? কী? এক রাত্রের তরে, একবারের তরে কী?' কিন্তু বলার উপায় নেই—দরকারও নেই, গুণী কি জানেন না?

'আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্'

'প্রিয়ার অধর থেকে একটি চুম্বন পাই'

প্রথমবার বললেন অতি শান্ত কণ্ঠে, কিন্তু যেন নৈরাশ্য-ভরা সুরে, তারপর নৈরাশ্য যেন কেটে যেতে লাগল, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল, সাহস বাড়তে লাগল, সবশেষে রইল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাষা, 'পাবোই পাবো, নিশ্চয় পাবো।'

গুণী গাইছেন 'লবে ইয়ার', 'প্রিয়ার অধর' আর আমার বন্ধ চোখের সামনে কালোর মাঝখানে

ফুটে ওঠে টকটকে লাল দুটি ঠোঁট, যখন শুনি 'বোসয়ে তলবম্, যদি একটি চুম্বন পাই', তখন চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে যায়, বুকের মাঝখানে যেন তখন শুনতে পাই সেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, আতুর হিয়ার আকুলিবিকুলি, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় প্রত্যয়।

হুঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'জোয়ান শওম।'

'তাহলে আমি জোয়ান হব—একটি মাত্র চুম্বন পেলে লুপ্ত যৌবন ফিরে পাব।'

সভাস্থল যেন তাণ্ডব নৃত্যে ভরে উঠল—দেখি শঙ্কর যেন তপস্যা শেষে পার্বতীকে নিয়ে উন্মত্ত নৃত্যে মেতে উঠেছেন। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার—'জোয়ান শওম', 'জোয়ান শওম'। কোথায় বৃদ্ধ সেতারের ওস্তাদ—দেখি সেই জোয়ান মঙ্গোল। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু'-পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটছে, আর দু'হাত মেলে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনে ছুঁড়ে কালো বাবরি চুলের আবর্তের ঘূর্ণি লাগিয়েছে।

দেখি তাজমহলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন শাহজাহান আর মমতাজ। হাত ধরাধরি করে। নবীন প্রাণ, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছেন, শতাব্দীর বিচ্ছেদ শেষ হয়েছে।

শুনি সঙ্গীত তরঙ্গের কলকল্লোল জাহ্নবী। সগররাজের সহস্র সন্তান নবীন প্রাণ, নবীন যৌবন ফিরে পেয়ে উল্লাসধ্বনি করে উঠেছে।

কিন্তু গুণী, যৌবন পেয়েছে, প্রিয়ার প্রসাদ পেয়েছে, চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে—অথচ কবিতার পদ যে এখনো অগ্রগামী—

'শবি আগর, আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্

জোয়ান শওম—'

আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই

জোয়ান হইব—

তারপর, তারপর কী?

শুনি অবিচল দৃঢ়কণ্ঠে অদ্ভুত শপথগ্রহণ—

'জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম'

'এই জীবন তাহলে আবার দোহরাতে, দু'বার করতে রাজি আছি। একটি চুম্বন দাও, তাহলে আবার সেই অসীম বিরহের তপ্ত দীর্ঘ অন্তবিহীন পথ ক্ষতবিক্ষত রক্তসিক্ত পদে অতিক্রম করবার শক্তি পাব। আসুক না আবার সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদ, তোমার অবহেলার কঠোর কঠিন দাহ!

আমি প্রস্তুত, আমি শপথ করছি,

—'জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম!'

'গোড়া হতে তবে এ-জীবন দোহরাই।'

আমি মনে মনে মাথা নিচু করে বললুম, 'ক্ষমা করো গুণী, ক্ষমা করো কবি। শিখরে পৌঁছে উদ্ধত প্রশ্ন করেছিলুম, পদ এখনো অগ্রগামী, যাবো কোথায়? তুমি যে আমাকে হঠাৎ সেখান থেকে শূন্যে তুলে নিতে পারো, তোমার গানের পরি যে আমাকেও নীলাম্বরের মর্মমাঝে উধাও করে নিয়ে যেতে পারে, তার কল্পনাও যে করতে পারিনি!'

বারে বারে ঘুরে ফিরে গুণীর আকুতি-কাকুতি 'শবি আগর', 'যদি এক রাতের তরে' আর সেই দৃঢ় শপথ 'জিন্দেগী দুবারা কুনম', 'এ-জীবন দোহরাই'—গানের বাদবাকি এই দুই বাক্যেই বারে বারে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে স্বপ্রকাশ হচ্ছে। কখনো শুনি 'শবি আগর' কখনো শুধু 'দুবারা কুনম'—'শবি আগর, দুবারা কুনম।'

পশ্চিমের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও পুবের আকাশ অনেকক্ষণ ধরে লাল রঙ ছাড়ে না—কখন গান বন্ধ হয়েছিল বলতে পারিনে। হঠাৎ ভোরের আজান কানে গেল, 'আল্লাহ আকবর', 'খুদাতাল

মহান।' মাভৈ, মাভৈ, ভয় নেই, ভয় নেই, তোমার সব কামনা পূর্ণ হবে।

'ওয়া লাল আখিরাতু খাইরুন লাকা মিনাল্ উলা'

'অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবে তো ভবিষ্যৎ।'*

চোখ মেলে দেখি কবি নেই। মোল্লা মির আসল পাথরের মত বসে আছেন, আর দোস্ত মুহম্মদ দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছেন।

বিশ

দরজা খাঁ খাঁ করছে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। আসবাবপত্র সব অন্তর্ধান। কার্পেটের উপর অ্যাটাচি কেসে মাথা রেখে দোস্ত মুহম্মদ শুয়ে। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, 'বোরো, গুমশো'— 'বেরিয়ে যা, পালা এখান থেকে।'

দোস্ত মুহম্মদের রকমারি অভ্যর্থনা সম্ভাষণে ততদিনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কাছে গিয়ে বললুম, 'জিনিসপত্র সব কী হল? আগা আহমদ যে ভারি ভারি টেবিল চেয়ার, কৌচ সোফা পর্যন্ত সরাবে ততটা আঁচ করতে পারিনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বিড় বিড় করে বললেন, 'সব ব্যাটা চোর, সব শালা চোর, কোনো ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই, কাবুল থেকে প্যারিস পর্যন্ত।'

আমি বললুম, 'বড় অন্যায় কথা। চুরি করল আগা আহমদ, দোষ ছড়ালো প্যারিস পর্যন্ত!'

বললেন, 'কী মুশকিল, আগা আহমদ চুরি করলে তার পিছনে আমি রাইফেল কাঁধে করে বেরতুম না? না বেরুলে আফ্রিদী সমাজে আমার জাত-ইজ্জত থাকত? নিয়েছে ব্যাটা লাফোঁ।'

'সে আবার কে?'

'পরশু এসে পৌঁচেছে, ফরাসী অধ্যাপক। লব্-ই-দরিয়ায় বাসা বেঁধেছে—বেশ বাড়িখানা। আফগান সরকারের যত আদিখ্যেতাআত্তি সব বিদেশিদের জন্য।'

আমি বললুম, 'চোর কে, তার সাকিন-ঠিকানা সব যখন জানেন তখন মাল উদ্ধার—'

বললেন, 'আইনে দেয় না—বেচারি দুঃখ করছিল কোথাও আসবাবপত্র পাচ্ছে না। আমি বললুম, আমার বাড়ীতে বিস্তর আছে—ফরাসী জানো তো, বুক দ্য ম্যোবল, ফুল দ্য ম্যোবল, তা দ্য ম্যোবল, ব্যাটাকে দেখিয়ে দিলুম 'বিস্তর মাল' যত বিচিত্র কায়দায় ফরাসিতে বলা যায়। শুনে ব্যাটা দুসরা আফগান লড়াইয়ের গোরা সেপাইয়ের মত কচুকাটা হয়ে শুয়ে পড়ল।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'শুয়ে পড়ল কোথায়, এসে তো দিব্যি সব কিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল।'

দোস্ত মুহম্মদ আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'তওবা তওবা, নিজে এলে কি আর সব নিয়ে যেত—দেখত না ভিটেতে কবুতর চরার মত অবস্থা হয়ে উঠেছে। আমিই সব পাঠিয়ে দিলুম।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বেশ করেছ, এখন মরো হিমে শুয়ে—'

এক লাফ দিয়ে দোস্ত মুহম্মদ আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বলিনি বলিনি, তখন বলিনি, পারবিনি রে, পারবিনি—তোকে 'আপনি' বলা ছাড়তেই হবে। কিন্তু তুই ভাই রেকর্ড ব্রেক করেছিস—ঝাড়া পনেরো দিন 'আপনি' চালিয়েছিস।'

আমি বললুম, 'বেশ বেশ। কিন্তু স্বেচ্ছায় যখন সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছ তখন দুনিয়া শুদ্ধ লোককে 'চোর-চামার' বলে কটু-কাটব্য করছিলে কেন?'

'কাউকে বলবিনে, শুনেই ভুলে যা[illegible]? তবে বলি শোন। তুই যখন ঘরে ঢুকলি তখন দেখলুম তোর মুখ বড্ড ভার। হয়ত দেশের কথা [illegible]বছিলি, নয় কাল রাত্তিরের গানের খোয়ারি কাটিয়ে উঠতে

* কুরান শরীফ ৯৩, ৪

.... ,—কেন যে ক্ষ্যাপারা এরকম ভূতুড়ে গান গায়? তা সে যাকগে, কিন্তু তোর মুখ দেখে মনে হল তুই বড্ড বেজার। তাই যা তা সব বানিয়ে, তোকে চটিয়ে সব কথা ভুলিয়ে দিলুম। দেখলি কায়দাখানা?'

আমি বললুম, 'খুব দেখলুম, আমাকে বেকুব বানালে। তোমাকে বেকুব বানায় আগা আহমদ, আর তুমি বেকুব বানালে আমাকে। তা নতুন কিছু নয়—আমাদের দেশে একটা দোহা আছে—

শমনদমন রাবণ আর রাবণদমন রাম,
শ্বশুরদমন শাশুড়ী আর শাশুড়ীদমন হাম।'

ঢিলে গল্প, কাঁচা রসিকতা। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদ নবীনের মত, 'যাহা পায় তাহাই খায়', মুখে হাসি লেগেই আছে।

আমি বললুম 'সব বুঝেছি, কিন্তু একটা খাট তো অন্তত কেনো, মাটিতে শোবে নাকি?'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তবে আসল কথাটা এই বেলা শোন্; বিলিতি আসবাবপত্রে আমি কখনো আরাম বোধ করিনি---দশ বৎসর চেষ্টা করার পরও। অথচ পয়সা দিয়ে কিনেছি, ফেলতে গেলে লাগে। এতদিনে যখন সুযোগ মিলল তখন নতুন করে জঞ্জাল জুটোব কেন? এইবার আরাম করে পাঠানি কায়দায় ঘরময় মই চষে বেড়াব—খাট থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙবার আর ভয় নেই।'

আমি বললুম, 'কমরত ন শিকনদ, তোমার কোমর ভেঙে দু'টুকরো না হোক।'

কথা ছিল দু'জনে একসঙ্গে বগদানফ সায়েবের বাড়ি যাব।

পূর্বেই বলেছি ফরাসী দূতাবাসে বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানা ছিল বিদেশী মহলের কেন্দ্রভূমি। বাগান থেকেই শব্দ শুনে তার আভাস পেলুম। ঘরে ঢুকে দেখি একপাল সায়েব মেম।

আমাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বগদানফ সায়েব চোস্ত ফরাসী ভাষায় দুরুস্ত ফরাসী কায়দায় বললেন 'পেরমেতে মওয়া ল্য প্লেজির দ্য ভু প্রেজাঁতে—অনুমতি যদি দেন তবে আপনাদের সামনে অমুককে নিবেদন করে বিমলানন্দ উপভোগ করি।'

তারপর এক-একজন করে সকলের নাম বলে যেতে লাগলেন। আমি বলি, 'হাডুডু', তাঁদের কেউ বলেন 'আশাঁতে', কেউ বলেন, 'শার্মে', কেউ বলেন, 'রাভি'। অর্থাৎ আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেউ হয়েছেন enchanted, কেউ charmed কেউ বা ravished। একেই বলে ফরাসী ভদ্রতা। এঁরা যখন গ্রেতা গার্বো বা মার্লেনে দীতরিশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি সত্যি enchanted হন তখন কী বলেন তার সন্ধান এখনো পাইনি।

মসিয়ো লাফোঁ গল্পের ছেঁড়া সুতোর খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'তারপর বাদশা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ফরাসী শিখতে ছ'মাসের বেশি সময় লাগার তো কথা নয়!' আমি বললুম, 'না হুজুর, অন্তত দু'বছর লাগার কথা।'

বগদানফ সায়েব বললেন, 'করেছেন কী? বাদশাহের কোনো কথায় না বলতে আছে? দিবা দ্বিপ্রহরে, প্রখর রৌদ্রালোকে যদি হুজুর বলেন 'পশ্য পশ্য, নীলাম্বরের ললাটদেশে চন্দ্রমা কী প্রকারে শ্বেতচন্দন প্রলেপ করেছেন।' আপনি তখন প্রথমে বলবেন, 'হুজুরের যে পূতপবিত্র পদদ্বয় অনাদি কাল থেকে অসীম কাল পর্যন্ত মণি-মাণিক্যবিজড়িত সিংহাসনে বিরাজমান, এ-গোলাম সেই পদরজ-স্পর্শ লাভের আশায় কুরবানী হতে প্রস্তুত।' তারপর বলবেন—'

বাধা দিয়ে মাদাম লাফোঁ বললেন, 'সম্পূর্ণ মন্ত্রোচ্চারণে যদি ভুলচুক হয়ে যায়? দৈর্ঘ্য তো কিছু কম নয়।'

বগদানফ সায়েব সদয় হাসি হেসে বললেন, 'অল্প-স্বল্প রদবদল হলে আপত্তি নেই। 'মণি-মাণিক্যের' বদলে 'হীরা-জওহর' বলতে পারেন, 'পদরজের' পরিবর্তে 'পদধূলি' বললেও বাধবে না।

'তারপর বলবেন, 'হুজুরের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—চন্দ্রমা সত্যিই কী অপূর্ব বেশ ধারণ করেছেন এবং

নক্ষত্রমণ্ডলী কতই না নয়নাভিরাম।'

ইতালির সিন্যোরা দিগাদো জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি ভদ্রতা বজায় রেখে হুজুরকে সত্যি কথা জানাবার কোনো উপায়ই নেই? এই মনে করুন মসিয়ো লাফোঁ যদি সত্যি সত্যি জানাতে চান যে, ফরাসী শিখতে দু'বছর লাগে?'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে, বাদশা যখন বলবেন ছ'মাস, আপনি তখন বলবেন, 'নিশ্চয়ই হুজুর ছ'মাসেই হয়। দু'বছরে আরো ভালো হয়।' হুজুরেরও তো কাণ্ডজ্ঞান আছে। আপনার ভদ্রতা সৌজন্যের আতর তিনি শুঁকবেন, গায়ে মাখবেন, তাই বলে তো আর গিলবেন না।'

মসিয়ো লাফোঁ বললেন, 'এ সব বাড়াবাড়ি।'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই, বাড়াবাড়িরই আরেক নাম superfluity। আর পোয়েট টেগোর— আমাদের তিনি গুরুদেব—' বলেই তিনি প্রফেসর বেনওয়া ও আমার দিকে একবার বাও করলেন— 'তিনি বলেন আর্টের সৃষ্টি হয়েছে সুপারফ্লুয়িটি থেকে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা বোঝাতে গিয়ে তিনি শাস্ত্রী মশায়কে কী একটা চমৎকার তুলনা দিয়েছিলেন না?'

আমি বললুম, 'কাঠের ডাণ্ডা লাগানো টিনের কেনেস্তারায় করে রাধু মালীর নাইবার জল আনার মধ্যে আর নন্দলাল কর্তৃক চিত্রবিচিত্র মৃৎপাত্র ভরে ষোড়শী তন্বঙ্গী সুন্দরীর জল আনার মধ্যে যে সুপারফ্লুয়িটির তফাৎ তাই আর্ট।'

বগদানফ সায়েব উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'শুধু আর্ট? দর্শন, বিজ্ঞান, সবকিছু—কলচর বলতে যা কিছু বুঝি। সবই সুপারফ্লুয়িটি থেকে, বাড়াবাড়ি থেকে।'

অধ্যাপক ভ্যাঁসাঁ বললেন, 'কিন্তু এই কলচর যখন চরমে পৌঁছয় তখন গুরুচণ্ডালে এত পার্থক্য হয়ে যায় যে, বাইরের শত্রু এসে যখন আক্রমণ করে তখন সে দেশের সব শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে স্বাধীনতা হারায়। যেমন ইরান।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষ'।

পোলিশ মহিলা মাদাম ভরভচিয়েভিচি বললেন, 'কিন্তু ইংরেজ? তারা তো সভ্য, তাদের গুরুচণ্ডালেও তফাত অনেক, কিন্তু তারা তো সব সময় এক হয়ে লড়তে পারে।'

বগদানফ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাদের কথা বললেন, মাদাম?'

'ইংরেজের।'

'ঐ যারা ইয়োরোপের পশ্চিমে একটা ছোট দ্বীপে থাকে?'

মজলিসে ইংরেজ কেউ ছিল না। সবাই ভারী খুশি। আমি মনে মনে বললুম, 'আমাদের দেশেও বলে 'চরুয়া'।'

অধ্যাপক ভ্যাঁসাঁ বললেন, 'বগদানফ ঠিক অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের ভিতর অনেক খানদানী বংশ আছে সত্যি কিন্তু গুরুচণ্ডালে যে বৈদগ্ধ্যের পার্থক্য হবে, সে কোথায়? ওদের তো থাকার মধ্যে আছে এক সাহিত্য। সঙ্গীত নেই, চিত্রকলা নেই, ভাস্কর্য নেই, স্থপতি নেই। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে পার্থক্য হবে তার অনুভূতিগত উপকরণ কোথায়? অথচ ফ্রান্সে এসব উপকরণ প্রচুর; তাই দেখুন ফরাসিরা এক হয়ে লড়তে জানে না, শান্তির সময় রাজ্য পর্যন্ত চালাতে পারে না। যে দেশে আছি তার নিন্দে করতে নেই, কিন্তু দেখুন, এক ফোঁটা দেশ অথচ স্বাধীন।'

মাদাম ভরভচিয়েভিচি বললেন, 'এ দেশেও তো মোল্লা আছে।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিছু ভয় নেই মাদাম। মোল্লাদের আমি বিলক্ষণ চিনি। ওদের বেশির ভাগ যেটুকু শাস্ত্র জানে আপনাকে সেটুকু আমি তিন দিনেই শিখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু মেয়েদের মোল্লা হওয়ার রেওয়াজ নেই।'

মাদাম চটে গিয়ে বললেন, 'কেন নেই?

দোস্ত মুহম্মদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাড়ি গজায় না বলে।'

ভ্যাঁসাঁ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মোল্লাই হন আর যাই হন, এ দেশের মেয়ে হয়ে জন্মালে যে আপনাকে বোরকার আড়ালে থাকতে হত। আমাদের ক্ষেতিটা বিবেচনা করুন।'

সবাই একবাক্যে—

'Oui Madame,

Si, si, Madame,

Certainement, Madame.'

কোরাস সমাপ্ত হলে দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিন্তু পর্দা-প্রথা ভালো।'

যেন আটখানা অদৃশ্য তলোয়ার খোলার শব্দ শুনতে পেলুম; চোখ বন্ধ করে দেখি দোস্ত মুহম্মদের মুণ্ডুটা গড়িয়ে গড়িয়ে আফ্রিদী মুল্লুকের দিকে চলেছে।

নাঃ! কল্পনা। শুনি দোস্ত মুহম্মদ বলছেন, 'ধর্মত বলুন তো মশায়রা, মাদাম ভরভচিয়েভিচি, মাদাম লাফোঁ, সিন্নোরা দিগাদোর মত সুন্দরী সংসারে কয়টি? বেশীর ভাগই তো কুচ্ছিত। পাইকারি পর্দা চালালে তাহলে ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশী নয় কি?'

মহিলারা কথঞ্চিৎ শান্ত হলেন।

কিন্তু মাদাম ভরভচিয়েভিচি পোলিশ—উষ্ণ রক্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর পুরুষদের সবাই বুঝি খাপসুরত এ্যাডনিস? তারাই বা বোরকা পরে না কেন, শুনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তাই তো পুরুষদের দিকে মেয়েদের তাকানো বারণ।'

মজলিসে হট্টগোল পড়ে গেল। মেয়েরা খুশী হলেন, না ব্যাজার হলেন ঠিক বোঝা গেল না। কুয়াশা কাটিয়ে সিন্নোরা দিগাদো দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরীর অপ্রাচুর্য বলেই কি আপনি বিয়ে করেননি?'

দোস্ত মুহম্মদ একটুখানি হাঁ করে বাঁ হাত দিয়ে ডান দিকের গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তা নয়। আসল কথা হচ্ছে, কোনো একটি সুন্দরীকে বেছে নিয়ে যদি তাকে বিয়ে করি তবে তার মানে কি এই নয় যে, আমার মতে দুনিয়ার আর সব মেয়ে তার তুলনায় কুচ্ছিত? একটি সুন্দরীর জন্য দুনিয়ার সব মেয়েকে এ রকম বে-ইজ্জৎ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

সবাই খুশি। আমি বিশেষ করে। পাহাড়ী আফগান বিদগ্ধ ভ্যাঁসাঁকে শিভালরিতে ঘায়েল করে দিল বলে।

ইরানি রাজদূতাবাসের আগা আদিব এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, বললেন, 'তবেই আফগানিস্থানের হয়েছে। ইরানি কায়দার নকল করে আফগানিস্থানের কপাল ভাঙবে। ইরান কিন্তু ইতিমধ্যে হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে। শাহ-বাদশাহের সঙ্গে কথা বলবার যে সব কায়দা বগদানফ সায়েব বললেন সেগুলো তিনি দশ বছর আগে ইরানে শিখেছিলেন। এখন আর সেদিন নেই। সব রকম এটিকেটের বিরুদ্ধে সেখানে এখন জোর আন্দোলন আর ঠাট্টামস্করা চলছে। ঘরে ঢোকার সময় যে সামান্য ভদ্রতা একে অন্যকে দেখায় তার বিরুদ্ধে পর্যন্ত এখন কবিতা লেখা হয়। শুনে শুনে একটা তো আমারই মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, আপনারা শোনেন তো বলি।'

সবাই উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন।

আগা আদিব বেশ রসিয়ে রসিয়ে আবৃত্তি করে গেলেন—

'খুদা তুমি দিলে বহুৎ জ্ঞান,

শেষ রহস্য এইবারেতে কর সমাধান।

ইরান দেশের লোক

কসম খেয়ে বলতে পারি নয় এরা উজবোক।
বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, সাহস আছে ঢের
সিঙি লড়ে, মোকাবেলা করে ইংরেজের।
তবে কেন ঢুকতে গেলেই ঘরে
সবাই এমন ঠেলাঠেলি করে?
দোরের গোড়ায় থমকে দাঁড়ায় ভিতর পানে চায়,
'আপনি চলুন', 'আপনি ঢুকুন', দাঁড়িয়ে কিন্তু ঠায়।
হাসি-খুশী বন্ধ হঠাৎ গল্প যে যায় থেমে
ঠেলাঠেলির মধ্যিখানে উঠছে সবাই ঘেমে।
অবাক হয়ে ভাবি সবাই কেন এমন করে,
দিবা-দ্বিপ্রহরে!
কী করে হয় ঘরের মাঝে ভূত?
তবে কি যমদূত?
সলমনের জিন?
কিম্বা গিলটিন?
ঢুকলে পরেই কপাৎ করে কেটে দেবে গলা,
তাই দেখে কি দোরে এসে বন্ধ সবার চলা?'

একুশ

কাবুলের রাস্তাঘাট, বাজারহাট, উজিরনাজির, গুরুচণ্ডালের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হল বটে, কিন্তু গোটা দেশের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার আশা দেখলুম কম, আর নগর জনপদ উভয় ক্ষেত্রে যে-সব অদৃশ্য শক্তি শান্তির সময় মন্দ গতিতে এবং বিদ্রোহবিপ্লবের সময় দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে সেগুলোর তাল ধরা বুঝলুম আরো শক্ত, প্রায় অসম্ভব।

আফগানিস্থানের মেরুদণ্ড তৈরি হয়েছে জনপদবাসী আফগান উপজাতিদের নিয়ে, অথচ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী, আচারব্যবহার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো কেতাব লেখা হয়নি; কাবুলের এমন কোন গুণীরও সন্ধান পাইনি যিনি সে সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করুন আর নাই করুন অন্তত একটা মোটামুটি বর্ণনাও দিতে পারেন। ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কাবুলীরা প্রায়ই বলেন, 'তারপর শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করল,' কিন্তু যদি তখন প্রশ্ন করেন, 'বিদ্রোহ করল কেন' তবে উত্তর পাবেন, 'মোল্লারা তাদের খ্যাপালো বলে,' কিন্তু তারপরও যদি প্রশ্ন শুধান যে, উপজাতিদের ভিতরে এমন কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উষ্ণ বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল যে, মোল্লাদের ফুলকি দেশময় আগুন ধরাতে পারল, তাহলে আর উত্তর পাবেন না। মাত্র একজন লোক—তিনিও ভারতীয়—আমাকে বলেছিলেন, 'মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, বিদেশের পণ্যবাহিনীকে লুটতরাজ না করলে গরিব আফগানের চলে না বলে সভ্যদেশের ট্রেড-সাইক্লের মত তাদেরও বিপ্লব আর শান্তির চড়াই-উতরাই নিয়ে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়।'

গ্রামের অবস্থা যেটুকু শুনতে পেলুম তার থেকে মনে হল শান্তির সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে শহরবাসীর মাত্র এইটুকু যোগাযোগ যে, গ্রামের লোক শহরে এসে তাদের ফসল, তরকারি, দুম্বা, ভেড়া বিক্রয় করে সস্তা দরে, আর সামান্য যে দু-একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য না কিনলেই নয়, তাই কেনে আক্রা দরে। সভ্যদেশের শহরবাসীরা বাদবাকির বদলে গ্রামের ইস্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট বানিয়ে দেয়। কাবুলের গ্রামে সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান নেই বললেই হয়। কতকগুলি ছেলে সকালবেলা গাঁয়ের

মসজিদে জড়ো হয়ে গলা ফাটিয়ে আম পারা (কোরানের শেষ অধ্যায়) মুখস্থ করে—এই হল বিদ্যাচর্চা। তাদের তদারক করনেওয়ালা মোল্লাই গাঁয়ের ডাক্তার। অসুখ-বিসুখে তাবিজ-কবচ তিনিই লিখে দেন। ব্যামো শক্ত হলে পানি-পড়ার বন্দোবস্ত, আর মরে গেলে তিনিই তাকে নাইয়ে ধুইয়ে গোর দেন। মোল্লাকে পোষে গাঁয়ের লোক।

খাজনা দিয়ে তার বদলে আফগান গ্রাম যখন কিছুই ফেরত পায় না তখন যে সে বড় অনিচ্ছায় সরকারকে টাকাটা দেয় এ কথাটা সকলেই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

দেশময় অশান্তি হলে আফগান-গাঁয়ের সিকি পয়সার ক্ষতি হয় না—বরঞ্চ তার লাভ। রাইফেল কাঁধে করে জোয়ানরা তখন লুটে বেরোয়—বিধিদত্ত আফগানিস্থানের অশান্তিও বিধিদত্ত, সেই হিড়িকে দু'পয়সা কামাতে আপত্তি কী? ফ্রান্স-জর্মনিতে লড়াই লাগলে যে রকম জর্মনরা মার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, 'নাখ্ পারিজ, নাখ্ পারিজ,' 'প্যারিস চলো, প্যারিস চলো', আফগানরা তেমনি বলে, 'বিআ ব্ কাবুল, ব্ রওম্ ব্ কাবুল', 'কাবুল চলো, কাবুল চলো।'

শহরে বসে আছেন বাদশা। তাঁর প্রধান কর্ম আফগান উপজাতির লুণ্ঠনলিপ্সাকে দমন করে রাখা। তার জন্য সৈন্য দরকার, সৈন্যকে মাইনে দিতে হয়, গোলাগুলির খরচা তো আছেই। শহরের লোক তার খানিকটা যোগায় বটে কিন্তু মোটা টাকাটা আসে গাঁ থেকে।

তাই এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হয়। খাজনা তোলার জন্য সেপাই দরকার, সেপাই পোষার জন্য খাজনার দরকার। এ-চক্র যিনি ভেদ করতে পারেন তিনিই যোগীবর, তিনিই আফগানিস্থানের বাদশা। তিনি মহাপুরুষ সন্দেহ নেই; যে আফগানের দাঁতের গোড়া ভাঙবার জন্য তিনি শিলনোড়া কিনতে চান সেই আফগানের কাছ থেকেই তিনি সে পয়সা আদায় করে নেন।

ঘানি থেকে যে তেল বেরোয়, ঘানি সচল রাখার জন্য সেটুকু ঐ ঘানিতেই ঢেলে দিতে হয়। সামান্য যেটুকু বাঁচে তাই দিয়ে কাবুল শহরের জৌলুশ।

কিন্তু সে এতই কম যে, তা দিয়ে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলা যায় না, শিক্ষাদীক্ষার জন্য ব্যাপক কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায় না। কাজেই কাবুলে শিক্ষিত সম্প্রদায় নেই বললেও চলে।

কিন্তু তাই বলে কাবুল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বর্বর একথা বলা ভুল। কাবুলের মোল্লা সম্প্রদায় ভারতবর্ষ-আফগানিস্থানের যোগাযোগের ভগ্নাবশেষ।

কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়।

কাবুলের দরবারি ভাষা ফার্সী, কাজেই সাধারণ বিদেশির মনে এই বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক যে, কাবুলের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক ইরানের সঙ্গে। কিন্তু ইরান শিয়া মতবাদের অনুরাগী হয়ে পড়ায় সুন্নী আফগানিস্থান শিক্ষা দীক্ষা পাওয়ার জন্য ইরান যাওয়া বন্ধ করে দিল। অথচ দেশ গরিব, আপন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মত সামর্থ্যও তার কোনো কালে ছিল না।

এদিকে পাঠান, বিশেষ করে মোঘল যুগে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দিল্লী লাহোরে ইসলাম ধর্মের সুন্নী শাখার নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। শিক্ষাদানের মাধ্যম ফার্সী; কাজেই দলে দলে কাবুল কান্দাহারের ধর্মজ্ঞানপিপাসু ছাত্র ভারতবর্ষে এসে এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; পূর্ববর্তী যুগে কাবুলীরা বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য তক্ষশিলায় আসত—আফগানিস্থানে যে-সব প্রাচীন প্রাচীর-চিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো অজন্তার ঐতিহ্যে আঁকা, চীন বা ইরানের প্রভাব তাতে নগণ্য।

এই ঐতিহ্য এখনো লোপ পায়নি। কাবুলের উচ্চশিক্ষিত মৌলবি মাত্রই ভারতে শিক্ষিত ও যদিও ছাত্রাবস্থায় ফার্সীর মাধ্যমে এদেশে জ্ঞানচর্চা করে গিয়েছেন, তবু সঙ্গে সঙ্গে দেশজ উর্দু ভাষাও শিখে নিয়ে গিয়েছেন। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের উপর এঁদের প্রভাব অসীম এবং গ্রামের মোল্লাই

আফগান জাতির দৈনন্দিন জীবনের চক্রবর্তী।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত জগৎ ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ। এঁরা নাকি সর্বপ্রকার প্রগতির শত্রু, এঁদের দৃষ্টি নাকি সব সময় অতীতের দিকে ফেরানো এবং সে অতীতও নাকি মানুষের সুখদুঃখে মেশানো, পতনঅভ্যুদয়ে গড়া অতীত নয়, সে অতীত নাকি আকাশকুসুমজাত সত্যযুগের শাস্ত্রীয় অচলায়তনের অন্ধপ্রাচীর-নিরুদ্ধ।

তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের পুস্তক লিখতে বসিনি, কাজেই পৃথিবীর সর্বধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়। কিন্তু আফগান মোল্লার একটি সাফাই না গাইলে অন্যায় করা হবে।

সে-সাফাই তুলনা দিয়ে পেশ করলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কর্ণধার ছিলেন মৌলবি-মোল্লা, শাস্ত্রী-ভটচায। কিন্তু এঁরা দেশের লোককে উত্তেজিত করে ইংরেজের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেননি অথচ আফগান মোল্লার কট্টর দুশমনও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ইংরেজকে তিন-তিনবার আফগানিস্থান থেকে কান ধরে বের করবার জন্য প্রধানত দায়ী আফগান মোল্লা।

আহা, আহা! এর পর আর কী বলা যেতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না। এর পর আর আফগান মোল্লার কোন দোষ ক্ষমা না করে থাকা যায়? কমজোর কলম আফগান মোল্লার তারিফ গাইবার মত ভাষা খুঁজে পায় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছেন এমন লোক আফগানিস্থানে দু'ডজন হবেন কিনা সন্দেহ। দেশে যখন শান্তি থাকে তখন এদের দেখে মনে হয়, এঁরাই বুঝি সমস্ত দেশটা চালাচ্ছেন; অশান্তি দেখা গেলেই এঁদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁদের সঙ্গে আলাপচারি হল; দেখলুম প্যারিসে তিন বৎসর কাটিয়ে এসে এঁরা মার্সেল প্রুস্ত্, আঁদ্রে জিদের বই পড়েননি, বার্লিন-ফের্তা ড্যুরারের নাম শোনেননি, রিলকের কবিতা পড়েননি। মিল্টন বাল্মীকি মিলিয়ে মধুসূদন যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তারই মত গ্যেটে ফিরদৌসী মিলিয়ে কাব্য রচনা করার মত লোক কাবুলে জন্মাতে এখনো ঢের বাকি।

তাহলে দাঁড়ালো এই—বিদেশফের্তাদের জ্ঞান পল্লবগ্রাহী, এবং দেশের নাড়ীর সঙ্গে এদের যোগ নেই। মোল্লাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত, যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের সাতখুন মাফ করলেও প্রশ্ন থেকে যায়, ইংরেজ রুশকে ঠেকিয়ে রাখাই কী আফগানিস্থানের চরম মোক্ষ? দেশের ধনদৌলত বাড়িয়ে শিক্ষাসভ্যতার জন্য যে প্রচেষ্টা, যে আন্দোলন প্রয়োজন মৌলবি সম্প্রদায় কি কোনো দিন তার অনুপ্রেরণা যোগাতে পারবেন? মনে তো হয় না। তবে কি বাধা দেবেন? বলা যায় না।

পৃথিবীর সব জাত বিশ্বাস করে যে, তার মত ভুবনবরেণ্য জাত আর দুটো নেই, গরিব জাতের তার উপর আরেকটা বিশ্বাস যে, তার দেশের মাটি খুঁড়লে সোনা রুপো তেল যা বেরবে তার জোরে সে বাকি দুনিয়া, ইস্তেক চন্দ্রসূর্য কিনে ফেলতে পারবে। নিরপেক্ষ বিচারে জোর করে কিছু বলা শক্ত কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি কিছু না বেরোয় তবে আফগানিস্থানের পক্ষে ধনী হয়ে শিক্ষাদীক্ষা বিস্তার করার অন্য কোনো সামর্থ্য নেই।

সত্যযুগে মহাপুরুষরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, কলিযুগে গণৎকাররা করে। পাকাপাকি ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহস আমার নেই তবু অনুমান করি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে শক্তিশালী হওয়া মাত্র আবার আফগানিস্থান ভারতবর্ষে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কাবুল কান্দাহারের বিদ্যার্থীরা আবার লাহোর দিল্লীতে পড়াশুনা করতে আসবে।

প্রমাণ? প্রমাণ আর কী? প্যারিস-বাসিন্দা ইংরাজি বলে না, ভিয়েনার লোক ফরাসি বলে না, কিন্তু বুডাপেস্টের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনো জর্মন বলেন, জ্ঞানান্বেষণে এখনো ভিয়েনা যান। ভিন্ন রাষ্ট্র নির্মিত হলেই তো আর ঐতিহ্য-সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেলা যায় না। কাবুলের মৌলবি সম্প্রদায় এখনও উর্দু বলেন, ভারতবর্ষ বর্জন করে এঁদের উপায় নেই। ঝগড়া যদি করেন তবে সে

তিনদিনের তরে।

উর্দু যে এদেশে একদিন কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পেলুম হাতেনাতে।

বাইশ

আগেই বলেছি আমার বাসা ছিল কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে— সেখান থেকে আরো মাইল দুই দূরে নতুন শহরের পত্তন হচ্ছিল। সেখানে যাবার চওড়া রাস্তা আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। অনেক পয়সা খরচা করে অতি যত্নে তৈরি রাস্তা। দু'দিকে সারি-বাঁধা সাইপ্রেস গাছ, স্বচ্ছ জলের নালা, পায়ে চলার আলাদা পথ, ঘোড়সোয়ারদের জন্যও পৃথক বন্দোবস্ত।

এ রাস্তা কাবুলীদের বুলভার। বিকেল হতে না হতেই মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, বাইসিকেল, ঘোড়া চড়ে বিস্তর লোক এ রাস্তা ধরে নতুন শহরে হাওয়া খেতে যায়। হেঁটে বেড়ানো কাবুলীরা পছন্দ করে না। প্রথম বিদেশি ডাক্তার যখন এক কাবুলী রোগীকে হজমের জন্য বেড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন তখন কাবুলী নাকি প্রশ্ন করেছিল যে, পায়ের পেশীকে হয়রান করে পেটের অন্ন হজম হবে কী করে?

বিকেলবেলা কাবুল না গেলে আমি সাইপ্রেস সারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে পায়চারি করতুম। এসব জায়গা সন্ধ্যার পর নিরাপদ নয় বলে রাস্তায় লোক চলাচল তখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।

এক সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরছি তখন একখানা দামি মোটর ঠিক আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। স্টিয়ারিঙে এক বিরাট বপু কাবুলী ভদ্রলোক, তাঁর পাশে মেমসায়েবের পোষাকে এক ভদ্রমহিলা— হ্যাটের সামনে ঝুলানো পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে যেটুকু দেখা গেল তার থেকে অনুমান করলুম, ভদ্রমহিলা সাধারণ সুন্দরী নন।

নমস্কার অভিবাদন কিছু না, ভদ্রলোক সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফার্সী বলতে পারেন?'

আমি বললুম, 'অল্প স্বল্প।'

'দেশ কোথায়?'

'হিন্দুস্থান।'

তখন ফার্সি ছেড়ে ভদ্রলোক ভুল উর্দুতে কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রায়ই আপনাকে অবেলায় এখানে দেখতে পাই। আপনি বিদেশি বলে হয়ত জানেন না যে, এ জায়গায় সন্ধ্যার পর চলাফেরা করতে বিপদ আছে।'

আমি বললুম, 'আমার বাসা কাছেই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী করে হয়? এখানে তো অজ পাড়াগাঁ—চাষাভুষোরা থাকে।'

আমি বললুম, 'বাদশা এখানে কৃষিবিভাগ খুলেছেন—আমরা জনতিনেক বিদেশি এক সঙ্গে এখানেই থাকি।'

আমার কথা ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ফার্সীতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি হাঁ-না কিছুই বলছিলেন না।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাবুল শহরে দোস্ত-আশনা নেই? একা একা বেড়ানোতে দিল হয়রান হয় না? আমার বিবি বলছিলেন, 'বাচ্চা গম্ মীখুরদ— ছেলেটার মনে সুখ নেই।' তাইতে আপনার সঙ্গে আলাপ করলুম।' বুঝলুম ভদ্রমহিলার সৌন্দর্য মাতৃত্বের সৌন্দর্য। নিচু হয়ে আদাবতসলিমাত জানালুম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেনিস খেলতে পারেন?'

'হাঁ।'

'তবে কাবুলে এলেই আমার সঙ্গে টেনিস খেলে যাবেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক ধন্যবাদ—কিন্তু আপনার কোর্ট কোথায়, আপনার পরিচয়ও তো পেলুম না।'

ভদ্রলোক প্রথমে একটু অবাক হলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি? ওঃ, আমি? আমি মুইন-উস্-সুলতানে। আমার টেনিস-কোর্ট ফরেন অফিসের কাছে। কাল আসবেন। বলে আমাকে ভালো করে ধন্যবাদ দেবার ফুরসত না দিয়েই মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, মোটরের প্রায় বিশ গজ পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ভৃত্য আবদুর রহমান এ্যারোপ্লেনের প্রপেলারের বেগে দু'হাত নেড়ে আমাকে কী বোঝাবার চেষ্টা করছে। মোটর চলে যেতেই এঞ্জিনের মত ছুটে এসে বলল, 'মুইন-উস্-সুলতানে, মুইন-উস্-সুলতানে!'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'লোকটি কে বটেন?'

আবদুর রহমান উত্তেজনায় ফেটে চৌচির হয় আর কী। আমি যতই জিজ্ঞাসা করি মুইন-উস্-সুলতানে কে, সে ততই মন্ত্রোচ্চারণের মত শুধু বলে, 'মুইন-উস্-সুলতানে, মুইন-উস্-সুলতানে।' শেষটায় নৈরাশ্য, অনুযোগ, ভর্ৎসনা মিশিয়ে বলল, 'চেনেন না, বরাদরে-আলা-হজরত, বাদশার ভাই—বড় ভাই। আপনি করেছেন কী? রাজবাড়ির সক্কলের হাতে চুমো খেতে হয়।'

আমি বললুম, 'রাজবাড়িতে লোক সবশুদ্ধ ক'জন না জেনে তো আর চুমো খেতে আরম্ভ কবতে পারিনে। সক্কলের পোষাবার আগে আমার ঠোঁট ক্ষয়ে যাবে না তো?'

আবদুর রহমান শুধু বলে, 'ইয়া আল্লা, ইয়া রসুল, করেছেন কী, করেছেন কী?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা উনি যদি রাজার বড় ভাই-ই হবেন তবে উনি রাজা হলেন না কেন?'

আবদুর রহমান প্রথমে মুখ বন্ধ করে তার উপর হাত রাখল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমি গরিব তার কী জানি; কিন্তু এসব কথা শুধোতে নেই।'

সে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আবদুর রহমান যখন ঘরের এক কোণে বাদামের খোসা ছাড়াতে বসল তখন তার মুখে ঐ এক মুইন-উস্-সুলতানের কথা ছাড়া অন্য কিছু নেই। দু'তিনবার ধমক দিয়ে হার মানলুম। বুঝলুম, সরল আবদুর রহমান মনে করেছে, আফগানিস্থান যখন কাকামামাশালার দেশ, অর্থাৎ বড়লোকের নেকনজর পেলে সব কিছু হাসিল হয়ে যায়, তখন আমি রাতারাতি উজিরনাজির কেউকেটা, কিছু-না-কিছু একটা হয়ে যাবই যাব।

ততক্ষণে অভিধান খুলে দেখে নিয়েছি মুইন-উস্-সুলতানে সমাসের অর্থ 'যুবরাজ'।

যুবরাজ রাজা হলেন না, হলেন ছোট ভাই। সমস্যাটার সমাধান করতে হয়।

তেইশ

মুইন-উস্-সুলতানে বা যুবরাজ রাজা না হয়ে ছোট ছেলে কেন রাজা হলেন সে-সমস্যার সমাধান করতে হলে খানিকটা পিছিয়ে এ-শতকের গোড়ায় পৌঁছতে হয়।

বাঙালী পাঠক এখানে একটু বিপদগ্রস্ত হবেন। আমি জানি, বাঙালী—তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন—আরবী ফার্সী মুসলমানি নাম মনে রাখতে বা বানান করতে অল্পবিস্তর কাতর হয়ে পড়েন। একথা জানি বলেই এতক্ষণ যতদূর সম্ভব কম নাম নিয়েই নাড়াচাড়া করেছি—বিশেষত আনাতোল ফ্রাঁসের মত গুণী যখন বলেছেন, 'পাঠকের কাছ থেকে বড্ড বেশি মনোযোগ আশা করো না; আর যদি মনস্কামনা এই হয় যে, তোমার লেখা শত শত বৎসর পেরিয়ে পরবর্তী যুগে পৌঁছক তা হলে হাল্কা হয়ে ভ্রমণ করো।' আমার সে-বাসনা নেই, কারণ ভাষা এবং শৈলী বাবদে আমার অক্ষমতা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন। কাজেই যখন ক্ষমতা নেই, বাসনাও নেই তখন পাঠকের নিকট ঈষৎ মনোযোগ প্রত্যাশা করতে পারি। মৌসুমী ফুলই মনোযোগ চায় বেশি; দু'দিনের অতিথিকে তোয়াজ করতে মহা কঞ্জুসও রাজি হয়।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন আফগানিস্থানের কর্তা বা আমির ছিলেন হবীব উল্লা। তাঁর ভাই নসর উল্লা মোল্লাদের এমনি খাসপেয়ারা ছিলেন যে, বড় ছেলে মুইন-উস্-সুলতানে তাঁর মরার পর আমির হবেন এ-ঘোষণা হবীব উল্লা বুকে হিম্মৎ বেঁধে করতে পারেননি। বরঞ্চ দুই ভায়ে এই নিষ্পত্তিই হয়েছিল যে, হবীব উল্লা মরার পর নসর উল্লা আমির হবেন, আর তিনি মরে গেলে আমির হবেন মুইন-উস্-সুলতানে। এই নিষ্পত্তি পাকা-পোক্ত করার মতলবে হবীব উল্লা, নসর উল্লা দুই ভায়ে মীমাংসা করলেন
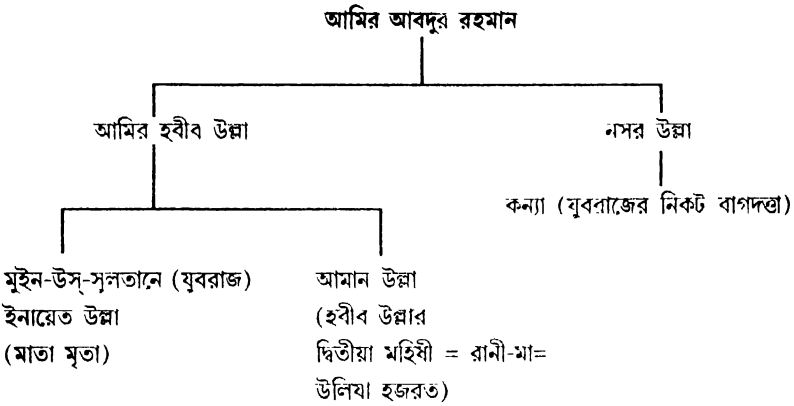
যে, মুইন-উস্-সুলতানে নসর উল্লার মেয়েকে বিয়ে করবেন। হবীব উল্লা মনে মনে বিচার করলেন, আর যাই হোক, নসর উল্লা জামাইকে খুন করে 'দামাদ কুশ' (জামাতৃহন্তা) আখ্যায় কলঙ্কিত হতে চাইবেন না। ঐতিহাসিকদের স্মরণ থাকতে পারে যোধপুরের রাজা অজিত সিং যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে জামাই দিল্লীর বাদশাহ ফররুখ সিয়ারকে নিহত করেন তখন দিল্লীর ছেলে-বুড়োর 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ' চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষটায় তিনি দিল্লী ছাড়তে বাধ্য হন। রাস্তার ডেঁপো ছোঁড়ারা পর্যন্ত নির্ভয়ে অজিত সিং-এর পাল্কির দু'পাশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলত আর সেপাই-বরকন্দাজের তম্বি-তম্বাকে বিলকুল পরোয়া না করে তারস্বরে একতানে 'দামাদ-কুশ' দামাদ-কুশ', বলে অজিত সিংকে ক্ষেপিয়ে তুলত।

হবীব উল্লা, নসর উল্লা, মুইন-উস্-সুলতানে তিনজনই এই চুক্তিতে অল্পবিস্তর সন্তুষ্ট হলেন। একদম নারাজ হলেন মাতৃহীন মুইন-উস্-সুলতানের বিমাতা। ইনি আমান উল্লার মা, হবীব উল্লার দ্বিতীয়া মহিষী। আফগানিস্থানের লোক এঁকে রানী-মা বা উলিয়া হজরত নামে চিনত। এঁর দাপটে আমির হবীব উল্লার মত খাণ্ডারও কুরবানির বকরি অর্থাৎ বলির পাঠার মত কাঁপতেন। একবার গোসা করে রানী-মা যখন নদীর ওপারে গিয়ে তাঁবু খাটান তখন হবীব উল্লা কোনো কৌশলে তাঁর কিনারা না লাগাতে পেরে শেষটায় এপারে বসে পাগলের মত সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা মেখে তাঁর সংগ্-দিল্ বা পাষাণ হৃদয় গলাতে সমর্থ হয়েছিলেন। রানী-মা স্থির করলেন এই সংসারকে যখন ওমর খৈয়াম দাবাখেলার ছকের সঙ্গে তুলনা করছেন তখন নসর উল্লা এবং মুইন-উস্-সুলতানের মত দুই জব্বর ঘুঁটিকে ঘায়েল করা আমান উল্লার মত নগণ্য বড়ের পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। তাঁর পক্ষেই বা রাজা হওয়া অসম্ভব হবে কেন?

এমন সময়ে কাবুলের সেরা খানদানী বংশের মুহম্মদ তর্জী সিরিয়া নির্বাসন থেকে দেশে ফিরলেন। সঙ্গে পরির মতো তিন কন্যা, কাওকাব, সুরাইয়া আর বিবি খুর্দ। এঁরা দেশবিদেশ দেখেছেন, লেখাপড়া জানেন, রুজ-পাউডার ব্যবহারে ওয়াকিফহাল; এঁদের উদয়ে কাবুল কুমারীদের চেহারা অত্যন্ত ম্লান, বেজৌলুশ, অমার্জিত বা অনকল্চরড্ (আজ জঙ্গল বর আমদেহ—যেন জংলী) মনে হতে লাগল।

হবীব উল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমান উল্লার মা—যদিও আসলে দ্বিতীয়া মহিষী কিন্তু মুইন-উস্-সুলতানের মাতার মৃত্যুতে প্রধানা মহিষী হয়েছেন—এক বিরাট ভোজের বন্দোবস্ত করলেন। অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে পই পই করে বুঝিয়ে দিলেন, যে করেই হোক মুইন-উস্-সুলতানেকে তর্জির বড় মেয়ে কাওকাবের দিকে আকৃষ্ট করাতেই হবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনাচে কানাচে দু'একটা কামরা বিশেষ করে খালি রাখা হল। সেখানে কেউ যেন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত না হয়।

খানাপিনা চলল, গানবাজনায় রাজবাড়ি সরগরম। রানী-মা নিজে মুইন-উস্-সুলতানেকে কাওকাবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আর কাওকাবকে ফিস ফিস করে কানে কানে বললেন, 'ইনিই যুবরাজ, আফগানিস্থানের তখ্‌ৎ একদিন এঁরই হবে।' কাওকাব বুদ্ধিমতী মেয়ে, ক'সের গমে ক'সের ময়দা হয় জানতেন, আর না জানলেই বা কী, শঙ্করাচার্য তরুণতরুণীর প্রধান বৃত্তি সম্বন্ধে যে মোক্ষম তত্ত্ব বলেছেন সেটা রাজপ্রাসাদেও খাটে।

প্ল্যানটা ঠিক উতরে গেল। বিশাল রাজপ্রাসাদে ঘুরতে ঘুরতে মুইন-উস্-সুলতানে কাওকাবের সঙ্গে পুরীর এক নিভৃত কক্ষে বিশ্রম্ভালাপে মশগুল হলেন। মুইন ভাবলেন, খুশ-এখতেয়ারে নিভৃত কক্ষে ঢুকেছেন (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে ফ্রীডম অব্ উইল), রানী-মা জানতেন, শিকার জালে পড়েছে (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে প্ল্যানড় ডেসটিনি)।

প্ল্যানমাফিক রানী-মা হঠাৎ যেন বেখেয়ালে কামরায় ঢুকে পড়লেন। তরুণতরুণী একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়ালেন। রানী-মা সোহাগ মেখে অমিয়া ছেনে সতীনপোকেবললেন, 'বাচ্চা তোমার মা নেই, আমিই তোমার মা। তোমার সুখদুঃখের কথা আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে? তোমার বিয়ের ভার তো আমার কাঁধেই। কাওকাবকে যদি তোমাব পছন্দ হয়ে থাকে তবে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? তর্জির মেয়ের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়ে তো কাবুলে আর নেই। তোমার দিল কী বলে?'

দিল আর কী বলবে? মুইন তখন ফাটা বাঁশের মাঝখানে।

দিল যা বলে বলুক। মুখে কী বলেছিলেন সে সম্বন্ধে কাবুল চারণরা পঞ্চমুখ। কেউ বলেন, নীরবতা দিয়ে সম্মতি দেখিয়েছিলেন; কেউ বলেন মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ জানতেন, নসর উল্লার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে; কেউ বলেন, মিনমিন করে সম্মতি জানিয়েছিলেন, কারণ ঠিক তার এক লহমা আগে ভালোমন্দ না ভেবে কাওকাবকে প্রেম-নিবেদন করে বসেছিলেন—হয়ত ভেবেছিলেন, প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া—এখন এড়াবেন কী করে? কেউ বলেন, শুধু হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করেছিলেন, তার থেকে হস্ত-নীস্ত (হাঁ-না—যে কথা থেকে বাঙলা 'হেস্তনেস্ত' বেরিয়েছে) কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না; কেউ বলেন, তিনি রামগঙ্গা ভালো করে কিছু প্রকাশ করার আগেই রানী-মা কামরা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ কাবুল চারণদের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বলে।

মোদ্দা কথা এই, সে অবস্থায় আমির হোক, ফকির হোক, ঘুঘু হোক, কবুতর হোক, আর পাঁচজন গুরুজনের সামনে পড়লে যা করে থাকে বা বলে থাকে মুইন-উস্-সুলতানে তাই করেছিলেন।

কিন্তু কী করে বলেছিলেন সে কথা জানার যত না দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশি জানা দরকার রানী-মা মজলিসে ফিরে গিয়ে সে-বলা বা না-বলার কী অর্থ প্রকাশ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সট্-বুক কী বলে না বলে সেটা অবান্তর, জীবনে কাজে লাগে বাজারের গাইড-বুক।

রানী-মা পর্দার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও যখন তামাম আফগানিস্থান তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেত তখন মজলিসের হর্ষোল্লাস যে তাঁর গলার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাতে আর কী সন্দেহ? রানী-মা বললেন, 'আজ বড় আনন্দের দিন। আমার চোখের জ্যোতি (নূর-ই-চশম্) ইনায়েত উল্লা খান, মুইন-উস্-সুলতানে তর্জিকন্যা কাওকাবকে বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেছেন। খানা-মজলিস দুটোর সময় ভাঙবার কথা ছিল, সে বন্দোবস্ত বাতিল। ফজরের নামাজ (সূর্যোদয়) পর্যন্ত আজকের উৎসব চলবে। আজ

রাত্রেই আমি কন্যাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি।'

মজলিসের ঝাড়বাতি দ্বিগুণ আভায় জ্বলে উঠল। চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস, হর্ষধ্বনি। দাসদাসী ছুটলো বিয়ের তত্ত্বের তত্ত্বতালাস করতে। সব কিছু সেই দুপুর রাতে রাজবাড়িতেই পাওয়া গেলে আশ্চর্য হওয়ার সাহস কার?

তর্জি হাতে স্বর্গ পেলেন। কাওকাব হৃদয়ে স্বর্গ পেয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা হবীব উল্লার কাছে 'সুসংবাদ' জানিয়ে দূত পাঠালেন। মা ও রাজমহিষীরূপে তিনি মুইন-উস্-সুলতানের হৃদয়ের গতি কোন দিকে জানতে পেরে তর্জি-কন্যা কাওকাবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির করেছেন। 'প্রগতিশীল' আফগানিস্থানের ভাবী রাজমহিষী সুশিক্ষিতা হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন কুমারী নেই যিনি কাওকাবের কাছে দাঁড়াতে পারেন। প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান খুদাতালার মেহেরবানিতে সুসম্পন্ন হয়েছে। মহারাজ অতিসত্বর রাজধানীতে ফিরে এসে 'আক্‌দ্-রসুমাতের' (আইনত পূর্ণ বিবাহ) দিন ঠিক করে পৌরজনের হর্ষবর্ধন করুন।

হবীব উল্লা তো রেগে টং। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হারালেন না। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, তিনি বিলক্ষণ টের পেলেন যে মূর্খ মুইন-উস্-সুলতানে কাওকাবের প্রেমে পড়ে নসর উল্লার মেয়েকে হারায়নি, হারাতে বসেছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবীব উল্লা যদিও সাধারণত পঞ্চ ম'কার নিয়ে মত্ত থাকতেন তবুও তাঁর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, সমস্ত ষড়যন্ত্রের পিছনে রয়েছেন মহিষী। সৎমার এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না—

সতীন মা'র কথাগুলি
মধুরসের বাণী
তলা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন
উপর থেকে পানি।

পানি ঢালা দেখেই হবীব উল্লা বুঝতে পারলেন, গুঁড়িটি নিশ্চয়ই কাটা হয়েছে।

রাগ সামলে নিয়ে হবীব উল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন—

'খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে মহিষী শুভবুদ্ধি প্রণোদিতা হয়ে এই বিয়ে স্থির করেছেন। তর্জিকন্যা কাওকাব যে সব দিক দিয়ে মুইন-উস্-সুলতানের উপযুক্ত তাতে আর কী সন্দেহ? কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, তর্জির মেজো মেয়ে সুরাইয়াও তো সুশিক্ষিতা সুরূপা সুমার্জিতা। দ্বিতীয় পুত্র আমান উল্লাই বা খাস কাবুলী জংলী মেয়ে বিয়ে করবেন কেন? তাই তিনি মহিষীর মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুরাইয়ার সঙ্গে আমান উল্লার বিয়ে স্থির করে এই চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তর্জির নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন। সত্বর রাজধানীতে ফিরে এসে তিনি স্বয়ং'—ইত্যাদি।

হবীব উল্লা বুঝতে পেরেছিলেন, রানী-মার মতলব মুইন-উস্-সুলতানের স্কন্ধে কাওকাবকে চাপিয়ে দিয়ে, আপন ছেলে আমান উল্লার সঙ্গে নসর উল্লার মেয়ের বিয়ে দেবার। তাহলে নসর উল্লার মরার পর আমান উল্লার আমির হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। হবীব উল্লা সে পথ বন্ধ করার জন্য আমান উল্লার স্কন্ধে সুরাইয়াকে চাপিয়ে দিলেন। যে রানী-মা কাওকাবের বিদেশি শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি সুরাইয়াকে ঠেকিয়ে রাখবেন কোন লজ্জায়? বিশেষ করে যখন চিহ্‌ল্‌সতূন থেকে বাগ্-ই-বালা পর্যন্ত সুবে কাবুল জানে, সুরাইয়া কাওকাবের চেয়ে দেখতে শুনতে পড়াশোনায় অনেক ভালো।

রানী-মার মস্তকে বজ্রাঘাত। বড়ের কিস্তিতে রাজাকে মাত করতে গিয়ে তিনি যে প্রায় চাল-মাতের কাছাকাছি। হবীব উল্লাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত দিলেন, 'নসর উল্লার মেয়েকে তুই পেলিনি, আমিও পেলুম না। তবু মন্দের ভালো, নসর উল্লার কাছে এখন মুইন-উস্-সুলতানে আর আমান উল্লা দু'জনই বরাবর। মুইন-উস্-সুলতানের পাশা আর নসর-কন্যার শীসায় ভারী হবে না তো—সেই মন্দের ভালো।'

দাবা খেলায় ইংরিজিতে যাকে বলে 'ওয়েটিঙ মুভ' রানী-মা সেই পন্থা অবলম্বন করলেন।

চব্বিশ

এর পরের অধ্যায় আরম্ভ হয় ভারতবর্ষের রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে নিয়ে।

১৯১৫ সালের মাঝামাঝি জর্মন পররাষ্ট্র বিভাগ রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের উপদেশ মত স্থির করলেন যে, কোনো গতিকে যদি আমির হবীব উল্লাকে দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করানো যায় তাহলে ইংরেজের এক ঠ্যাং খোঁড়া করার মতই হবে। ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা পাবার লোভে বিদ্রোহ করুক আর নাই করুক, ইংরেজকে অন্তত একটা পুরো বাহিনী পাঞ্জাবে রাখতে হবে—তাহলে তুর্করা মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজকে কাবু করে আনতে পারবে। ফলে যদি সুয়েজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইংরেজের দু'পা-ই খোঁড়া হয়ে যাবে।

মহেন্দ্রপ্রতাপ অবশ্য আশা করেছিলেন যে, আর কিছু হোক না হোক ভারতবর্ষ যদি ফাঁকতালে স্বাধীনতা পেয়ে যায় তা হলেই যথেষ্ট।

কাইজার রাজাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, স্বর্ণ-ঈগল মেডেল পরিয়ে একদল জর্মন কূটনৈতিকদের সঙ্গে আফগানিস্থান রওয়ানা করিয়ে দিলেন। পথে রাজা তুর্কির সুলতানের কাছ থেকেও অনেক আদর-আপ্যায়ন পেলেন।

কিন্তু পূর্ব-ইরান ও পশ্চিম-আফগানিস্থানে রাজা ও জর্মনদলকে নানা বিপদ-আপদ, ফাঁড়া-গর্দিশ কাটিয়ে এগোতে হল। ইংরেজ ও রুশ উভয়েই রাজার দৌত্যের খবর পেয়ে উত্তর দক্ষিণ দু'দিক থেকে হানা দেয়। অসম্ভব দুঃখকষ্ট সহ্য করে, বেশির ভাগ জিনিসপত্র পথে ফেলে দিয়ে তাঁরা ১৯১৫ সালের শীতের শুরুতে কাবুল পৌঁছান।

আমির হবীব উল্লা বাদশাহি কায়দায় রাজাকে অভ্যর্থনা করলেন—তামাম কাবুল শহর রাস্তার দু'পাশে ভিড় লাগিয়ে রাজাকে তাদের আনন্দ-অভিবাদন জানালো। বাবুরবাদশাহের কবরের কাছে রাজাকে হবীব উল্লার এক খাস প্রাসাদে রাখা হল।

কাবুলের লোক সহজে কাউকে অভিনন্দন করে না। রাজার জন্য তারা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তার প্রথম কারণ, কাবুলের জনসাধারণ ইংরেজের নষ্টামি ও হবীব উল্লার ইংরেজ-প্রীতিতে বিরক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; নব্য-তুর্কি নব্য-মিশরের জাতীয়তাবাদের ক্বচিৎজাগরিত বিহঙ্গকাকলী কাবুলের গুলিস্তান-বোস্তানকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় কারণ, রাজা ভারতবর্ষের লোক, জর্মনীর শেষ মতলব কী সে সম্বন্ধে কাবুলীদের মনে নানা সন্দেহ থাকলেও ভারতবর্ষের নিঃস্বার্থপরতা সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। এ অনুমান কাইজার বার্লিনে বসে করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতীয় মহেন্দ্রকে জর্মন কূটনৈতিকদের মাঝখানে ইন্দ্রের আসনে বসিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

ইংরেজ অবশ্য হবীব উল্লাকে তম্বি করে হুকুম দিল, পত্রপাঠ যেন রাজা আর তার দলকে আফগানিস্থান থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু ধূর্ত হবীব উল্লা ইংরেজকে নানা রকম টালবাহানা দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখলেন। একথাও অবশ্য তাঁর অজানা ছিল না যে, ইংরেজের তখন দু'হাত ভর্তি, আফগানিস্থান আক্রমণ করবার মত সৈন্যবলও তার কোমরে নেই।

কিন্তু হবীব উল্লা রাজার প্রস্তাবে রাজি হলেন না। কেন হলেন না এবং না হয়ে ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক কারণ, অনেক আলোচনা শুনেছি। সে-সব কারণের ক'টা খাঁটি, ক'টা ঝুটা বলা অসম্ভব কিন্তু এ-বিষয়ে দেখলুম কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, হবীব উল্লা তখন ভারত আক্রমণ করলে সমস্ত আফগানিস্থান তাতে সাড়া দিত। অর্থাৎ আমির জনমত উপেক্ষা করলেন, জর্মনি, তুর্কি, ভারতবর্ষকেও নিরাশ করলেন।

জর্মনরা এক বৎসর চেষ্টা করে দেশে ফিরে গেল কিন্তু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তখনকার মত আশা ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যতের জন্য জমি আবাদ করতে কসুর করলেন না। রাজা জানতেন, হবীব উল্লার

মৃত্যুর পর আমির হবেন নসর উল্লা, নয় মুইন-উস্-সুলতানে। কিন্তু দুটো টাকাই যে মেকি রাজা দু'চারবার বাজিয়ে বেশ বুঝে নিয়েছিলেন। আমান উল্লার কথা কেউ তখন হিসেবে নিত না কিন্তু রাজা যে তাকে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার পরখ করে নিয়েছিলেন সে কথা কাবুলের সকলেই জানে। কিন্তু তাকে কী কানমন্ত্র দিয়েছিলেন সে কথা কেউ জানে না; রাজাও মুখ ফুটে কিছু বলেন নি।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাজা কাবুল ছাড়েন। তারপর যুদ্ধ শেষ হল।

শেষ আশায় নিরাশ হয়ে কাবুলের প্রগতিপন্থীরা নির্জীব হয়ে পড়লেন। পর্দার আড়াল থেকে তখন এক অদৃশ্য হাত আফগানিস্থানের ঘুঁটি চালাতে লাগলো। সে হাত আমান উল্লার মাতা রানী-মা উলিয়া হজরতের।

বহু বৎসর ধরে রানী-মা প্রহর গুনছিলেন এই সুযোগের প্রত্যাশায়। তিনি জানতেন প্রগতিপন্থীরা হবীব উল্লা, নসর উল্লা, মুইন-উস্-সুলতানে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত আমান উল্লার কথা হিসেবেই আনবেন না। পর্দার আড়াল থেকেই রানী-মা প্রগতিপন্থী যুবকদের বুঝিয়ে দিলেন যে, হবীব উল্লা কাবুলের বুকের উপর জগদ্দল পাথর, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও যখন সে পাথরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেননি তখন তাঁরা বসে আছেন কীসের আশায়? নসর উল্লা, মুইন-উস্-সুলতানে দু'জনই ভাবেন সিংহাসন তাঁদের হক্কের মাল—সে মালের জন্য তাঁরা কোনো দাম দিতে নারাজ।

কিন্তু আমান উল্লা দাম দিতে তৈরী। সে দাম কী? বুকের খুন দিয়ে তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়ে দেশকে স্বাধীন করতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমান উল্লাকে আমির করা যায় কী প্রকারে? রানী-মা বোরকার ভিতর থেকে তারও নীলছাপ বের করলেন। আসছে শীতে হবীব উল্লা যখন নসর উল্লা আর মুইন-উস্-সুলতানেকে সঙ্গে নিয়ে জলালাবাদ যাবেন তখন আমান উল্লা কাবুলের গভর্নর হবেন। তখন যদি হবীব উল্লা জলালাবাদে মারা যান তবে কাবুলের অস্ত্রশালা আর কোষাধ্যক্ষের জিম্মাদার গভর্নর আমান উল্লা তার ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পারবেন। রাজা হতে হলে এই দুটো জিনিসই যথেষ্ট।

কিন্তু মানুষ মরে ভগবানের ইচ্ছায়। নীলছাপের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে যে হবীব উল্লা ঠিক তখনই মরবেন তার কী স্থিরতা? অসহিষ্ণু রানী-মা বুঝিয়ে দিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছা মানুষের হাত দিয়েই সফল হয়—বিশেষত যদি তার হাতে তখন একটি নগণ্য পিস্তল মাত্র থাকে।

স্বামী হত্যা? এ্যা! হ্যাঁ। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা হচ্ছে না—যেখানে সমস্ত দেশের আশাভরসা, ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গল, ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সেখানে কে স্বামী, স্ত্রীই বা কে?

শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'কা তব কান্তা?' কিন্তু ঠিক তার পরেই 'সংসার অতীব বিচিত্র' কেন বলেছেন সে তত্ত্বটা এতদিন পর আমার কাছে খোলসা হল।

অর্বাচীনরা তবু শুধালো, 'কিন্তু আমির হবীব উল্লার সৈন্যদল আর জলালাবাদ অঞ্চলের লোকজন নসর উল্লা বা মুইন-উস্-সুলতানের পক্ষ নেবেন না?'

রাগে দুঃখে রানী-মার নাকি কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। উষ্মা চেপে শেষটায় বলেছিলেন, 'ওরে মূর্খের দল, জলালাবাদে যে-ই রাজা হোক না কেন, আমরা রটাব না যে, সিংহাসনের লোভে অসহিষ্ণু হয়ে সেই গৃধ্নুই নিরীহ হবীব উল্লাকে খুন করেছে? মূর্খেরা এতক্ষণে বুঝল, এস্থলে 'রানীর কী মত' নয়, এখানে 'রানীর মতই সকল মতের রানী।'

এসব আমার শোনা কথা—কতটা ঠিক কতটা ভুল হলপ করে বলতে পারব না; তবে এরকমেরই কিছু একটা যে হয়েছিল সে বিষয়ে কাবুল চারণদের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথামালার গল্প ভুল। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য লোকও জুটল।

আপন অলসতাই হবীব উল্লার মৃত্যুর আরেক কারণ। জলালাবাদে একদিন সন্ধ্যাবেলা শিকার

থেকে ফিরে আসতেই তাঁর এক গুপ্তচর **নিবেদন করল** যে, গোপনে হুজুরেব সঙ্গে সে অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চায়। সে নাকি কী করে শেষ মুহূর্তে এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গিয়েছিল। 'কাল হবে, কাল হবে' বলে নাকি হবীব উল্লা প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে গেলেন। সকলের সামনে গুপ্তচর কিছু খুলে বলতে পারল না—আমিরও শুধু বললেন, 'কাল হবে, কাল হবে।'

সে কাল আর কখনো হয় নি। সে-রাত্রেই গুপ্তঘাতকের হাতে হবীব উল্লা প্রাণ দেন।

সকালবেলা জলালাবাদে যে কী তুমুল কাণ্ড হয়েছিল তার বর্ণনার আশা করা অন্যায়। কেউ শুধায়, 'আমিরকে মারল কে?' কেউ শুধায়, 'রাজা হবেন কে?' একদল বলল, 'শহীদ আমিরের ইচ্ছা ছিল নসর উল্লা রাজা হবেন' আরেকদল বলল, 'মৃত আমিরের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই; রাজা হবেন বড় ছেলে, যুবরাজ মুইন-উস্-সুলতানে ইনায়েত উল্লা। তখ্‌তের হক তাঁরই।'

বেশি ভাগ গিয়েছিল ইনায়েত উল্লার কাছে। তিনি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। লোকজন যতই জিজ্ঞেস করে রাজা হবেন কে, তিনি হয় উত্তর দেন না, না হয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেন, 'ব কাকায়েম বোরো' অর্থাৎ 'খুড়োর কাছে যাও, আমি কী জানি।' কেন সিংহাসনের লোভ করেননি বলা শক্ত; হয়ত পিতৃশোকে অত্যধিক কাতর হয়ে পড়েছিলেন, হয়ত পিতার ইচ্ছার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন, হয়ত আন্দাজ করেছিলেন যে, যারা তাঁর পিতাকে খুন করেছে তাদের লোকই শেষ পর্যন্ত তখ্‌ৎ দখল করবে। তিনি যদি সে-পথে কাঁটা হয়ে মাথা খাড়া করেন তবে সে মাথা বেশিদিন ঘাড়ে থাকবে না। অত্যন্ত কাঁচা কাঁচালঙ্কাও পাঁঠার বলি দেখে খুশি হয় না। জানে এবার তাকে পেষার লগ্ন আসন্ন। নসর উল্লা আমির হলেন।

এদিকে রানী-মা কাবুলে বসে তড়িৎ গতিতে কাবুল কান্দাহার জলালাবাদ হিরাতে খবর রটালেন রাজ্যগৃধ্নু অসহিষ্ণু নসর উল্লা ভ্রাতা হবীব উল্লাকে খুন করেছেন। তাঁর আমির হওয়ার এমনিতেই কোনো হক ছিল না—এখন তো আর কোনো কথাই উঠতে পারে না। হক ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র, যুবরাজ মুইন-উস্-সুলতানের। তিনি যখন স্বেচ্ছায়, খুশ-এখতেয়ারে নসর উল্লার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থাৎ সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করেছেন, তখন হক বর্তালো আমান উল্লাব উপর।

অকাট্য যুক্তি। তবু কাবুল চীৎকার করলো, 'জিন্দাবাদ আমান উল্লা খান'—ক্ষীণকণ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা আমান উল্লার তখ্‌ৎ লাভে খুশি হয়ে সেপাইদের বিস্তর বখশিশ দিলেন; নতুন বাদশা আমান উল্লা সেপাইদের তনখা অত্যন্ত কম বলে নিতান্ত কর্তব্য পালনার্থে সে তনখা ডবল করে দিলেন। উভয় টাকাই রাজকোষ থেকে বেরলো। কাবুল হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'জিন্দাবাদ আমান উল্লা খান।'

ভলতেয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মন্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মারা যায় কিনা। ভলতেয়ার বলেছিলেন, 'যায়, কিন্তু গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে সেঁকো বিষ খাইয়ে দিলে আর কোনো সন্দেহই থাকবে না।'

আফগান সেপাইয়ের কাছে যুক্তিতর্ক মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায়, টাকাটাই সেঁকো।

আমান উল্লা কাবুল বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন। সজল নয়নে, বলদৃপ্ত কণ্ঠে পিতৃঘাতকের রক্তপাত করবেন বলে শপথ গ্রহণ করলেন, 'যে পাষণ্ড আমার জান-দিলের পিতাকে হত্যা করেছে তার রক্ত না দেখা পর্যন্ত আমার কাছে জল পর্যন্ত শরাবের মত হারাম, তার মাংস টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত সব মাংস আমার কাছে শূকরের মাংসের মত হারাম।'

আমান উল্লার শত্রুপক্ষ বলে আমান উল্লা থিয়েটারে ঢুকলে নাম করতে পারতেন; মিত্রপক্ষ বলে, সমস্ত ষড়যন্ত্রটা রানী-মা সর্দারদের সঙ্গে তৈরি করেছিলেন—আমান উল্লাকে বাইরে রেখে। হাজার হোক 'পিদর-কুশ' বা পিতৃহন্তার হস্ত চুম্বন করতে অনেক লোকই ঘৃণা বোধ করতে পারে। বিশেষত রানী-মা যখন একাই একলক্ষ তখন তরুণ আমান উল্লাকে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নামিয়ে লাভ কী?

আফগানিস্থানে স্ত্রীলোকের আমির হওয়ার রেওয়াজ থাকলে তাঁকে হয়ত সারা জীবনই যবনিকা-অন্তরালে থাকতে হত।

আমান উল্লার সৈন্যদল জলালাবাদ পৌঁছল। নসর উল্লা, ইনায়েত উল্লা দু'জনই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন। নসর উল্লা মোল্লাদের কুতুব-মিনার স্বরূপ ছিলেন; সে মিনার থেকে যাজক সম্প্রদায়ের গম্ভীর নিনাদ বহির্গত হয়ে কেন যে সেপাই-সান্ত্রী জড়ো করতে পারল না সেও এক সমস্যা।

কাবুল ফেরার পথে যুবরাজ নাকি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেঁদে ফেলেছিলেন। জলালাবাদের যেসব সেপাই তাঁকে আমিরের তখ্‌তে বসাবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল তারা ততক্ষণে আমান উল্লার দলে যোগ দিয়ে কাবুল যাচ্ছে। কান্না দেখে তারা নাকি মুইন-উস্‌-সুলতানের কাছে এসে বারবার বিদ্রূপ করে বলেছিল, 'বলো না এখন, ব কাকায়েম বোরো—খুড়োর কাছে যাও, তিনি সব জানেন। যাও এখন খুড়োর কাছে? এখন দেখি, কাবুল পৌঁছলে খুড়ো তোমাকে বাঁচান কী করে!'

কাবুলের আর্ক দুর্গে দু'জনকেই বন্দি করে রাখা হল। কিছুদিন পর নসর উল্লা 'কলেরায়' মারা যান। কফি খেয়ে নাকি তাঁর কলেরা হয়েছিল। কফিতে অন্য কিছু মেশানো ছিল কিনা সে বিষয়ে দেখলুম অধিকাংশ কাবুল চারণের স্মৃতিশক্তি বড়ই ক্ষীণ।

এর পর মুইন-উস্‌-সুলতানের মনের অবস্থা কী হয়েছিল ভাবতে গেলে আমার মত নিরীহ বাঙালীর মাথা ঘুরে যায়। কল্পনা সেখানে পৌঁছয় না, মৃত্যুভয়ের তুলনাও নাকি নেই।

এখানে পৌঁছে সমস্ত দুনিয়ার উচিত আমান উল্লাকেও বারবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা। প্রাচ্যের ইতিহাসে যা কখনো হয়নি আমান উল্লা তাই করলেন। মাতার হাত থেকে যেটুকু ক্ষমতা তিনি ততদিনে অধিকার করতে পেরেছিলেন তারই জোরে, বিচক্ষণ কূটনৈতিকদের শত উপদেশ গ্রাহ্য না করে তিনি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মুক্তি দিলেন।

এ যে কত বড় সাহসের পরিচয় তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন যাঁরা মোগলপাঠানের ইতিহাস পড়েছেন। এত বড় দরাজ-দিল আর হিম্মৎ-জিগরের নিশান আফগানিস্থানের ইতিহাসে আর নেই।

পঁচিশ

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কানমন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে আমান উল্লা আরো ভালো রকমেই বুঝতে পারলেন যে, চোরের যদি তিন দিন হয় তবে সাধুর মাত্র এক দিন। সেই একদিনের হক্কের জোরে তিনি লড়াই জিতেছেন—এখন আবার দুশমনের পালা। আমান উল্লা তার জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

জমাখরচের খাতা খুলে দেখলেন, জমায় লেখা, আমান উল্লা খান দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন, তিনি আর 'আমির' আমান উল্লা নন—তিনি 'গাজী' 'বাদশাহ' আমান উল্লা খান।

খরচে লেখা, নসর উল্লার মোল্লার দল যদিও আসর থেকে সরে গিয়েছে তবু তাদের বিশ্বাস নেই। আমান উল্লা ফরাসী জানতেন—'রেক্যুলের পুর মিয়ো সোতের', অর্থাৎ 'ভালো করে লাফ দেওয়ার জন্য পিছিয়ে যাওয়া' প্রবাদটা তাঁর অজানা ছিল না।

কিন্তু আমান উল্লা মনে মনে স্থির করলেন, মোল্লারা সরকারি রাস্তার কোনখানে খানাখন্দ বানিয়ে রাখবে সে ভয় অহরহ বুকের ভিতর পুষে রাখলে দেশ-সংস্কারের মোটর টপ গিয়ারে চালানো অসম্ভব। অথচ পুরো স্পীডে মোটর না চালিয়ে উপায় নেই—সাধুর মাত্র এক দিন।

কাবুলে পৌঁছে যে দিকে তাকাই সেখানে দেখি হরেকরকম সরকারি উর্দীপরা স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা ঘোরাঘুরি করছে। খবর নিয়ে শুনি কোনো উর্দী ফরাসী, কোনোটা জর্মন, কোনোটা ইংরিজি আর কোনোটা মিলিটারি স্কুলের। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের পাঠশালা পাশ করে যারা শহরে

এসেছে তাদের জন্য ফ্রি বোর্ডিং, লজিং, জামাকাপড়, কেতাবপত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট-বক্স, ডিক্সনরি, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্য খচ্চরের ভাড়া, এক কথায় 'অল ফাউণ্ড।'

ভারতবর্ষের হয়ে আমি বললুম, 'নাথিং লস্ট'।

প্যারিসফের্তা সইফুল আলম বুঝিয়ে বললেন, 'আপনি ভেবেছেন 'অল ফাউণ্ড' হলে বিদ্যেও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে জুটে যায়? মোটেই না। হস্টেল থেকে ছেলেরা প্রায়ই পালায়।'

আমি বললুম, 'ধরে আনার বন্দোবস্ত নেই?'

সইফুল আলম বললেন, 'গাঁয়ের ছেলেরা শক্ত হাড়ে তৈরি। পালিয়ে বাড়ি না গিয়ে যেখানে সেখানে দিন কাটাতে পারে। তারও দাওয়াই আমান উল্লা বের করেছেন। হস্টেল থেকে পালানো মাত্রই আমরা সরকারকে খবর দিই। সরকারের তরফ থেকে তখন দু'জন সেপাই ছোকরার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে আসর জমিয়ে বসে, তিন বেলা খায় দায় এবং যদিও হুকুম নেই তবু সকলের জানা কথা যে, কোর্মা-কালিয়া না পেলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ছেলের বাপকে তিন বেলা মার লাগায়। বাপ তখন ছেলেকে খুঁজতে বেরোয়। সে এসে হস্টেলে হাজিরা দেবে, হেডমাস্টারের চিঠি গাঁয়ে পৌঁছবে যে আসামি ধরা দিয়েছে তখন সেপাইরা বাপের ভালো দুম্বাটি কেটে বিদায়-ভোজ খেয়ে তাকে হুঁশিয়ার না করে শহরে ফিরবে। পরিস্থিতিটার পুনরাবৃত্তিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।'

আমি বললুম, 'কিন্তু পড়াশোনায় যদি কেউ নিতান্তই গর্দভ হয় তবে?'

'পর পর তিনবার যদি ফেল মারে তবে হেডমাস্টার বিবেচনা করে দেখবেন তাকে ডিসমিস করা যায় কি না? বুদ্ধিশুদ্ধি আছে অথচ পড়াশোনায় ঢিটেমি করছে জানলে তার তখনো ছুটি নেই।'

এর পর কোন দেশের রাজা আর কী করতে পারেন?

মিলিটারি স্কুলের ভার তুর্কদের হাতে। তুর্কি জেনারেলদের ঐতিহ্য বার্লিনের পৎস্‌দাম সমরবিদ্যায়তনের সঙ্গে জড়ানো; তাই শুনলুম স্কুলটি জর্মন কায়দায় গড়া। সেখানে কী রকম উন্নতি হচ্ছে তার খবর কেউ দিতে পারলেন না। শুধু অধ্যাপক বেনওয়া বললেন, 'ইস্কুলটা তুলে দিলে আফগানিস্থানের কিছু ক্ষতি হবে না।'

মেয়েদের শিক্ষার জন্য আমান উল্লা আর তাঁর বেগম বিবি সুরাইয়া উঠে পড়ে লেগেছেন। বোরকা পরে এক কাবুল শহরেই প্রায় দু'হাজার মেয়ে ইস্কুলে যায়, উঁচু পাঁচিলঘেরা আঙিনায় বাস্কেটবল, ভলিবল খেলে। সইফুল আলম বললেন, 'লিখতে পড়তে, আঁক কষতে শেখে, সেই যথেষ্ট। আর তাও যদি না শেখে আমার অন্তত কোনো আপত্তি নেই। হারেমের বন্ধ হাওয়ার বাইরে এসে লাফালাফি করছে এই কি যথেষ্ট নয়?'

আমি সর্বান্তঃকরণে সায় দিলুম। সইফুল আলম কানে কানে বললেন, 'কিন্তু একজন লোক একদম সায় দিচ্ছেন না। রানী-মা।'

শুনে একটু ঘাবড়ে গেলুম। দুই শত্রু নিপাত করে তৃতীয় শত্রুকে ঠাণ্ডা রেখে যিনি আমান উল্লাকে বাদশা বানাতে পেরেছেন তাঁর রায়ের একটা মূল্য আছে বই কি? তাঁর মতে নাকি এত শিক্ষার খোরাক আফগানিস্থান হজম করতে পারবে না। এই নিয়ে নাকি মাতাপুত্রে মনোমালিন্য হয়েছে—মাতা অভিমানভরে পুত্রকে উপদেশ দেওয়া বন্ধ করেছেন। বধূ সুরাইয়াও নাকি শাশুড়ীকে অবজ্ঞা করেন।

কিন্তু কাবুল শহর তখন আমান উল্লার চাবুক খেয়ে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে—'দেরেশি' পরে। 'দেরেশি' কথাটা ইংরেজি 'ড্রেস' থেকে এসেছে—অর্থাৎ হ্যাট, কোট, টাই; প্যান্তলুন। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, সরকারি কর্মচারী হলেই তাকে দেরেশি পরতে হয় তা সে বিশ টাকার কেরানিই হোক, আর দশ টাকার সিপাই-ই হোক। শুধু তাই নয়, দেরেশি পরা না থাকলে কাবুল নাগরিক সরকারি বাগানে পর্যন্ত ঢুকতে পায় না। একদিকে সরকারি চাপ, অন্যদিকে বাইরের চাকচিক্যের প্রতি অনুন্নত জাতির মোহ, মাঝখানে সিনেমার উস্কানি, তিনে মিলে কাবুল দেরেশিপাগল হয়ে উঠেছে।

ইস্তেক আবদুর রহমানের মনে ছোঁয়াচ লেগেছে। আমি বাড়িতে শিলওয়ার পরে বসে থাকলে সে খুঁতখুঁত করে; আটপৌরে স্যুট পরে বেরতে গেলে নীলকৃষ্ণ দেরেশি পরার উপদেশ দেয়।

মেয়েরাও তাল রেখে চলেছেন। আমির হবীব উল্লা হারেমের মেয়েদের ফ্রক ব্লাউজ পরাতেন। আমান উল্লার আমলে দেখি ভদ্রমহিলা মাত্রেই উঁচু হিলের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, আস্বচ্ছ সিল্কের মোজা, লম্বা হাতার আঁটসাঁট ব্লাউজ, দস্তানা আর হ্যাট পরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। হ্যাটের সামনে একখানা অতি পাতলা নেট ঝুলছে বলে চেহারাখানা পষ্টাপষ্টি দেখা যায় না। যে মহিলার যত সাহস তাঁর নেটের বুনুনি তত ঢিলে।

Figure কথাটার ফরাসি উচ্চারণ 'ফিগুর', অর্থ—মুখের চেহারা। ফরাসি অধ্যাপক বেনওয়া বলতেন, 'কাবুলী মেয়েদের ফিগার বোঝা যায় বটে, কিন্তু ফিগুর দেখবার উপায় নেই।'

কিন্তু দেশের ধনদৌলত না বাড়িয়ে তো নিত্য নিত্য নতুন স্কুল-কলেজ খোলা যায় না, দেরেশি দেখানো যায় না, ফিগার ফলানো যায় না। ধনদৌলত বাড়াতে হলে আজকের দিনে কলকারখানা বানিয়ে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার করতে হয়। তার জন্য প্রচুর পুঁজির দরকার। আফগানিস্থানের গ্যাঁটে সে কড়ি নেই—বিদেশিদের হাতে দেশের শিল্পবাণিজ্য ছেড়ে দিতেও বাদশা নারাজ। আমান উল্লার পিতামহ দোর্দণ্ডপ্রতাপ আবদুর রহমান বলতেন, 'আফগানিস্থান সেদিনই রেলগাড়ি চালাবে যেদিন সে নিজের হাতে রেলগাড়ি তৈরী করতে পারবে।' পিতা হবীব উল্লা সে আইন ঠিক ঠিক মেনে চলেননি—তবে কাবুলের বিজলি বাতির জন্য যে কলকব্জা কিনেছিলেন সেটা কাবুলি টাকায়। আমান উল্লা কী করবেন ঠিক মনস্থির করতে পারছিলেন না—ন্যাশনাল লোন তোলার উপদেশ কেউ কেউ তাঁকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাহলে সবাইকে সুদ দিতে হয় এবং সুদ দেওয়া-নেওয়া ইসলামে বারণ।

হয়ত আমান উল্লা ভেবেছিলেন যে, দেশের গুরুভারের খানিকটে নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে দেশের আর পাঁচজনের কাঁধে যদি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া যায় তাহলে প্রগতির পথে চলার সুবিধে হবে। আমান উল্লা বললেন, 'পার্লিমেণ্ট তৈরি করো।'

সে পার্লিমেণ্টের স্বরূপ দেখতে পেলুম পাগমান গিয়ে।

কাবুল থেকে পাগমান কুড়ি মাইল রাস্তা। বাস চলাচল আছে। সমস্ত শহরটা গড়ে তোলা হয়েছে পাহাড়ের থাকে থাকে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা শাঁখ কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার ভাঁজে ভাঁজে ছোট বাঙলো; অনেকটা ইতালিয়ান ভিলার মত। সমস্ত পাগমান শহর জুড়ে আপেল নাসপাতির গাছ বাঙলোগুলোকে ঘিরে রেখেছে আর চূড়ার বরফগলা ঝরণা রাস্তার এক পাশের নালা দিয়ে থাকে থাকে নেমে এসেছে। পিচ ঢালা পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে উঠছি আর দেখছি দুদিকে ঘন সবুজের নিবিড় স্তব্ধ সুষুপ্তি। কোনো দিকে কোনো প্রকার জীবনযাত্রার চঞ্চলতা নেই, কঠিন পাথরের খাড়া দেয়াল নেই, ঘিনঘিনে হলদে রঙের বাড়িঘরদোর নেই। কিছুতেই মনে হয় না যে, নীরস কর্কশ আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে চলেছি, থেকে থেকে ভুল লাগে, আর চোখ চেয়ে থাকে সামনের মোড় ফিরতেই নেবুর ঝুড়ি-কাঁধে খাসিয়া মেয়েগুলোকে দেখবে বলে।

বাদশা আমির-ওমরাহ নিয়ে গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটান। এক সপ্তাহের জন্য তামাম আফগানিস্থান ওখানে জড়ো হয় 'জশন' বা স্বাধীনতা দিবসের আমোদ-আহ্লাদ করার জন্য। দল বেঁধে আপন আপন তাঁবু সঙ্গে নিয়ে এসে তারা রাস্তার দু'দিকে যেখানে সেখানে সেগুলো খাটায়। সমস্ত দিন কাটায় চাঁদমারি, মঙ্গোল নাচ, পল্টনের কুচকাওয়াজ দেখে, না হয় চায়ের দোকানে আড্ডা জমিয়ে; রাত্রে তাঁবুতে তাঁবুতে শুরু হয় গানের মজলিস। 'আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই, জোয়ান হইব গোড়া হতে তবে এ জীবন দোহরাই'—ধরনের ওস্তাদী গানের রেওয়াজ প্রায় নেই, হরেকরকম 'ফতুজানকে' অনেকরকম সাধ্য-সাধনা করে ডাকাডাকি করা হচ্ছে এ-সব গানের আসল ঝোঁক। মাঝে মাঝে একজন অতিরিক্ত উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে দু'চার চক্কর নাচ ভী দেখিয়ে দেয়। আর সবাই গানের ফাঁকে

ফাঁকে 'সাবাস সাবাস' বলে নাচনেওয়ালাকে উৎসাহ দেয়।

এ-রকম মজলিসে বেশিক্ষণ বসা কঠিন। বন্ধ ঘরে যদি সবাই সিগারেট ফোঁকে তবে নিজেকেও সিগারেট ধরাতে হয়—না হলে চোখ জ্বালা করে, গলা খুসখুস করতে থাকে। এ-সব মজলিসে আপনিও যদি মনের ভিতরে কোনো 'ফতুজান' বা কদম্ববনবিহারিণীর ছবি এঁকে গলা মিলিয়ে—না মিললেও আপত্তি নেই—চিৎকার করে গান না জোড়েন তবে দেখবেন ক্রমেই কানে তালা লেগে আসছে, শেষটায় ফাটার উপক্রম। রাগবি খেলার সঙ্গে এ-সব গানের অনেক দিক দিয়ে মিল আছে--তাই এর রসভোগ করতে হয় বেশ একটু তফাতে আলগোছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু আমার বার বার মনে হল পাগমান হৈ-হল্লার জায়গা নয়। নির্ঝরের ঝরঝর, পত্র-পল্লবের মৃদু মর্মর, অচেনা পাখির একটানা কূজন, পচা পাইনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, সবসুদ্ধ মিলে গিয়ে এখানে বেলা দ্বিপ্রহরেও মানুষের চোখে তন্দ্রা আসে। ভরা গ্রীষ্মকাল, গাছের তলায় বসলে তবু শীত শীত করে—কোটের কলারটা তুলে দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় পেয়ালা, প্রিয়া, কবিতার বই কিছুরই প্রয়োজন নেই, একখানা র‍্যাপার পেলে ওমটা ঠিক জমত।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। চোখ মেলে দেখি এক অপরূপ মূর্তি। কাঁচাপাকা লম্বা দাড়িওয়ালা, ঘামে-ভেজা, আজন্ম অস্নাত অধৌত, পীত দন্তকৌমুদী বিকশিত এক আফগান সামনে দাঁড়িয়ে। এরূপ আফগান অনেক দেখেছি, কিন্তু এর পরনে ধারালো ক্রীজওয়ালা সদ্য নতুন কালো পাতলুন, কালো ওয়েস্টকোট, স্টার্চ করা শক্ত শার্ট, কোণ-ভাঙা স্টিফ কলার, কালো টাই, দু'বোতামওয়ালা নব্যতম কাটের মর্নিংকোট আর একমাথা বাবরি চুলের উপর দেড়ফুট উঁচু চকচকে সিল্কের অপেরা-হ্যাট। সব কিছু আনকোরা ঝাঁ-চকচকে নতুন; দেখে মনে হল যেন এই মাত্র দর্জির কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে বের করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে পরা হয়েছে। যা তা দেরেশি নয়, ষোল আনা মর্নিং-স্যুট। প্যারেডের দিনে লাট-বেলাট এই রকম স্যুট পরে সেলুট নেন।

বেল্টের অভাবে পাজামার নোংরা নেওয়ার দিয়ে পাতলুন বাঁধা। কালো ওয়েস্টকোট আর পাতলুনের সঙ্গমস্থল থেকে এক মুঠো ধবধবে সাদা শার্ট বেরিয়ে এসেছে, টাইটাও ওয়েস্টকোটের উপর ঝুলছে।

বাঁ হাতে পাগড়ির কাপড় দিয়ে বানানো বোঁচকা, ডান হাতে ফিতেয় বাঁধা একজোড়া নতুন কালো বুট। তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি পায়ে জুতো মোজা নেই!

আমাকে পশতু ভাষায় অভিবাদন করে বোঁচকাটা কাঁধে ফেলে, লম্বা হাতে বুট জোড়া দোলাতে দোলাতে ওরাঙওটাঙের মত বড় রাস্তার দিকে রওয়ানা হল।

আমি তো ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলুম না যে, এ-রকমের আফগান এ-ধরনের স্যুট পেলই বা কোথায়, আর এর প্রয়োজনই বা তার কী। কিন্তু ঐ এক মূর্তি নয়। বন থেকে বেরবার আগে হুবহু এক দ্বিতীয় মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে দেখি এক মুচির সামনে উবু হয়ে বসে গল্প জুড়েছে আর মুচি তার বুটের তলায় লোহা ঠুকে ঠুকে আল্পনা এঁকে দিচ্ছে।

পরের দিন আমান উল্লার বক্তৃতা। সভায় যাওয়ার পথে এ-রকম আরো ডজনখানেক মূর্তির সঙ্গে দেখা হল। সেখানে গিয়ে দেখি সভার সবচেয়ে ভালো জায়গায়, প্ল্যাটফর্মের মুখোমুখি প্রায় শ'দেড়েক লোক এ-রকম মর্নিং-স্যুটের ইউনিফর্ম পরে বসে আছে। এরাই প্রথম আফগান পার্লিমেন্টের সদস্য।

যে তাজিক, হাজারা, মঙ্গোল, পাঠান আপন আপন জাতীয় পোষাক পরে এতকাল স্বচ্ছন্দে ঘরে-বাইরে ঘোরাফেরা করেছে, বিদেশির মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আজ তারা বিকট বিজাতীয় বেশভূষা ধারণ করে সভাস্থলে কাঠের মত বসে আছে। শুনেছি অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করে, কিন্তু এদের তো শুধু কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়নি, সর্বাঙ্গে যেন কৃষ্ণচন্দন লেপে দেওয়া হয়েছে!

আমান উল্লা দেশের ভূতভবিষ্যৎবর্তমান সম্বন্ধে অনেক খাঁটি কথা বললেন। কাবুলের লোক

হাততালি দিল। সদস্যদের তালিম দেওয়া হয়েছিল কিনা জানিনে, তারা এলোপাতাড়ি হাততালি দিয়ে লজ্জা পেয়ে এদিক ওদিক তাকায়; ফরেন অফিসের কর্তারা আরো বেশি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করেন। বিদেশি রাজদূতেরা অপলক দৃষ্টিতে আমান উল্লার দিকে তাকিয়ে—সেদিন বুঝতে পারলুম রাজদূত হতে হলে কতদূর আত্মসংযম, কত জোর চিত্তজয়ের প্রয়োজন।

জানি, স্যুট ভালো করে পরতে পারা না পারার উপর কিছুই নির্ভর করে না কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কী প্রয়োজন ছিল লেফাফাদুরস্ত হওয়ার লোভে দেড়শ' জন গাঁওবুড়োকে লাঞ্ছিত করে নিজে বিড়ম্বিত হওয়ার?

আমান উল্লার বক্তৃতা এরা কতদূর বুঝতে পেরেছিল জানিনে—ভাষা এক হলেই তো আর ভাবের বাজারের বেচাকেনা সহজ সরল হয়ে ওঠে না। শুনেছি, পুরানো বোতলও নাকি নয়া মদ সইতে পারে না।

ছাব্বিশ

গ্রীষ্মকালটা কাটল ক্ষেত-খামারের কাজ দেখে দেখে। আমাদের দেশে সে সুবিধে নেই; ঠাঠা রোদ্দুর, ঝমাঝম বৃষ্টি, ভলভলে কাদা আর লিকলিকে জোঁকের সঙ্গে একটা রফারফি না করে আমাদের দেশের ক্ষেত-খামারের পয়লা দিকটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই। এদেশের চাষবাসের বেশির ভাগ শুকনো-শুকনিতে। শীতের গোড়ার দিকে বেশ ভালো করে একদফা হাল চালিয়ে দেয়; তারপর সমস্ত শীতকাল ধরে চাষির আশা যেন বেশ ভালো রকম বরফ পড়ে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে বার কয়েক ক্ষেতের উপর বরফ জমে আর গলে; জল চুইয়ে চুইয়ে অনেক নিচে ঢোকে আর সমস্ত ক্ষেতটা বেশ নরম করে দেয়। বসন্তের শুরুতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়, কিন্তু মাঠ ঘাট ডুবে যায় না। আধাভেজা আধা-শুকনোতে তখন ক্ষেতের কাজ চলে—নালার ধারে গাছতলায় একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বেশ আরাম ক'রে বসে ক্ষেতের কাজ দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না। তারপর গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে পাহাড়ের উপরকার জমা-বরফ গলে কাবুল উপত্যকায় নেমে এসে খাল-নালা ভরে দেয়। চাষীরা তখন নালায় বাঁধ দিয়ে দু'পাশের ক্ষেতকে নাইয়ে দেয়। ধান ক্ষেতের মত আল বেঁধে বেবাক জমি টৈটম্বুর করে দিতে হয় না।

কোন চাষির কখন নালায় বাঁধ দেবার অধিকার সে সম্বন্ধে বেশ কড়াকড়ি আইন আছে। শুধু তাই নয়, নালার উজান ভাঁটির সময় গাঁয়ে গাঁয়ে জলের ভাগ-বাঁটোয়ারার কী বন্দোবস্ত তারও পাকাপাকি শর্ত সরকারের দফতরে লেখা থাকে। মাঝে মাঝে মারামারি মাথা ফাটাফাটি হয়, কিন্তু কাবুল উপত্যকার চাষারা দেখলুম বাঙালী চাষার মতই নিরীহ—মারামারির চেয়ে গালাগালিই বেশি পছন্দ করে। তার কারণ বোধহয় এই যে, কাবুল উপত্যকা বাঙলাদেশের জমির চেয়েও উর্বরা। তার উপর তাদের আরেকটা মস্ত সুবিধে এই যে, তারা শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না। শীতকালে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বরফ পড়ে তাদের ক্ষেত ভরে যায়, অথবা যদি পাহাড়ের বরফ প্রচুর পরিমাণে গলে নেমে আসে, তাহলে তারা আর বৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। কাবুলের লোক তাই বলে, 'কাবুল বেজর্ শওদ লাকিন বে-বর্ফ ন্ বাশদ'—কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায় দশহাত চওড়া একটি নালা বয়ে যায়। তার দু'দিকে দু'সারি উঁচু চিনার গাছ, তারই নিচে দিয়ে পায়ে চলার পথ। আমি সেই পথ দিয়ে নালা উজিয়ে উজিয়ে অনেক দূরে গিয়ে একটা পঞ্চবটির মত পাঁচচিনারের মাঝখানে বরসাতি পেতে আরাম করে বসতুম। একটু উজানে নালায় বাঁধ দিয়ে আরেক চাষা তার ক্ষেত নাওয়াচ্ছে। আমি যে ক্ষেতের পাশে বসে আছি তার চাষা আমার সঙ্গে নানারকম সুখদুঃখের কথা কইছে। এ দু'জনের কান মসজিদের দিকে—কখন আসরের (অপরাহ্ন) নমাজের আজান পড়বে। তখন আমার চাষার পালা। আজান পড়া মাত্রই সে উপরের বাঁধের পাথর-কাদা সরিয়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে কুলকুল করে নিচের বাঁধে জল ভর্তি হতে

শুরু করে; চাষা তার বাঁধ আগের থেকেই তৈরী করে রেখেছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে তখন বাঁধের তদারক করে বেড়ায়, কাঠের শাবল দিয়ে মাঝে মাঝে কাদা তুলে সেটাকে আরো শক্ত করে দেয়, ক্ষেতের ঢেলা মাটি এদিকে ওদিকে সরিয়ে দিয়ে বানের জলের পথ করে দেয়। শিলওয়ারটা হাঁটুর উপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে, জামাটা খুলে গাছতলায় পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে, আর পাগড়ির লেজ দিয়ে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছছে। আমি ততক্ষণে তার হুঁকোটার তদারক করছি। সে মাঝে মাঝে এসে দু'একটা দম দেয় আর পাগড়ির লেজ দিয়ে হাওয়া খায়। আমাদের চাষার গামছা আর কাবুলী চাষার পাগড়ি দুই-ই এক বস্তু। হেন কর্ম নেই যা গামছা আর পাগড়ি দিয়ে করা যায় না— ইস্তেক মাছ ধরা পর্যন্ত। যদিও আমাদের নালায় সব সময়ই দেখেছি অতি নগণ্য পোনা মাছ।

বেশ বেলা থাকতে মেয়েরা কলসি মাথায় 'জলকে' আসত। গোড়ার দিকে আমাকে দেখে তারা মুখের উপর ওড়না টেনে দিত, আমাদের দেশের চাষির বউ যে রকম 'ভদ্দর নোককে' দেখলে 'নজ্জা' পায়। তবে এদের 'নজ্জা' একটু কম। ডানহাত দিয়ে বুকের উপর ওড়না টেনে বাঁহাত দিয়ে হাঁটুর উপরে পাজামা তুলে এরা প্রথম দর্শনে আরবী ঘোড়ার মত ছুট দেয়াঁন আর অল্প কয়েকদিনের ভিতরই তারা আমার সামনে স্বচ্ছন্দে আমার চাষা বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল।

কিন্তু চাষা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশিদিন টিকলো না। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ি মুইন-উস্-সুলতানে। চাষাই বলল, সে প্রথমটায় তার চোখকে বিশ্বাস করেনি যখন দেখতে পেল তারি আগা (ভদ্রলোক) বন্ধু মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি (টেনিস) খেলছেন। আমি তাকে অনেক করে বোঝালুম যে, তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, সেও সায় দিল, কিন্তু কাজের বেলা দেখলুম সে আর আমাকে তামাক সাজতে দেয় না, আগের মত প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না, 'তো'র বদলে হঠাৎ 'শুমা' বলতে আরম্ভ করেছে আর সম্মানার্থে বহুবচন যদি বা সর্বনামে ঠিক রাখে তবু ক্রিয়াতে একবচন ব্যবহার করে নিজের ভুলে নিজেই লজ্জা পায়। ভাষা শুধরাতে গিয়ে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলে, আর কিছুতেই ভুলতে পারে না যে, আমি মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি খেলি। আমাদের তেলতেলে বন্ধুত্ব কেমন যেন করকরে হয়ে গেল।

কিন্তু লেনদেন বন্ধ হয়নি, যতদিন গাঁয়ে ছিলুম প্রায়ই মুরগীটা আণ্ডাটা দিয়ে যেত। দাম নিতে চাইত না, কেবল আবদুর রহমানের থাবার ভয়ে যা নিতান্ত না নিলে চলে না তাই নিতে স্বীকার করত।

হেমন্তের শেষের দিকে ফসলকাটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন চাষা কাঠুরে হয়ে গেল। আমাকে আগের থেকেই বলে রেখেছিল। একদিন দেখি পাঁচ গাধা-বোঝাই শীতের জ্বালানি কাঠ নিয়ে উপস্থিত। আবদুর রহমানের মত খুঁতখুঁতে লোকও উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করল যে, এ রকম পয়লা নম্বরের নিম্-তর্-নিম্-খুশ্‌ক্ (আধা-ভেজা) কাঠ কাবুল বাজারের কোথাও পাওয়া যায় না। আবদুর রহমান আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, সম্পূর্ণ শুকনো হলে কাঠ তাড়াতাড়ি জ্বলে গিয়ে ঘর বড্ড বেশি গরম করে তোলে, তাতে আবার খরচা হয় বেশী। আর যদি সম্পূর্ণ ভেজা হয় তাহলে গরমের চেয়ে ধুঁয়োই বেরোয় বেশী, যদিও খরচা তাতে কম।

এবার দাম দেবার বেলায় প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। আমি তাকে কাবুলের বাজার-দর দিতে গেলে সে শুধু বলে যে, কাবুলের বাজারে সে অত দাম পায় না। অনেক তর্কাতর্কির পর বুঝলুম যে, বাজারের দরের বেশ খানিকটা পুলিশ ও তাদের ইয়ারবক্সীকে দিয়ে দিতে হয়। শেষটায় গোলমাল শুনে মাদাম জিরার এসে মিটমাট করে দিয়ে গেলেন।

আমাদের দিলখোলা বন্ধুত্ব প্রায় লোপ পাবার মত অবস্থা হল যেদিন সে শুনতে পেল আমি 'সৈয়দ'। তারপর দেখা হলেই সে তার মাথার পাগড়ি ঠিক করে বসায় আর আমার হাতে চুমো খেতে চায়। আমি যতই বাধা দিই, সে ততই কাতর নয়নে তাকায়, আর পাগড়ি বাঁধে আর খোলে!

তামাক-সাজার সত্যযুগের কথা ভেবে নিশ্বাস ফেললুম।

ডিমোক্রেসি বড় ঠুনকো জিনিস; কখন যে কার অভিসম্পাতে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। তারপর আর কিছুতেই জোড়া লাগে না।

সাতাশ

হেমন্তের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতন থেকে মৌলানা জিয়াউদ্দীন এসে কাবুলে পৌঁছলেন। বগদানফ, বেন্‌ওয়া, মৌলানা, আমাতে মিলে তখন 'চারইয়ারী' জমে উঠল।

জিয়াউদ্দীন অমৃতসরের লোক। ১৯১১ সালের খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ছাড়েন। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হন এবং পরে ভালো বাঙলা শিখেছিলেন। বেশ গান গাইতে পারতেন আর রবীন্দ্রনাথের অনেক গান পাঞ্জাবিতে অনুবাদ করে মূল সুরে গেয়ে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যসভায় আসর জমাতেন। এখানে এসে সে সব গান খুব কাজে লেগে গেল, কাবুলের পাঞ্জাবি সমাজ তাঁকে লুফে নিল। মৌলানা ভালো ফার্সি জানতেন বলে কাবুলিরাও তাঁকে খুব সম্মান করত।

কিন্তু 'চারইয়ারী' সভাতে ভাঙন ধরল। বগদানফের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলেন। বেনওয়া সায়েব তখন বড্ড মনমরা হয়ে গেলেন। কাবুলে তিনি কখনো খুব আরাম বোধ করেননি। এন্ড্রুজ, পিয়ার্সনকে বাদ দিলে বেনওয়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খাঁটি সমঝদার। শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক প্রায়ই উদাস হয়ে যেতেন আর খামকা কাবুলের নিন্দা করতে আরম্ভ করতেন।

বেনওয়া সায়েবই আমাকে একদিন রাশান এম্বেসিতে নিয়ে গেলেন।

প্রথম দর্শনেই তাভারিশ দেমিদফকে আমার বড় ভালো লাগলো। রোগা চেহারা, সাধারণ বাঙালীর মতন উঁচু, সোনালি চুল, চোখের লোম পর্যন্ত সোনালি, শীর্ণ মুখ আর দুটি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ নীল চোখ। বেনওয়া যখন আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি মুখ খোলার আগেই যেন চোখ দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছিলেন। সাধারণ কন্টিনেন্টালের চেয়ে একটু বেশি ঝুঁকে তিনি হ্যাণ্ডশেক করলেন, আর হাতের চাপ দেওয়ার মাঝ দিয়ে অতি সহজে অভ্যর্থনার সহৃদয়তা প্রকাশ করলেন।

তাঁর স্ত্রীরও রেশমি চুল, তবে তিনি বেশ মোটাসোটা আর হাসিখুশি মুখ। কোথাও কোনো অলঙ্কার পরেননি, লিপস্টিক রুজ তো নয়ই। হাত দু'খানা দেখে মনে হল ঘরের কাজকর্মও বেশ খানিকটা করেন। সাধারণ মেয়েদের কপালের চেয়ে অনেক চওড়া কপাল, মাথার মাঝখানে সিঁথি আর বাঙালী মেয়েদের মত অযত্নে বাঁধা এলোখোঁপা।

কর্তা কথা বললেন ইংরিজিতে, গিন্নী ফরাসীতে।

অভিজ্ঞান শেষ হতে না হতেই তাভারিশ দেমিদফ বললেন, 'চা, অন্য পানীয়, কী খাবেন বলুন।'

ইতিমধ্যে দেমিদফ পাপিরসি (রাশান সিগারেট) বাড়িয়ে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে তৈরি।

আমি বাঙালী, বেনওয়া সায়েব শান্তিনিকেতনে থেকে আধা বাঙালী হয়ে গিয়েছেন আর রাশানরা যে চা খাওয়াতে বাঙালীকেও হার মানায় সে তো জানা কথা।

তবে খাওয়ার কায়দাটা আলাদা। টেবিলের মাঝখানে সামোভার; তার জল টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। এদিকে টি-পটে সকালবেলা মুঠো পাঁচেক চা আর গরম জল দিয়ে একটা ঘন মিশকালো লিকার তৈরি করা হয়েছে—সেটা অবশ্য ততক্ষণে জুড়িয়ে হিম হয়ে গিয়েছে। টি-পট হাতে করে প্রত্যেকের পেয়ালা নিয়ে মাদাম শুধান, 'কতটা দেব বলুন।' পোয়াটাক নিলেই যথেষ্ট; সামোভারের চাবি খুলে টগ্‌বগে গরম জল তাতে মিশিয়ে নিলে দু'য়ে মিলে তখন বাঙালী চায়ের রঙ ধরে। কায়দাটা মন্দ নয়, একই লিকার দিয়ে কখনো কড়া, কখনো ফিকে যা খুশি খাওয়া যায়। দুধের রেওয়াজ নেই, দুধ গরম করার হাঙ্গামাও নেই। সকালবেলাকার তৈরি লিকারে সমস্ত দিন চলে।

সামোভারটি দেখে মুগ্ধ হলুম। রূপোর তৈরী। দু'দিকের হ্যাণ্ডেল, উপরের মুকুট, জল খোলার চাবি, দাঁড়াবার পা সব কিছুতেই পাকা হাতের সুন্দর, সুদক্ষ, সূক্ষ্ম কাজ করা।

তারিফ করে বললুম, 'আপনাদের রূপোর তাজমহলটি ভারি চমৎকার।'

দেমিদফের মুখের উপর মিষ্টি লাজুক হাসি খেলে গেল—ছোট ছেলেদের প্রশংসা করলে যে রকম হয়। মাদাম উচ্ছ্বসিত হয়ে বেনওয়া সায়েবকে বললেন, 'আপনার ভারতীয় বন্ধু ভালো কমপ্লিমেন্ট দিতে জানেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাজমহল ছাড়া ভারতীয় আর কোনো ইমারতের সঙ্গে তুলনা দিলে কিন্তু চলত না মসিয়ো; আমি ঐ একটার নামই জানি, ছবি দেখেছি।'

তখন দেমিদফ বললেন, 'সামোভারটি তুলা শহরে তৈরি।'

আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললুম, কোথায় যেন চেখফ না গর্কির লেখাতে একটা রাশান প্রবাদ পড়েছি, 'তুলাতে সামোভার নিয়ে যাওয়ার মত।' আমরা বাঙলাতে বলি, 'তেলা মাথায় তেল ঢালা।'

'কেরিইং কোল টু নিউ কাস্‌ল', 'বরেলি মে বাঁস লে জানা' ইত্যাদি সব ক'টাই আলোচিত হল। আমার ফরাসী প্রবাদটিও মনে পড়ছিল, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী নিয়ে যাওয়া'। কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করে সেটা চেপে রাখলুম। হাফিজও যখন বলেছেন, 'আমি কাজি নই মোল্লাও নই, আমি কোন দুঃখে 'তওবা' (অনুতাপ) করতে যাব!' আমি ভাবলুম 'আমি ফরাসী নই, আমার কী দায় রসাল প্রবাদটা দাখিল করবার?'

দেমিদফ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতবর্ষের লোক রাশান কথাসাহিত্য পড়ে কি না।

আমি বললুম, 'গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো মত দেওয়া কঠিন, কিন্তু বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বলতে পারি সেখানে এককালে ফরাসী সাহিত্য যে আসন নিয়েছিল সেটা কয়েক বৎসর হল রুশকে ছেড়ে দিয়েছে। বাঙলাদেশের অনেক গুণী বলেন, চেখফ মপাসাঁর চেয়ে অনেক উঁচু দরের স্রষ্টা।'

বাঙলাদেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষই যে ক্রমে ক্রমে রুশ সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে সে সম্বন্ধে বেনওয়া সায়েব তখন অনেক আলোচনা করলেন। ভারতবাসীর সঙ্গে রুশের কোন জায়গায় মনের মিল, অনুভূতির ঐক্য, বাতাবরণের সাদৃশ্য, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বেনওয়া অনেকক্ষণ ধরে আপনার পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাষায় মজলিশি কায়দায় পরিবেশন করলেন। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে যে প্রচুর রাশান নভেল, ছোট গল্পের বই মজুদ আছে সে কথাও বলতে ভুললেন না।

দেমিদফ বললেন, 'রাশানরা প্রাচ্য না পাশ্চাত্যের লোক তার স্থিরবিচার এখনো হয়নি। সামান্য একটা উদাহরণ নিন না। খাঁটি পশ্চিমের লোক শার্ট পাতলুনের নিচে গুঁজে দেয়, খাঁটি প্রাচ্যের লোক, তা সে আফগানই হোক আর ভারতীয়ই হোক, কুর্তাটা ঝুলিয়ে দেয় পাজামার উপরে। রাশানরা এ দু'দলের মাঝখানে—শার্ট পরলে সেটা পাতলুনের নিচে গোঁজে, রাশান-কুর্তা পরলে সেটা পাতলুনের উপর ঝুলিয়ে দেয়—সে কুর্তাও আবার প্রাচ্য কায়দায় তৈরি, তাতে অনেক রঙ অনেক নক্সা।'

দেমিদফের মত অত শান্ত ও ধীর কথা বলতে আমি কম লোককেই শুনেছি। ইংরিজি যে খুব বেশী জানতেন তা নয়, তবু যতটুকু জানতেন তার ব্যবহার করতেন বেশ ভেবেচিন্তে, সযত্নে শব্দ বাছাই করে করে।

রাশান সাহিত্যে আমার শখ দেখে তিনি টলস্টয়, গর্কি ও চেখফ ইয়াসান পলিয়ানাতে যে সব আলাপ আলোচনা করেছিলেন তার অনেক কিছু বর্ণনা করে বললেন, 'জারের আমলে তার সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি—কারণ টলস্টয় আপন মতামত প্রকাশ করার সময় জারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। জারের পতনের পর নতুন সরকার এতদিন নানা জরুরি কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল—এখন আস্তে আস্তে কিছু ছাপা হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে নানা রহস্যের সমাধান হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'সে কী কথা, আমি তো শুনেছি আপনারা আপনাদের প্রাক-বলশেভিক সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত নন?'

মাদামের মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় ইংরেজের প্রোপাগাণ্ডা!'

আমি আমার ভুল খবরের জন্য হন্তদন্ত হয়ে মাফ চেয়ে বললুম, 'আমরা রাশান জানিনে, আমরা চেখফ পড়ি ইংরিজিতে, লাল রুশের নিন্দাও পড়ি ইংরিজিতে।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভাব দেখে বুঝলুম তিনি ইংরেজ কী করে না করে কী বলে না বলে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আপন বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে যে অসত্য আপনার থেকে বিলোপ পাবে সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর মূল বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমরা এসেছিলুম চারটের সময়, তখন বাজে প্রায় সাতটা। এর মাঝে যে কত পাপিরসি পুড়ল, কত চা চলল, গল্পের তোড়ে আমি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিনি। এক কাপ শেষ হতেই মাদাম সেটা তুলে নিয়ে এঁটো চা একটা বড় পাত্রে ঢেলে ফেলেন, লিকার ঢেলে গরম জল মিশিয়ে চিনি দিয়ে আমার অজানাতেই আরেক কাপ সামনে রেখে দেন। জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেন না কতটা লিকারের প্রয়োজন, দু'একবার দেখেই আমার পরিমাণটা শিখে নিয়েছেন। আমি কখনো ধন্যবাদ দিয়েছি, কখনো টলস্টয় গর্কির তর্কের ভিতরে ডুবে যাওয়ায় লক্ষ্য করিনি বলে পরে অনুতাপ প্রকাশ করেছি।

কথার ফাঁকে মাদাম বললেন, 'আপনারা এখানেই খেয়ে যান।' আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'আরেক দিন হবে।' বেনওয়া সায়েব তো ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আজ উঠি, বড্ড বেশিক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি।'

আমি একটু বোকা বনে গেলুম। পরে বুঝতে পারলুম বেনওয়া সায়েব খাওয়ার নেমন্তন্নটা অন্য অর্থে ধরে নিয়ে লজ্জা পেয়েছেন। মাদামও দেখি আস্তে আস্তে বেনওয়ার মনের গতি ধরতে পেরেছেন। তখন লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে বললেন, 'না মসিয়ো, আমি সে অর্থে বলিনি; আমি সত্যিই আপনাদের গালগল্পে ভারী খুশি হয়ে ভাবলুম দু'মুঠো খাবার জন্য কেন আপনাদের আড্ডাটা ভঙ্গ হয়।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভালো করে কুয়াশাটা কাটাবার জন্য বললেন, 'পশ্চিম ইয়োরোপীয় এটিকেটে এ-রকম খেতে বলার অর্থ হয়তো 'তোমরা এবার ওঠো, আমরা খেতে বসব।' আমার স্ত্রী সে ইঙ্গিত করেননি। জানেন তো খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমরা এখনো আমাদের কুর্তা পাতলুনের উপরে পরে থাকি—অর্থাৎ আমরা প্রাচ্যদেশীয়।'

সকলেই আরাম বোধ করলুম। কিন্তু সে যাত্রা ডিনার হল না। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেমিদফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি রাশান শেখেন না কেন?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি শেখাবেন?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়। With pleasure!'

বেনওয়া বললেন, 'No, not with pleasure' বলে আমার দিকে চোখ ঠার দিলেন।

মাদাম বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

বেনওয়া বললেন, 'এক ফরাসী লণ্ডনের হোটেলে ঢুকে বলল, 'Waiter, bring me a cotlette, please!' ওয়েটার বলল, 'With pleasure, Sir.' ফরাসী ভয় পেয়ে বলল, 'No, no, not with pleasure, with potatoes, please!'

বেনওয়া বিদগ্ধ ফরাসী। একটুখানি হাল্কা রসিকতা দিয়ে শেষ পাতলা মেঘটুকু কেটে দিয়ে টুক করে বেরিয়ে এলেন।

মাদামও কিছু কম না। শেষ কথা শুনতে পেলুম 'But I shall give you cotlettes with both pleasure and potatoes.'

রাস্তায় বেরিয়ে বেনওয়াকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'এ দু'টি যথার্থ খাঁটিলোক।'

আঠাশ

হেমন্তের কাবুল মধ্যযুগীয় সম্প্রসারণে ফুলে ওঠে, ইংরিজিতে যাকে বলে, 'মিড্‌ল এজ্ স্প্রেড্।' অর্থাৎ

ভুঁড়িটা মোটা হয়, চাল-চলন ভারিক্কিভরা।

যবগমের দানা ফুলে উঠল, আপেল ফেটে পড়ার উপক্রম, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত গ্রীষ্ম-ভর রোদ বাতাস বৃষ্টি খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে, হাওয়া বইলে ডাইনে বাঁয়ে নাচন তোলে না, ঠায় দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কাঁপে, না হয় থপ করে ডাল ছেড়ে গাছতলায় শুয়ে পড়ে। প্রথম নবান্ন হয়ে গিয়েছে, চাষিরাও খেয়েদেয়ে মোটা হয়েছে। শীতকাতুরেরা দুটো একটা ফালতো জামা পরে ফেঁপেছে, গাধাগুলো ঘাস খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠেছে, খড়-চাপানো গাড়ির পেট ফেটে গিয়ে এদিক ওদিক কুটোর নাড়ী ছড়িয়ে পড়ছে।

আর সফল হয়ে ফেঁপে ওঠার আসল গরমি দেখা যায় সকালবেলার শিশিরে। বেহায়া বড়লোকের মত কাবুল উপত্যকা কেবলি হীরের আংটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়—ঝলমলানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

কিন্তু এ সব জেল্লাই কাবুল নদীর রক্তশোষণ করে। সাপের খোলসের মত সে নদী এখন শুকিয়ে গিয়েছে, বাতাস বইলে বুক চিরে বালি ওড়ে। মার্কস্ তো আর ভুল বলেননি, শোষণ করেই সবাই ফাঁপে।

যে পাগমান পাহাড়ের বরফের প্রসাদে কাবুল নদীর জৌলুশ সে তার নীল চূড়োগুলো থেকে এক একটা করে সব কটা বরফের সাদা টুপি খসিয়ে ফেলেছে। আকাশ যেন মাটির তুলনায় বড্ড বেশি বুড়িয়ে গেল—নীল চোখে ঘোলাটে ছানি পড়েছে।

পাকা, পচা ফলের গন্ধে মাথা ধরে; আফগানিস্থানের সরাইয়ের চতুর্দিক বন্ধ বলে দুর্গন্ধ যে রকম বেরতে পারে না, কাবুল উপত্যকার চারিদিকে পাহাড় বলে তেমনি পাকা ফল ফসলের গন্ধও সহজে নিষ্কৃতি পায় না। বাড়ির সামনে যে ঘূর্ণিবায়ু খড়কুটো পাতা নিয়ে বাইরে যাবে বলে রওয়ানা দেয়, সেও দেখি খানিকক্ষণ পরে ঘুরে ফিরে কোনোদিকে রাস্তা না পেয়ে সেই মাঠে ফিরে এসে সবসুদ্ধ নিয়ে থপ করে বসে পড়ে।

তারপর একদিন সন্ধ্যের সময় এল ঝড়। প্রথম ধাক্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলুম, মেলে দেখি শেলির 'ওয়েস্ট্ উইণ্ড' কীটসের 'অটামকে' ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে—সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'। খড়কুটো, জমে ওঠা পাতা, ফেলে দেয়া কুলো সবাই চলল দেশ ছেড়ে মুহাজরিন হয়ে। কেউ চলে সার্কাসের সঙের মত ডিগবাজি খেয়ে, কেউ হনুমানের মত লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে দিয়ে আর বাদবাকি যেন ধনপতির দল—প্রলেতারিয়ার আক্রমণের ভয়ে একে ওকে জড়িয়ে ধরে।

আধ ঘন্টার ভিতর সব গাছ বিলকুল সাফ।

সে কী বীভৎস দৃশ্য!

আমাদের দেশে বন্যার জল কেটে যাওয়ার পর কখনো কখনো দেখেছি কোনো গাছের শিকড় পচে যাওয়ায় তার পাতা ঝরে পড়েছে—সমস্ত গাছ ধবলকুষ্ঠ রোগীর মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

এখানে সব গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে, নেঙ্গা সঙ্গীন আকাশের দিকে উঁচিয়ে।

দু'একদিন অন্তর অন্তর দেখতে পাই গোর দিতে মড়া নিয়ে যাচ্ছে। আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলুম কোথাও মড়ক লেগেছে কি না।

আবদুর রহমান বলল, 'না হুজুর, পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োরাও ঝরে পড়ে। এই সময়েই তারা মরে বেশি।'

খবর নিয়ে দেখলুম, শুধু আবদুর রহমান নয় সব কাবুলীরই এই বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার রীতিমত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। তার জন্য দায়ী অবশ্য আবদুর রহমানই।

আমাকে খাইয়ে দাইয়ে সে রোজ রাত্রেই কোনো একটা কাজ নিয়ে আমার পড়ার ঘরের এক

কোণে আসন পেতে বসে—কখনো বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়ায়, কখনো চাল ডাল বাছে, কখনো কাঁকুড়ের আচার বানায় আর নিতান্ত কিছু না থাকলে সব ক'জোড়া জুতো নিয়ে রঙ লাগাতে বসে।

আবদুর রহমানের জুতো বুরুশ করার কায়দা মামুলি সায়ান্স নয়, অতি উচ্চাঙ্গের আর্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার অর্ধেক মেহন্নতে মোনালিসার ছবি আঁকা যায়;

প্রথমে খবরের কাগজ মেলে তার মাঝখানে জুতো জোড়াটি রেখে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে। তারপর দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে যদি কোথাও শুকনো কাদা লেগে থাকে তাই ছাড়াবে। তারপর লাগাবে এঞ্জিনের পিস্টনের গতিতে বুরুশ। তারপর মেথিলেটেড স্পিরিটে নেকড়া ভিজিয়ে বেছে বেছে যেসব জায়গায় পুরানো রঙ জমে গিয়েছে সেগুলো অতি সন্তর্পণে ওঠাবে। তারপর কাপড় ধোয়ার সাবানের উপর ভেজা নেকড়া চালিয়ে তাই দিয়ে জুতোর উপর থেকে আগের দিনের রঙ সরাবে। তারপর নির্বিকার চিত্তে আধঘন্টাটাক বসে থাকবে জুতো শুকোবার প্রতীক্ষায়—ওয়াশের আর্টিস্টরা যে রকম ছবি শুকোবার জন্য সবুর করে থাকেন। তারপর তার রঙ লাগানো দেখে মনে হবে প্যারিস-সুন্দরীও বুঝি এত যত্নে লিপস্টিক লাগান না—তখন আবদুর রহমানের ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, প্রশ্ন শুধালে সাড়া পাবেন না। তারপর বাঁ হাত জুতোর ভিতর ঢুকিয়ে ডান হাতে বুরুশ নিয়ে কানের কাছে তুলে ধরে মাথা নিচু করে যখন ফের বুরুশ চালাবে তখন মনে হবে বেহালার ডাকসাইটে কলাবৎ সমে পৌঁছবার পূর্বে যেন দ'য়ে মজে গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছেন। তখন কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না, 'সাবাস' বললেও ওস্তাদ তেড়ে আসবেন।

সবশেষে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দেবে, মনে হবে দীর্ঘ অদর্শনের পরে প্রেমিক যেন প্রিয়ার চোখে, মুখে, কপালে, চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম দিন আমি আপন অজানাতে বলে ফেলেছিলুম 'সাবাস'।

একটি আট ন' বছরের মেয়েকে তারই সামনে আমরা একদিন কয়েকজন মিলে অনেকক্ষণ ধরে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিলুম—সে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। যখন সক্কলের বলা কওয়া শেষ হল তখন সে শুধু আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তবু তো আজ তেল মাখিনি।'

আবদুর রহমানের মুখে ঠিক সেই ভাব।

গোড়ার দিকে প্রায়ই ভেবেছি ওকে বলি যে সে ঘরে বসে থাকলে আমার অস্বস্তি বোধ হয়, কিন্তু প্রতিবারেই তার স্বচ্ছন্দ সরল ব্যবহার দেখে আটকে গিয়েছি। শেষটায় স্থির করলুম, ফার্সীতে যখন বলেছে এই দুনিয়া মাত্র কয়েকদিনের মুসাফিরী ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আমার ঘরে আর সরাইয়ের মধ্যে তফাত কোথায়? এবং আফগান সরাই যখন সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতায় প্যারিসকেও হার মানায় তখন কমরেড আবদুর রহমানকে এ-ঘর থেকে ঠেকিয়ে রাখি কোন হক্কের জোরে? বিশেষত সে যখন আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাদামের খোসা ছাড়াতে পারে, তবে আমিও বা তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রাশান ব্যাকরণ মুখস্থ করতে পারব না কেন?

আবদুর রহমান ফরিয়াদ করে বলল, আমি যে মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে টেনিস খেলা কমিয়ে দিয়ে রাশান রাজদূতাবাসে খেলতে আরম্ভ করেছি সেটা ভালো কথা নয়।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, মুইন-উস্-সুলতানের কোর্টে টেনিসের বল যেরকম শক্ত, এক মুইন-উস্-সুলতানেকে বাদ দিলে আর সকলের হৃদয়ও সে রকম শক্ত—রাশান রাজদূতাবাসের বল যে রকম নরম, হৃদয়ও সে রকম নরম।

আবদুর রহমান ফিসফিস করে বলল, 'আপনি জানেন না হুজুর ওরা সব 'বেদীন, বেমজহব'। অর্থাৎ ওদের সব কিছু 'ন দেবায় ন ধর্মায়।'

আমি ধমক দিয়ে বললুম, 'তোমাকে ওসব বাজে কথা কে বলেছে?'

সে বলল, 'সবাই জানে হুজুর; ওদেশে মেয়েদের পর্যন্ত হায়াশরম নেই, বিয়ে-শাদী পর্যন্ত উঠে

গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'তাই যদি হবে তবে বাদশা আমান উল্লা তাদের এদেশে ডেকে এনেছেন কেন?' ভাবলুম এই যুক্তিটাই তার মনে দাগ কাটবে সবচেয়ে বেশি।

আবদুর রহমান বলল, 'বাদশা আমান উল্লা তো—' বলে থেমে চুপ করে রইল।

পরদিন টেনিস খেলার দু'সেটের ফাঁকে দেমিদফকে জানালুম, প্রলেতারিয়া আবদুর রহমান ইউ. এস. এস আর. সম্বন্ধে কী মতামত পোষণ করে। দেমিদফ বললেন, 'আফগানিস্থান সম্বন্ধে আমরা বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই। তবে তুর্কিস্থান অঞ্চলে আমাদের একটু আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছে বলে আমাদের চিন্তাপদ্ধতি কর্মধারা একটু অতিরিক্ত ঘোলাটে হয়ে আফগানিস্থানে পৌঁচচ্ছে। আমরা উপর থেকে তুর্কিস্থানের কাঁধে জোর করে নানা রকম সংস্কার চাপাতে চাইনে, আমরা চাই তুর্কিস্থান যেন নিজের থেকে আপন মঙ্গলের পথ বেছে নিয়ে বাকি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।'

দেমিদফের স্ত্রী বললেন, 'বুখারার আমির আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ শোষকসম্প্রদায় বলশেভিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যহারা হয়ে পালিয়ে এসে এখানে বাসা বেঁধেছে। তারা যে নানা রকম প্রোপাগাণ্ডা চালাতে কসুর করছে না, তা তো জানেনই।'

আমি কমিউনিজমের কিছুই জানিনে, কিন্তু এঁদের কথা বলার ধরণ, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞের প্রতি সহিষ্ণুতা, আপন আদর্শে দৃঢ়বিশ্বাস আমাকে সত্যই মুগ্ধ করল।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করল রাজদূতাবাসের ভিতর এঁদের সামাজিক জীবন। অন্যান্য রাজদূতাবাসে বড়কর্তা, মেজকর্তা ও ভদ্রেতরজনে তফাত যেন গৌরীশঙ্কর, দুমকা পাহাড় আর উইয়ের ঢিপিতে। এখানে যে কোনো তফাত নেই, সে কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, কিন্তু সে পার্থক্য কখনো রূঢ় কর্কশরূপে আমার চোখে ধরা দেয়নি।

কত অপরাহ্ণ, কত সন্ধ্যা কাটিয়েছি দেমিদফের বসবার ঘরে। তখন এম্বেসির কত লোক সেখানে এসেছেন, পাপিরসি টেনেছেন, গল্প-গুজব করেছেন। তাদের কেউ সেক্রেটারি, কেউ ডাক্তার, কেউ কেরানি, কেউ আফগান এয়ারফোর্সের পাইলট—দেমিদফ স্বয়ং রাজদূতাবাসের কোষাধ্যক্ষ। সকলেই সমান খাতির-যত্ন পেয়েছেন; জিজ্ঞেস না করে জানবার কোনো উপায় ছিল না যে, কে সেক্রেটারি আর কে কেরানী।

খোদ অ্যামবেসডর অর্থাৎ রুশ রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রতিভূ তাভারিশ স্ট্রেঙ পর্যন্ত সেখানে আসতেন। প্রথম দর্শনে তো আমি বগদানফ সায়েবের তালিম মত খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে শেকহ্যাণ্ড করে বললুম, 'I am honoured to meet your Excellency!' কিন্তু আমার চোস্ত ভদ্রতায় একসেলেন্সি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে জোর হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতখানা তলোয়ারের মত এমনি ধারা চালালেন যে, আমার সমস্ত ভদ্রস্থতা যেন দু'টুকরো হয়ে কার্পেটে লুটিয়ে পড়ল।

মাদাম দেমিদফ বললেন, 'ইনি রুশ সাহিত্যের দরদী।'

কোনো ইংরেজ বড়কর্তা হলে বলতেন 'রিয়েলি? হাউ ইন্টারেস্টিং!' তারপর আবহাওয়ার কথাবার্তা পাড়তেন।

স্ট্রেঙ বললেন, 'তাই নাকি, তা হলে বসুন আমার পাশে, আপনার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা হবে।' আর সকলে তখন আপন আপন গল্পে ফিরে গিয়েছেন। স্ট্রেঙ প্রথমেই অসঙ্কোচে গোটাকয়েক চোখা চোখা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার বিদ্যের চৌহদ্দি জরিপ করে নিলেন তারপর পুশকিনের গীতিকাব্য-রস আমাকে মূল থেকে আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলেন। যে অংশ বেছে নিলেন সেও ভারী মরমিয়া। ওনিয়েগিন সংসারে নানা দুঃখ, নানা আঘাত পেয়ে তাঁর প্রথমা প্রিয়ার কাছে ফিরে এসে প্রেম নিবেদন করছেন; উত্তরে প্রিয়া প্রথম যৌবনের নষ্ট দিবসের কথা ভেবে বলছেন, 'ওনিয়েগিন, হে আমার বন্ধু, আমি তখন তরুণী ছিলুম, হয়ত সুন্দরীও ছিলুম'—

আমাদের দেশের রাধা যে রকম একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, আমার এই নতুন বয়সের কালে।'

আমি তন্ময় হয়ে শুনলুম। আবৃত্তি শেষ হলে ভাবলুম, বরঞ্চ একদিন শুনতে পাব স্বয়ং চার্চিল হেদোর পারে লঙ্কা-ঠাসা চীনেবাদাম খেয়ে সশব্দে ডাইনে বাঁয়ে নাক ঝাড়ছেন, কিন্তু মহামান্য বৃটিশ রাজদূত প্রথম দর্শনে অভ্যাগতকে কীটসের 'ইসাবেলা' শোনাচ্ছেন, এ যেন 'বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভাসি যায়, দেখিলেও না করো প্রত্যয়।'

বৃটিশ রাজদূতকে হামেশাই দেখেছি স্ট্রাইপ্ট ট্রাউজার আর স্প্যাট পরা। ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে যেন স্বয়ং পঞ্চম জর্জের মামাতো ভাই। নিতান্ত দৈবদুর্বিপাকে এক দুশমনের পুরীতে বড় অনিচ্ছায় কাল কাটাচ্ছেন। 'কীটস কে, অথবা কারা---পিছনে যখন বহুবচনের 'এস' রয়েছে? পাশপোর্ট চায় নাকি? বলে দাও, ওসব হবে-টবে না।'

এমন কি, ফরাসি রাজদূতকেও কখনো বগদানফের ঘরে আসতে দেখিনি। বেনওয়া তাঁর কথা উঠলেই বলতেন, 'কার কথা বলছেন? মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ লিগেশন ইন কাবুল? ম দিয়ো! উনি হচ্ছেন মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ লিগেশন ইন মাবুল—'

'মাবুল' অর্থ অভিধানে লেখে, Loony, off his nut'

স্ট্রেঙ বললেন, তিনি রাজদূতাবাসের সাহিত্যসভাতে চেখফ সম্বন্ধে একখানা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। শুনে তো আমার চোখের তারা ছিটকে পড়ার উপক্রম। আরেকটা লিগেশনের কথা জানি, সেখানে চড়ুই পাখি শিকার সম্বন্ধে প্রবন্ধ চললেও চলতে পারে, কিন্তু চেখফ, বাই গ্যাড, স্যার!

আমি বললুম, 'রাশান শেখা হলে আপনার প্রবন্ধটি অনুবাদ করার বাসনা রাখি।'

স্ট্রেঙ বললেন, 'বিলক্ষণ। আপনাকে একটা কপি পাঠিয়ে দেব। কোনো স্বত্ব সংরক্ষিত নয়।'

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলুম আর পাঁচজন তখন বড়কর্তার মুখের কথা লুফে নেবার জন্য চতুর্দিকে ঝুলে থাকেননি। ছোট্ট ছোট্ট দল পাকিয়ে সবাই আপন আপন গল্প নিয়ে মশগুল ছিলেন। আর সকলে কী নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, ঠিক ঠিক বলতে পারিনে, তবে একটা কথা নিশ্চয় জানি যে, তারা ড্রইংরুমে বসে চাকরের মাইনে, ধোপার গাফিলি আর মাখনের অভাব নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চালাতে পারেন না।

নিতান্ত ছোট জাত। আর শুধু কি তাই, এমনি বজ্জাত যে, সে কথাটা ঢাকবার পর্যন্ত চেষ্টা করে না!

সাধে কি আর ইংরেজের সঙ্গে এদের মুখ দেখা পর্যন্ত বন্ধ!

ইংরেজ তখন মস্কো বাগে দূরবীন লাগিয়ে স্তালিন আর ত্রৎস্কির দলের মোষের লড়াই দেখছে, আর দিন গুণছে ইউ. এস. এস. আরের তেরোটা বাজবে কখন।

এ সব হচ্ছে ১৯২৭ সালের কথা।

উনত্রিশ

কবি বলেছেন, 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে।' আমান উল্লা ইয়োরোপ ভ্রমণে বেরলেন, আমিও শীতের দু'মাসের ছুটি পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু সত্যযুগ নয় বলে প্রবাদের মাত্র আধখানা ফলল—আমি ইয়োরোপ গেলুম না, গেলুম দেশে।

উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না, কিন্তু ভারতবর্ষে দেখি আমান উল্লার ইয়োরোপ ভ্রমণ নিয়ে সবাই ক্ষেপে উঠেছে। আমান উল্লার সম্মানে প্রাচ্য ভারতবাসী যেন নিজের সম্মান অনুভব করছে।

আমাকে ধরল হাওড়া স্টেশনে কাবুলী পাজামা আর পেশাওয়ারের টিকিট দেখে---হয়ত লাণ্ডিকোটাল থেকে খবরও পেয়েছিল। তন্ন তন্ন করে সার্চ করলো অনেকক্ষণ ধরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

দেখল তারও বেশিক্ষণ ধরে, যেন আমি মেকি সিক্কিটা। কিন্তু আমি যখন কাবুলের কাস্টম হৌসে তালিম পেয়েছি, তখন ধৈর্যে আমাকে হারাতে পারে কোন বাঙালী অফিসার! খালাস পেয়ে অজানাতে তবু বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা গেরো রে বাবা!'

বাঙালী অফিসার চমকে উঠলেন, বললেন, 'দাঁড়ান, আপনি বাঙালী, তাহলে আরো ভালো করে সার্চ করি।'

বললুম, 'করুন, আমার নাম কমলাকান্ত।'

দেশে পৌঁছে মাকে দিলুম এক সুটকেসভর্তি বাদাম, পেস্তা—অষ্টগণ্ডা পয়সা খরচ করে কাবুল শহরে কেনা। মা পরমানন্দে পাড়ার সবাইকে বিলোলেন। পাড়াগাঁয়ে যে বোনটির বিয়ে হয়েছিল, সেও বাদ পড়ল না।

কিন্তু থাক। সাত মাস কাবুলে কাটিয়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি যে, বাঙালী কাবুলীর চেয়ে ঢের বেশি হুঁশিয়ার। তারা যে আমার এ-বই পয়সা খরচ করে কিনবে, সে আশা কম। তাই ভাবছি, এ দু'মাসের গর্ভাঙ্কটা 'সফর-ই-হিন্দ' নাম দিয়ে ফার্সীতে ছাপাবো। তাই দিয়ে যদি দু'পয়সা হয়। কাবুলী কিনুক আর নাই কিনুক, উদ্যমটার প্রশংসা নিশ্চয়ই করবে। কারণ ফার্সীতেই প্রবাদ আছে—

'খর বাশ ও খুক বাশ ও ইয়া সগে মুরদার বাশ।
হরচে বাশী বাশ আম্মা আন্দকী জারদার বাশ।'

'হও না গাধা, হও না শুয়োর, হও না মরা কুকুর।
যা ইচ্ছে হও কিন্তু রেখো বত্তি সোনাটুকুর।'

ত্রিশ

ফিরে দেখি সর্বত্র বরফ, দোরের গোড়ায় আবদুর রহমান আর ঘরের ভিতর গনগনে আগুন। আমি তখন শীতে জমে গিয়েছি।

আবদুর রহমান হাসিমুখে আমার হাতে চুমো খেল, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। 'দাঁড়ান হুজুর' বলে আমাকে কোলে করে এক লাফে উঠোনে নেবে গেল। এক মুঠো পেঁজা বরফ হাতে নিয়ে আমার নাক আর কানের ডগা সেই বরফ দিয়ে ঘন ঘন ঘষে আর ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে 'চিন্ চিন্' করছে কিনা। আমি ভাবলুম, এও বুঝি পানশিরের কোনো জংলী অভ্যর্থনার আদিখ্যেতা। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'চল, চল, ঘরেব ভিতর চল, শীতে আমার হাড়মাস জমে গিয়েছে।' আবদুর রহমান কিন্তু তখনো তার শালপ্রাংশু মহাবাহু দিয়ে আমাকে এমনি জড়িয়ে ধরে দু'কানে বরফ ঘষছে যে, আমি কেন, কিঙ্কড় সিংয়েরও সাধ্যি নেই যে, সে-ব্যূহ ছিন্ন করে বেরতে পারে। আবদুর রহমান শুধু বরফ ঘষে আর একটানা মন্ত্রোচ্চারণের মত শুধায়, 'চিন্ চিন্ করছে, চিন্ চিন্ করছে' শেষটায় অনুভব করলুম সত্যিই নাক আর কানের ডগায় ঝিঁ ঝিঁ ছাড়ার সময় যে রকম চিন্ চিন্ করে সে রকম হতে আরম্ভ করেছে। আবদুর রহমানকে সে খবরটা দেওয়া মাত্রই সে আমাকে কোলে করে আরেক লাফে ঘরে ঢুকল, কিন্তু বসাল আগুন থেকে দূরে ঘরের আরেক কোণে। রোদে-পোড়া মোষ যে রকম কাদার দিকে ধায়, আমিও সেই রকম আগুনের দিকে যতই ধাওয়া করি, আবদুর রহমান ততই আমাকে ঠেকিয়ে রেখে বলে, 'সর্বাঙ্গে রক্তচলাচল শুরু হোক হুজুর, তারপর যত খুশি আগুন পোয়াবেন।'

ততক্ষণে সে আমার জুতো খুলে পায়ের আঙুলগুলো পরখ করে দেখছে সেগুলোর রঙ কতটা নীল। আবদুর রহমানের চেহারা থেকে আন্দাজ করলুম নীল রঙের প্রতি তার গভীর বিতৃষ্ণা। ঘষে ঘষে আঙুলগুলোকে যখন বেশ বেগুনি করে ফেললো তখন সে চেয়ারসুদ্ধু আমাকে আগুনের পাশে এনে বসাল। আমি ততক্ষণে দস্তানা খুলতে গিয়ে দেখি কমলী ছোড়তে চায় না—আঙুল ফুলে কলাগাছ

্যে গিয়েছে। দুষ্টু ছেলে যেরকম খাওয়ার সময় মাকে পেট কামড়ানোর খবর দেয় না আমিও ঠিক সেই রকম আঙুল ফোলার খবরটা চেপে গেলুম। সরল আবদুর রহমান ওদিকে আমার পায়ের তদারক করছে, আমি এদিকে আগুনের সামনে হাত বাড়িয়ে আরাম করে দেখি, কলাগাছ বটগাছ হতে চলেছে। ততক্ষণে আবদুর রহমান লক্ষ্য করে ফেলেছে যে আমার হাত তখনো দস্তানা-পরা। টমাটোর মত লাল মুখ করে আমাকে শুধাল, 'হাতের আঙুলও যে জমে গিয়েছে সে কথাটা আমায় বললেন না কেন?' এই তার প্রথম রাগ দেখলুম। ভৃত্য আবদুর রহমানের গলায় আমির আবদুর রহমানের গলা শুনতে পেলুম। আমি চিঁ চিঁ করে কী একটা বলতে যাচ্ছিলুম। আমার দিকে কান না দিয়ে বলল, 'চা খাওয়ার পরও যদি দস্তানা না খোলে তবে আমি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলব।'

আমি শুধালুম, 'কী কাটবে? হাত না দস্তানা?'

আবদুর রহমান অত্যন্ত বেরসিক। আমি আরো ঘাবড়ে গেলুম।

কিন্তু শুধু আমিই ঘাবড়াইনি। দস্তানা পর্যন্ত আবদুর রহমানের গলা শুনে বুঝতে পেরেছে যে, সে চটে গেলে দস্তানা, দস্ত কাউকে আস্ত রাখবে না। চায়ের পেয়ালায় হাত দেবার পূর্বেই অক্টোপাশের পঞ্চপাস খসে গেল।

সে রাত্রে আবদুর রহমান আমাকে সাত-তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে আপন হাতে বিছানায় শুইয়ে দিল। লেপের তলায় আগেই গরম জলের বোতল ফ্ল্যানেলে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটাতে পা ঠেকিয়ে আমি মুনি-ঋষিদের সিংহাসনে পদাঘাত করার সুখ অনুভব করলুম। পেটের ভিতরে চর্বির সুরুয়া, লেপে-চাপা গরম বোতলের ওম, আর আবদুর রহমানের বাঘের থাবার ডলাই-মলাই তিনে মিলে এক পলকেই চোখের পলক বন্ধ করে ফেলেছিলুম।

সমস্ত কাহিনীটি যে এত বাখানিয়া বললুম তার প্রধান কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-বই কোনো দিন কারো কাজে লাগবে না। আর আজকের দিনের ভারতদণ্ডিন কমিউনিস্টরা বলেন, যে আর্ট কাজে লাগে না সে আর্ট আর্টই নয়। অর্থাৎ শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি দেয়ালে মশারির পেরেক পোঁতা না যায় তবে সে শিবলিঙ্গের 'কোনো গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

তবু যদি কোনো দিন পাকেচক্রে ফ্রস্টবিটন হন তবে প্রলেতারিয়ার প্রতীক ওঝা আবদুর রহমানকে স্মরণ করে তার দাওয়াই চালাবেন। সেরে উঠবেন নিশ্চয়ই, এবং তখন যেন আপনার কৃতজ্ঞতা আবদুর রহমানের দিকে ধায়। আবদুর রহমানের প্রাপ্য প্রশংসা আমি কেতাবের মালিকরূপে কেড়ে নিয়ে 'শোষক' 'বুর্জুয়া' নামে পরিচিত হতে চাইনে।

পরদিন সকালবেলা দেখি, তিন মাইল বরফ ভেঙ্গে বৃদ্ধ মির আসলম এসে উপস্থিত। বললেন, 'আত্মজনের বাচনিকে অবগত হইলাম তুমি কল্য রজনীর প্রথম যামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। কুশল-সন্দেশ কহ। শৈত্যাধিক্যে পথিমধ্যে অত্যধিক ক্লেশ হয় নাই তো?'

আমি আবদুর রহমানের সালঙ্কার বর্ণনা দিলে মির আসলম বললেন, 'নাতিদীর্ঘদিবস তথা শর্বরীর প্রথম যামই স্বতশ্চলশকটারোহীকে শিশির-বিদ্ধ করিতে সক্ষম। কৃশানুসংশ্রব হইতে রক্ষা করিয়া তোমার পরিচারক বিচক্ষণের কর্ম করিয়াছে। অপিচ লক্ষ্য করো নাই, স্বদেশে আতপতাপে দগ্ধ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন মাত্রই সুশীলা জননী তদ্দণ্ডেই শীতল জল পান করিতে নিষেধ করেন, অবগাহনকক্ষ উন্মোচন করেন না? সঙ্কটদ্বয় আয়ুর্বেদের একই সূত্রে গ্রথিত।'

হক্ কথা।

বললুম, 'ইয়োরোপে আমান উল্লার সম্বর্ধনা নিয়ে হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমান বড়ই গর্ব অনুভব করছে।'

মীর আসলম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বিদেশে সম্মান-প্রাপ্ত নৃপতির সম্মান স্বদেশে লাঘব হয়।' এ যেন চাণক্য শ্লোকের তৃতীয় ছত্র। ভাবলুম জিজ্ঞেস করি, মহাশয় ভারতবর্ষে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন

করেছিলেন, মুসলমানী না হিন্দুয়ানী, কিন্তু চেপে গিয়ে বললুম, 'আমান উল্লা বিদেশে সম্মান পাওয়াতে স্বদেশে সংস্কার-কর্ম করবার সুবিধা পাবেন না?'

মির আসলম বললেন, 'সংস্কার-পঙ্কে যে নৃপতি কণ্ঠমগ্ন, বৈদেশিক সম্মানমুকুটের গুরুভার তাঁহাকে অধিকতর নিমজ্জিত করিবে।'

আমি বললুম, 'রানী সুরাইয়াকে দেখবার জন্য প্যারিসের ছেলে-বুড়ো পর্যন্ত রাস্তায় ভিড় করে ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

মির আসলম বললেন, 'ভদ্র, অদ্য যদি তুমি তোমার পদদ্বয়ের ব্যবহার পরিত্যাগপূর্বক মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হও তবে তোমার মত স্বল্পপরিচিত মনুষ্যেরও এবম্বিধ বাতুলতা নিরীক্ষণ করিবার জন্য কাবুলহট্ট সম্মিলিত হইবে।'

আমি বললুম, 'কী মুশকিল, তুলনাটা আদপেই ঠিক হল না, রানী তো আর কোনোরকম পাগলামি করছেন না।'

মির আসলম বললেন, 'মুসলমান রমণীর পক্ষে তুমি অন্য কোন বাতুলতা প্রত্যাশা করো? অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রশস্ত রাজবর্ত্মে কোন মুসলমান রমণী এবম্বিধ অশাস্ত্রীয় কর্ম করিতে পারে?'

আমি বললুম, 'আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি কুরান-হদীস পড়েছেন; মুখ দেখানো তো আর কুরান-হদীসে বারণ নেই।'

মিব আসলম বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে অবান্তর। পার্বত্য উপজাতির শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে প্রযোজ্য। তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।'

আমি আলোচনাটা হাল্কা করবার জন্য বললুম, 'জানেন, ফরাসী ভাষায় 'সুরীর' শব্দের অর্থ 'মৃদু হাস্য।' রানী সুরাইয়ার নাম তাই প্যাবিসের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।'

মির আসলম বললেন, 'আমির হবীব উল্লার নামের অর্থ 'প্রিয়তম বান্ধব'; ইংরেজ শতবার এই শব্দার্থের প্রতি আমিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ শপথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যখন শত্রুহস্তের লৌহকীলক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, তখন হবীব উল্লার কোন 'হবীব' তাঁহাকে স্মরণ করিল? অপিচ, হবীব উল্লার হবীববর্গই তাঁহাকে পুলসিরাতের (বৈতরণীর) প্রান্তদেশে অকারণে, অসময়ে দণ্ডায়মান করাইয়া দিল।'

আমি বললুম, 'ও তো পুরোনো কাসুন্দি। কিন্তু ঠিক করে বলুন তো আপনি কি আমান উল্লার সংস্কার পছন্দ করেন না?'

বললেন, 'বৎস, গুরুর পদসেবা করিয়া আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমি শিক্ষাসংস্কারের বিরুদ্ধে কেন দণ্ডায়মান হইব? কিন্তু আমান উল্লা যে ফিরিঙ্গি-শিক্ষা প্রবর্তনাভিলাষী, আমি তাহা ভারতবর্ষে দর্শন করিয়া ঘৃণাবোধ করিয়াছি। কিন্তু ভদ্র, তোমার সুমিষ্ট চৈনিক যূষ পরিত্যাগ করিয়া এই তিক্ত বিষয়ের আলোচনায় কী লভ্য? যূষপত্র কি তুমি স্বদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছ? গুরুগৃহের সুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে।'

আমি বললুম, 'আপনার জন্যও এক প্যাকেট এনেছি।'

মির আসলম সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু ভদ্র, শুল্কদ্ধরণিকের ন্যায্য প্রাপ্য অর্পণ করিয়াছ সত্য?'

আমি বললুম, 'আপনার কোনো ভয় নেই। কাবুল কাস্টম হৌসকে ফাঁকি দেবার মত এলেম আমার পেটে নেই। বিছানার ছারপোকাকে পর্যন্ত সেখানে পাসপোর্ট দেখাতে হয়, মাশুল দিতে হয়। আমি তাদের সব অন্যায্য দাবিদাওয়া কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করেছি। আপনাকে হারাম খাইয়ে আমি কি আখেরে জাহান্নামে যাব?'

মির আসলম আমাকে শীতকালে কোন কোন বিষয়ে সাবধান হতে হয় সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ

দিলেন, আবদুর রহমানকে ডেকে ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সম্বন্ধে নানা সুযুক্তি দিয়ে বিদায় নিলেন।

খবর পেয়ে তারপর এলেন মৌলানা। আমি আমান উল্লার বিদেশে সম্মান পাওয়া, আর সে সম্বন্ধে মির আসলমের মন্তব্য তাঁকে বললুম। মৌলানা বললেন, 'আমান উল্লা যাদের কথায় চলেন, তারা তো বাদশাহের সম্মানে নিজেদের সম্মানিত মনে করছে। তারা বলছে, মুস্তাফা কামাল যদি তুর্কীকে, রেজা শাহ যদি ইরানকে প্রগতির পথে চালাতে পারেন তবে আমান উল্লাই বা পারবেন না কেন?' এই হল তাদের মনের ভাব, কথাটা খুলে বলার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। কারণ কোনো রকম বাধাও তো কেউ দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু মৌলানা, কতকগুলো সংস্কারের প্রয়োজন আমি মোটেই বুঝে উঠতে পারিনে। এই ধরো না, শুক্রবারের বদলে বৃহস্পতিবার ছুটির দিন করা।'

মৌলানা বললেন, 'শুক্রবার ছুটির দিন করলে জুম্মার নমাজের হিড়িকে সমস্ত দিনটা কেটে যায়, ফালতো কাজকর্ম করার ফুরসত পাওয়া যায় না। তাই আমান উল্লা দিয়েছেন সমস্ত বৃহস্পতিবার দিন ছুটি আর শুক্রবারে জুম্মার নমাজের জন্য আধ ঘন্টার বদলে এক ঘণ্টা ছুটি। কিন্তু জানো, আমি আরেকটা কারণ বের করেছি। এই দেখ না এ্যারোপ্লেনে করে যদি তুমি শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন বুধবারে বেরোও, এখানে পৌঁছবে ছুটির দিন বৃহস্পতিবার, তারপর ইরাক পৌঁছবে শুক্রবারে সেও ছুটির দিন, তারপরের দিন প্যালেস্টাইনে সেখানে ইহুদীদের জন্য শনিবারে ছুটি, তারপরের দিন রবিবারে ইয়োরোপ, তারপরের দিন সাউথ-সী-আয়লেণ্ডে, সেখানে তো তামাম হপ্তা ছুটি।'

আমি বললুম, 'উত্তম আবিষ্কার করেছ, কিন্তু বেশ কিছু দিনের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছ তো? না হলে বরফ ভেঙে কাবুলে ফিরবে কী করে?'

মৌলানা বললেন, 'দু-একদিনের মধ্যেই বরফের উপর পায়ে চলার পথ পড়ে যাবে; আসতে যেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমি চললুম দেশে বউকে নিয়ে আসতে। বেনওয়া সায়েব মত দিয়েছেন, তুমি কী বল?'

আমি শুধালুম, 'বউ রাজী আছেন?' মৌলানা বললেন, 'হ্যাঁ।'

আমি বললুম, 'তবে আর কাবুল-অমৃতসরে প্লেবিসিট্ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? তোমাদেরই ভাষায় তো রয়েছে বাপু—

'মিয়া বিবি রাজী
কিয়া করে কাজী?'

মনে মনে বললুম, 'বগদানফ গেছেন, তোমার দাড়িটির দর্শনও এখন আর কিছু দিনের তরে পাব না। নতুন বউয়ের 'কা তব কান্তা' হতে অন্তত ছ'টি মাস লাগার কথা'।

মৌলানা চলে যাওয়ার পর আবদুর রহমানকে ডেকে বললুম, 'দাও তো হে কুর্সিখানা জানালার কাছে বসিয়ে, বাকি শীতটা তোমার ঐ বরফ দেখেই কাটাব।'

আবদুর রহমানের বর্ণনামাফিক সব রকমেরই বরফ পড়ল। কখনো পেঁজা পেঁজা কখনো গাদা গাদা, কখনো ঘূর্ণিবায়ুর চক্কর খেয়ে দশদিক অন্ধকার করে, কখনো অস্বচ্ছ যবনিকার মত গিরিপ্রান্তর ঝাপসা করে দিয়ে, কখনো অতি কাছে আমারই বাতায়ন পাশে, কখনো বহুদূরে সানুশ্লিষ্ট হয়ে, শিখর চুম্বন করে। আস্তে আস্তে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল, শুধু পত্রবিবর্জিত চিনার গাছের সারি দেখে মনে হয় দাঁত ভাঙা পুরোনো চিরুনিখানা ঠাকুরমা যেন দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রেখে বরফের পাকা চুল এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আবদুর রহমান মর্মাহত। আমাকে প্রতিবারে চা দেবার সময় একবার করে বাইরের দিকে তাকায় আর আর্তস্বরে বলে, 'না হুজুর, এ বরফ ঠিক বরফ নয়। এ শহুরে বরফ, বাবুয়ানি বরফ। সত্যিকার খাঁটি বরফ পড়ে পানশিরে। চেয়ে দেখুন, বরফের চাপে এখনো গেট বন্ধ হয়নি। মানুষ

এখনো দিব্যি চলাফেরা করছে, ফেঁসে যাচ্ছে না।'

আবদুর রহমানের ভয় পাছে আমাকে বোকা পেয়ে কাবুল উপত্যকা তার ভেজাল বরফ গছিয়ে দেয়। নিতান্তই যদি কিনতে হয় তবে যেন আমি কিনি আসল, খাঁটি মাল 'মেড ইন পানশির।'

একত্রিশ

শীত আর বসন্ত ঘরে বসে, ডুব সাঁতার দিয়ে কাটাতে হল।

এদেশে বসন্তের সঙ্গে আমাদের বর্ষার তুলনা হয়। সেখানে গ্রীষ্মকালে ধরণী তপ্তশয়নে পিপাসার্তা হয়ে পড়ে থাকেন, আষাঢ়স্য যে কোনো দিবসেই হোক ইন্দ্রপুরীর নববর্ষণ বারতা পেয়ে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিতা হন। এখানে শীতকালে ধরিত্রী প্রাণহীন স্পন্দন-বিহীন মহানিদ্রায় লুটিয়ে পড়েন, তারপর নববসন্তের প্রথম রৌদ্রে চোখ মেলে তাকান। সে তাকানো প্রথম ফুটে ওঠে গাছে গাছে।

দূর থেকে মনে হল ফ্যাকাশে সাদা গাছগুলোতে বুঝি কোনোরকম সবুজ পোকা লেগেছে। কাছে গিয়ে দেখি গাছে গাছে অগুণতি ছোট্ট ছোট্ট পাতার কুঁড়ি; জন্মের সময় কুকুর ছানার বন্ধ চোখের মত। তারপর কয়েকদিন লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখি সেগুলো ফুটেছে আর দুটি দুটি করে পাতা ফুটে বেরিয়েছে—গাছগুলো যেন সমস্ত শীতকাল বকপাখির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ ডানা মেলে ওড়বার উপক্রম করেছে। সহস্র সহস্র সবুজ বলাকা যেন মেলে ধরেছে লক্ষ লক্ষ অঙ্কুরের পাখা।

ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর।

গাছে গাছে দেখন-হাসি, পাতায় পাতায় আড়াআড়ি—কে কাকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে। কোনো গাছ গোড়ার দিকে সাড়া দেয়নি, হঠাৎ একদিন একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ মেলে দেখে আর সবাই ঢের এগিয়ে গেছে, সে তখন এমনি জোর ছুট লাগাল যে, দেখতে না দেখতে আর সবাইকে পিছনে ফেলে, বাজী জিতে, মাথায় আইভি মুকুট পরে সগর্বে দুলতে লাগল। এতদিন বাতাস শুকনো ডালের ভিতর দিয়ে হু-হু করে ছুটে চলে যেত, এখন দেখি কী আদরে পাতাগুলোর গায়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

কাবুল নদীর বুকের উপর জমে-যাওয়া বরফের জগদ্দল পাথর ফেটে চৌচির হল। পাহাড় থেকে নেমে এল গম্ভীর গর্জনে শত শত নব জলধারা—সঙ্গে নেমে আসছে লক্ষ লক্ষ পাথরের নুড়ি আর বরফের টুকরো। নদীর উপরে কাঠের পুলগুলো কাঁপতে আরম্ভ করেছে—সিকন্দর শাহের আমল থেকে তারা হাঁটু ভেঙে কতবার নুয়ে পড়েছে, ভেসে গিয়েছে, ফের দাঁড়িয়ে উঠেছে তার হিসেব কেউ কখনো রাখতে পারেনি।

উপরে তাকিয়ে দেখি গভীর নীলাম্বুজের মত নবীন নীলাকাশ হংসশুভ্র মেঘের ঝালর ঝুলিয়ে চন্দ্রাতপ সাজিয়েছে।

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি সবুজের বন্যায় জনপদ অরণ্য ডুবে গিয়েছে। এ রকম সবুজ দেখেই পূর্ববঙ্গের কবি প্রিয়ার শ্যামল রঙের স্মরণে বলেছিলেন—

ও বন্ধুয়া, কোন বন-ধোওয়া ছাঁওলা নীলা পানি,
গোসল করি হইলা তুমি সকল রঙের রানী।

কিন্তু এ-উপত্যকা এ-বনরাজি এ-রকম সবুজ পেল কোথা থেকে?

নীলাকাশের নীল আর সোনালী রোদের হলদে মিশিয়ে।

কিন্তু আমাদের বর্ষা আর এদেশের বসন্তে একটা গভীর পার্থক্য রয়েছে। বর্ষায় আমাদের মন ঘরমুখো হয়, এদেশের জনপ্রাণীর মন বাহিরমুখো হয়। গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে সুপ্তোত্থিত নব যৌবনের স্পন্দন অনুভব করে, তারই স্মরণে কবি বলেছেন—

শপথ করিনু রাত্রে পাপ পথে আর যেন মন নাহি ধায়,
প্রভাত দ্বারেতে দেখি শপথঘ্ন মধুঋতু কী করি উপায়!

শুধু ওমর খৈয়াম দোটানার ভিতর থাকা পছন্দ করেন না। তিনি গর্জন করে বললেন—

বিধিবিধানের শীতপরিধান
ফাগুন আগুনে দহন করো।
আয়ুবিহঙ্গ উড়ে চলে যায়
হে সাকি, পেয়ালা অধরে ধরো।*

কাবুলীরা তাই বেরিয়ে পড়েছে, না বেরিয়ে উপায়ও নেই—শীতের জ্বালানী কাঠ ফুরিয়ে এসেছে, দুম্বা ভেড়ার জাবনা তলায় এসে ঠেকেছে, শুটকি মাংসে পোকা কিলবিল করছে। এখন আতপ্ত বসন্তের রোদ্দে শরীরকে কিঞ্চিৎ তাতানো যায়, দুম্বা ভেড়া কচি ঘাসে চরানো যায় আর আধখেঁচড়া শিকারের জন্য দু'চার দল পাখিও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। আবদুর রহমান বলল, পানশির অঞ্চলে ভাঙা বরফের তলায় কী এক রকমের মাছও নাকি এখন ধরা যায়। অনুমান করলুম, কোনো রকমের স্প্রিং ট্রাউটই হবে।

রথ দেখার সময় যাঁরা কলা বেচার দিকেও মাঝে মাঝে নজর দেন তাঁদের মুখে শুনেছি কুবের যে যক্ষকে ঠিক একটি বৎসরের জন্যই নির্বাসন দিয়েছিলেন তার একটা গভীর কারণ আছে। ছয় ঋতুতে ছয় রকম করে প্রিয়ার বিরহযন্ত্রণা ভোগ না করা পর্যন্ত মানুষ নাকি পরিপূর্ণ বিচ্ছেদবেদনার স্বরূপ চিনতে পারে না, আর বিদগ্ধ জনকে এক বছরের বেশি শাস্তি দেওয়াতেও নাকি কোনো সূক্ষ্ম চতুরতা নেই—সোজা বাঙলায় তখন তাকে বলে মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া মাত্র।

আফগান সরকার অযথা বিঘ্ন-সন্তোষী নন বলে ছয়টি ঋতু পূর্ণ হওয়া মাত্রই আমাকে পাণ্ডব-বর্জিত গণ্ডগ্রামের নির্বাসন থেকে মুক্তি দিয়ে শহরে চাকবি দিলেন। এবারে বাসা পেলুম লব-ই-দরিয়ায় অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে, রাশান দূতাবাসের গা ঘেঁষে, বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে একই বাড়িতে।

প্রকাণ্ড সে বাড়ি। ছোটখাট দুর্গ বললেও ভুল হয় না। চারদিকে উঁচু দেয়াল, ভিতরে চকমেলানো একতলা দোতলা নিয়ে ছাব্বিশখানা বড় বড় কামরা। মাঝখানের চত্বরে ফুলের বাগান, জলের ফোয়ারাটা পর্যন্ত বাদ যায়নি। বড় লোকের বাড়ি সরকারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে—বেনওয়া সায়েব ফন্দি-ফিকির করে বাড়িটা বাগিয়েছিলেন।

আমি নিলুম এক কোণে চারটে ঘর আর বেনওয়া সায়েব রইলেন আরেক কোণে আর চারটে ঘর নিয়ে। বাকি বাড়িটা খাঁ খাঁ করে, আর সে এতই প্রকাণ্ড যে আবদুর রহমানের সঙ্গীতরবও কায়ক্লেশে আঙিনা পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছয়।

শহরে এসে গুষ্টিসুখ অনুভব করার সুবিধে হল। রাশান রাজদূতাবাসে রোজই যাই—দু'দিন না গেলে দেমিদফ এসে দেখা দেন—সইফুল আলম মাঝে মাঝে টুঁ মেরে যান, সোমত্থ বউ সম্বন্ধে অহরহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মৌলানার দাড়ির দর্শনও মাঝে মাঝে পাই, দোস্ত মুহম্মদ ঘূর্ণিবায়ুর মত বেলা-অবেলায় চক্কর মেরে বেড়াবার সময় 'কলাডা মুলাডা' ফেলে যান, বিদগ্ধ মীর আসলম সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক যূষ পান করে যান, তাছাড়া ইনি উনি তিনি তো আছেনই আর নিতান্ত বান্ধব বাড়ন্ত হলে বিরহী যক্ষ বেনওয়া তো হাতের নাগাল।

রাশান রাজদূতাবাসে আরো অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল; দেমিদফকে বাদ দিলে সক্কলের পয়লা নাম করতে হয় বলশফের। নামের সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে তাঁর দেহ—ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশুমহাবাহু বললে আবদুর রহমান বরঞ্চ অপাংক্তেয় হতে পারে, ইনি সে বর্ণনা গলাধঃকরণ

* অনুবাদকের নাম মনে নেই বলে দুঃখিত।

করে অনায়াসে সেকেণ্ড হেল্পিঙ চাইতে পারেন।

আবদুর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময় যে দ্বিতীয় নরদানবের কথা বলেছিলুম ইনিই সেই বিভীষিকা।

বহুবার এঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি—কাবুল বাজারের মত পপুলার লীগ অব নেশনসে আজ পর্যন্ত এমন দেশী বিদেশী চোখে পড়েনি যে তাঁকে দেখে হকচকিয়ে যায়নি।

হুঁশিয়ার সোয়ার হলে তক্ষুনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে—বহু ঘোড়াকে ঘাবড়ে গিয়ে সামনের পা দুটো আকাশে তুলতে দেখেছি।

টেনিস-কোর্টে র‍্যাকেট নিয়ে নামলে শত্রুপক্ষ 'বেজ-লাইনের' দশ হাত দূরে তারের জালের গা ঘেঁষে দাঁড়াত। বলশফ 'বেজে' দাঁড়ালে তাঁর কোনো পার্টনার নেটে দাঁড়াতে রাজি হত না, শত্রুপক্ষের তো কথাই ওঠে না। তাঁতের র‍্যাকেট ঘন ঘন ছিঁড়ে যেত বলে অ্যালুমিনিয়ম জাতীয় ধাতুর র‍্যাকেট নিয়ে তিনি তাড়ু হাঁকড়াতেন, স্বচ্ছন্দে নেট ডিঙোতে পারতেন—লাফ দেবার প্রয়োজন হত না—আর ঝোলা নেট টাইট করার জন্য এক হাতে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেন, মেয়েরা যে রকম সেলাই কলের হাতল ঘোরায়।

শুনেছি বিলেতে কোনো কোনো ফিলম্ নাকি ষোলো বছরের কম বয়স হলে দেখতে দেয় না—চরিত্রদোষ হবে বলে। যাদের ওজন একশ' পাউণ্ডের কম তাদের ঠিক তেমনি বলশফের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করা বারণ ছিল, পাছে হাতের নড়া কাঁধ থেকে খসে যায়। মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

বীরপুরুষ হিসাবে রাশান রাজদূতাবাসে বলশফের খ্যাতি ছিল। ১৯১৬ সাল থেকে বলশেভিক বিদ্রোহের শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে বিদেশে বিস্তর লড়াই লড়েছেন। ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে যখন রুশবাহিনী পোল্যাণ্ডে লড়াই হেরে পালায় তখন বলশফ রাশান ক্যাভালরিতে ছোকরা অফিসার। সেবারে ঘোড়ায় চড়ে পালাবার সময় তার পিঠের চোদ্দ জায়গায় জখম হয়েছিল—বিস্তর ঝুলোঝুলির পর একদিন শার্ট খুলে তিনি আমায় দাগগুলো দেখিয়েছিলেন। কোনো কোনোটা তখনো আধ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'পৃষ্ঠে তব অস্ত্র-লেখা।'

বলশফকে কেউ কখনো চটাতে পারেনি বলেই রসিকতাটা করেছিলুম। তিনি ভারতবর্ষের ক্ষাত্র বীরত্বের 'কোড্' শুনে বললেন, 'যদি সেদিন না পালাতুম তবে ত্রৎস্কির আমলে পোলদের বেধড়ক পাল্টা মার দেবার সুখ থেকে যে বঞ্চিত হতুম, তার কী?'

মাদাম দেমিদফ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আঁর জানেন তো মসিয়ো, ঐ লড়াইতেই সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক পথ সুরাহা হয়ে যায়।'

বলশফের একটা মস্ত দোষ দু'দণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। হাত দুখানা নিয়ে যে কী করবেন ঠিক করতে পারেন না বলে এটা সেটা নিয়ে সব সময় নাড়াচাড়া করেন, বেখেয়ালে একটু বেশি চাপ দিতেই কর্কস্ক্রুটা পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। তিনি ঘরে ঢুকলেই আমরা টুকিটাকি সব জিনিস তাঁর হাতের নাগাল থেকে সরিয়ে ফেলতুম। আমার ঘরে ঢুকলে আমি তৎক্ষণাৎ তাকে এক থালা আস্ত আখরোট খেতে দিতুম।

দুটো একটা খেতেন মাঝে মাঝে—খাওয়ার পর দেখা যেত সব ক'টি আখরোটের খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছেন, চহার মগজ্ শিকন (হাতুড়ি) না দেওয়া সত্ত্বেও।

এ রকম অজাতশত্রু লোক সমস্ত কাবুল শহরে আমি দুটি দেখিনি। একদিন তাই যখন দেমিদফের ঘরে আলোচনা হচ্ছিল তখন বলশফের সবচেয়ে দিলী-দোস্ত রোগাপটকা স্নিয়েশকফ বললেন, 'বলশফের সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব তার গায়ের জোরের ভয়ে।'

বলশফ বললেন, 'তা হলে তো তোমার সবচেয়ে বেশি শত্রু থাকার কথা।'

স্নিয়েশকফ যা বললেন, পদাবলীর ভাষায় প্রকাশ করলে তার রূপ হয়—

'বঁধু, তোমার গরবে   গরবিনী হাম
রূপসী তুঁহারি রূপে—'

বাকিটা তিনি আর প্রাণের ভয়ে বলেননি।

বলশফ বললেন, 'রোগা লোকের ঐ এক মস্ত দোষ। খামকা বাজে তর্ক করে। বলে কি না ভয়ে বন্ধুত্ব! যত্তসব পরস্পরদ্রোহী আত্মঘাতী বাক্যাড়ম্বর!'

বলশফ সম্বন্ধে এত কথা বললুম তার কারণ তিনি তখন আমান উল্লার অ্যার-ফোর্সের পাইলট। বলশেভিক-বিদ্রোহ জুড়িয়ে গিয়ে থিতিয়ে যাওয়ায় তাঁর সঙ্কটাকাঙ্ক্ষী মন কাবুলে এসে নতুন বিপদের সন্ধানে আমান উল্লার চাকরী নিয়েছিল।

শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমান উল্লার সেবা করেছিলেন।

বত্রিশ

আমান উল্লা ইয়োরোপ থেকে নিয়ে এলেন একগাদা দামি আসবাবপত্র, অগুনতি মোটর গাড়ি আর বক্তৃতা দেবার বদ অভ্যাস। প্রাচ্যদেশের লোক খেয়েদেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে আরামে গা এলিয়ে দেয়, পশ্চিমে ডিনারের পর স্পীচ, লাঞ্চের পর অরেটরি—তাও আবার যত সব শিরঃপীড়াদায়ক পোলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে।

সায়েবরা বিলেতে লাঞ্চে ডিনারে আমান উল্লাকে যে নেশার পয়লা পাত্র খাইয়ে দিয়েছিল তার খোয়ারি তিনি চালালেন কাবুলে ফিরে এসে, মাত্রা বাড়িয়ে লম্বা লম্বা লেকচার ঝেড়ে। পর পর তিনদিনে নাকি তিনি একুনে ত্রিশ ঘন্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

কিন্তু কারো কথায় তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না, কাবুলে টিড়ের প্রচলন নেই—কাজেই শ্রোতারা কেউ ঘুমলো, কেউ শুনলো, দু'-একজন মনে মনে ইয়োরোপে তাঁর বাজে খরচার আঁক কষলো।

তারপর আরম্ভ হলো সংস্কারের পালা। একদিন সকালবেলা মৌলানার বাড়ি যেতে গিয়ে দেখি পনেরো আনা দোকানপাট বন্ধ। বড় দোকানের ভিতর গ্রামোফোন-ফোটোগ্রাফের দোকানটা খোলা ছিল। দোকানদার পাঞ্জাবী, অমৃতসরের লোক; আমাদের সঙ্গে ভাব ছিল।

খবর শুনে বিশ্বাস হল না। আমান উল্লার হুকুম, 'কার্পেটের উপর পদ্মাসনে বসে দোকান চালাবার কায়দা বেআইনী করা হল; সব দোকানে বিলিতী কায়দায় চেয়ার টেবিল চাই।'

আমি বললুম, 'সে কী কথা? ছুতোর, কামার, কালাইগর, মুচী?'

'সব, সব।'

'ছোট ছোট খোপের ভিতর চেয়ার টেবিল ঢোকাবে কী করে, পাবেই বা কোথায়?'

নিরুত্তর।

'যারা পয়সাওয়ালা, যাদের দোকানে জায়গা আছে?'

'রাতারাতি মেজ-কুর্সি পাবে কোথায়? ছুতোরও ভয়ে দোকান বন্ধ করেছে। বলে চেয়ারে বসে টেবিলে তক্তা রেখে সে নাকি র‍্যাঁদা চালাতে শেখেনি।'

'আগের থেকে নোটিশ দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়নি?'

'না। জানেন তো, আমান উল্লা বাদশার সব কুছ ঝটপট।'

পাক্কা তিন সপ্তাহ চোদ্দ আনা দোকানপাট বন্ধ রইল। গম ডাল অবশ্য পিছনের দরজা দিয়ে আড়ালে আবডালে বিক্রি হল, তাদের উপরে চোটপাট করে পুলিশ দু'পয়সা কামিয়ে নিল।

আমান উল্লা হার মানলেন কি না জানিনে তবে তিন সপ্তাহ পরে একে একে সব দোকানই খুলল— পূর্ববৎ, অর্থাৎ বিন্ চেয়ার টেবিল। কাবুলের সবাই এই ব্যাপারে চটে গিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজার খামখেয়ালিতে তারা অভ্যস্ত বলে অত্যধিক উষ্মাবোধ করেনি। কাবুলীদের এ মনোভাবটা আমি

ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি কারণ আমরা ভারতবর্ষে অত্যাচার-অবিচারে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু খামখেয়ালি বড় একটা দেখতে পাইনে।

আমার মনে খটকা লাগল। পাগমানের পাগলামির কথা মনে পড়ল—গাঁয়ের লোককে শহরে ডেকে এনে মর্নিংস্যুট পরাবার বিড়ম্বনা। এ যে তারি পুনরাবৃত্তি; এ যে আরো পীড়াদায়ক; মূল্যহীন, অর্থহীন, ইয়োরোপের অন্ধানুকরণ।

মির আসলমের সঙ্গে দেখা হলে পর তিনি আমাকে সবিস্তার আলোচনা না করতে দিয়ে যেটুকু বললেন বাঙলা ছন্দে তার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

কয়লাওয়ালার দোস্তী? তওবা!
ময়লা হতে রেহাই নাই
আতরওয়ালার বাক্স বন্ধ
দিলখুশ তবু পাই খুশবাই।

আমি বললুম, 'এ তো হল সূত্র, ব্যাখ্যা করুন।'

মির আসলম বললেন, 'পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের সঙ্গে গাত্র ঘর্ষণ করতঃ আমান উল্লা যে কৃষ্ণপ্রস্তর চূর্ণ সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া আসিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি কাবুল-হট্ট মসীলিপ্ত করিবার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন।

'তথাপি অস্মদ্দেশীয় বিদগ্ধজনের শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত যদি নৃপতি প্রস্তরচূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রস্তরখণ্ডও আনয়ন করিতেন। তদ্দ্বারা ইন্ধন প্রজ্বলিত করিলে দীন দেশের শৈত্য নিবারিত হইত।'

আমি বললুম, 'চেয়ারটেবিল চালানো যদি মসীলেপন মাত্রই হয় তবে তা নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর দুঃখ করবার কী আছে বলুন?'

মির আসলম বললেন, 'অযথা শক্তিক্ষয়। নৃপতির অবমাননা। ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

কিন্তু আর পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখলুম যে তাঁরা মির আসলমের মত কালো চশমা পরে ভবিষ্যৎ এত কালো করে দেখছেন না। ছোকরাদের চোখে তো গোলাপি চশমা, গোলাপি বললেও ভুল বলা হয়—সে চশমা লাল টকটকে, রক্ত মাখানো। তারা বলে, 'যে সব বদমায়েশরা এখনো কার্পেটে বসে দোকান চালাচ্ছে তাদের ধরে ধরে কামানের মুখে বেঁধে হাজারো টুকরো করে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমান উল্লা নিতান্ত ঠাণ্ডা বাদশা বলেই তাদের রেহাই দিয়েছেন।'

ভেবেচিন্তে আমি গোলাপি চশমাই পরলুম।

তার কিছুদিন পরে আরেক নয়া সংস্কারের খবর আনলেন মৌলানা। আফগান সেপাইদের মানা করা হয়েছে, তারা যেন কোনো মোল্লাকে মুরশীদ না বানায় অর্থাৎ গুরু স্বীকার করে যেন মন্ত্র না নেয়।

খাঁটি ইসলামে গুরু ধরার রেওয়াজ নেই। পণ্ডিতেরা বলেন, 'কুরান শরীফ কিতাবুম্মুবীন' অর্থাৎ 'খোলা কিতাব'; তাতেই জীবনযাত্রার প্রণালী আর পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের পন্থা সোজা ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে, গুরু মেনে নিয়ে তার অন্ধানুসরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

অন্য দল বলেন, 'একথা আরবদের জন্য খাটতে পারে, কারণ তারা আরবীতে কুরান পড়তে পারে। কিন্তু ইরানী, কাবুলীরা আরবী জানে না, গুরু না নিলে কী উপায়?'

এ-তর্কের শেষ কখনো হবে না।

কিন্তু বিষয়টা যদি ধর্মের গণ্ডির ভিতরেই বন্ধ থাকত, তবে আমান উল্লা গুরু-ধরা বারণ করতেন না। কারণ, যদিও মানুষ গুরু স্বীকার করে ধর্মের জন্য, তবু দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত গুরু দুনিয়াদারীর সব ব্যাপারেও উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছেন এবং গুরুর উপদেশ সাক্ষাৎ আদেশ।

তাহলে দাঁড়ালো এই যে, আমান উল্লার আদেশের বিরুদ্ধে মোল্লা যদি তাঁর শিষ্য কোনো সেপাইকে

পাল্টা আদেশ দেন, তবে সে সেপাই মোল্লার আদেশই যে মেনে নেবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

চার্চ বনাম স্টেট।

গোলাপি চশমাটা কপালে তুলে অনুসন্ধান করলুম, দেয়ালে কোনো লেখা ফুটে উঠেছে কি না, আমান উল্লা কেন হঠাৎ এ আদেশ জারি করলেন। তবে কি কোনো অবাধ্যতা, কোনো বিদ্রোহ, কোনো—? কিন্তু এসব সন্দেহ কাবুলে মুখ ফুটে বলা তো দূরের কথা, ভাবতে পর্যন্ত ভয় হয়।

আমার শেষ ভরসা মির আসলম। তিনি দেখি কালো চশমায় আরেক পোঁচ ভূসো মাখিয়ে রাজনৈতিক আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। খবরটা দেখলুম তিনি বহু পূর্বেই জেনে গিয়েছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'ইহলোক পরলোক সর্বলোকের জন্যই গুরু নিষ্প্রয়োজন। তৎসত্ত্বেও যদি কেহ অনুসন্ধান করে, তবে তাহাকে প্রতিরোধ করাও ততোধিক নিষ্প্রয়োজন।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনি যখন আপনার ভারতীয় গুরুর কথা স্মরণ করেন, তখনই তো দেখেছি তাঁর প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ।'

মির আসলম বললেন, 'গুরু দ্বিবিধ; যে গুরুগৃহে প্রবেশ করার দিন তোমার মনে হইবে, গুরু ভিন্ন পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারো না এবং ত্যাগ করিবার দিন মনে হইবে, গুরুতে তোমার প্রয়োজন নাই, তিনিই যথার্থ গুরু—গুরুর আদর্শ তিনি যেন একদিন শিষ্যের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরু শিষ্যকে প্রতিদিন পরাধীন হইতে পরাধীনতর করেন। অবশেষে গুরু বিনা সে-শিষ্য নিশ্বাসপ্রশ্বাস কর্ম পর্যন্ত সুসম্পন্ন করিতে পারে না। আমার গুরু প্রথম শ্রেণীর। আফগান সৈন্যের গুরু দ্বিতীয় শ্রেণীর।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ আপনার গুরু আপনাকে স্বাধীন করলেন, আফগান সেপাইয়ের গুরু তাকে পরাধীন করলেন। পরাধীনতা ভালো জিনিস নয়, তবে কেন বলেন, গুরু নিষ্প্রয়োজন? বরঞ্চ বলুন, গুরুগ্রহণ সেখানে অপকর্ম।'

মির আসলম বললেন, 'ভদ্র, সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রশ্ন, সংসারের কয়জন লোক স্বাধীন হইয়া চলিতে ভালোবাসে বা চলিতে পারে! যাহারা পারে না, তাহাদের জন্য অন্য কী উপায়?'

আমি বললুম 'খুদায় মালুম। কিন্তু উপস্থিত বলুন, সৈন্যদের বিদ্রোহ করার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না?'

মির আসলম বললেন, 'নৃপতির সন্নিকটস্থ সেনাবাহিনী কখনো বিদ্রোহ করে না, যতক্ষণ না সিংহাসনের জন্য অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হন।'

আমি ভারী খুশি হয়ে বিদায় নিতে গিয়ে বললুম, 'কয়েক দিন হল লক্ষ্য করছি, আপনার ভাষা থেকে আপনি কঠিন আরবী শব্দ কমিয়ে আনছেন। সেটা কি সজ্ঞানে?'

মির আসলম পরম পরিতোষ সহকারে মাথা দোলাতে দোলাতে হঠাৎ অত্যন্ত গ্রাম্য কাবুলী ফার্সীতে বললেন, 'এ্যাদ্দিনে বুঝতে পারলে চাঁদ? তবে হক কথা শুনে নাও। আর বছর যখন হেথায় এলে তখন ফার্সী জানতে ঢু-ঢু। তাইতে তোমায় তালিম দেবার জন্য আরবী শব্দের বেড়া বানাতুম, তুমি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পেরোতে; গোড়ার দিকে ঠ্যাঙগুলো জখম-টখমও হয়েছে। এখন দিব্যি আরবী ঘোড়ার মত আরবী বেড়া ডিঙোচ্ছো বলে বখেড়া বাঁধার কম্ম বন্ধ করে দিলুম। গুরু এখন ফালতো। মাথার ভসভসে ঘিলুতে তুরপুন সিঁধলো?'

আমি বাড়ি ফেরার সময় ভাবলুম, 'লোকটি সত্যিকার পণ্ডিত। গুরু কী করে নিজেকে নিষ্প্রয়োজন করে তোলেন, সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন।'

তারপর বেশি দিন যায়নি, এমন সময় একদিন নোটিশ পেলুম, একদল আফগান মেয়েকে উচ্চ

শিক্ষার জন্য তুর্কিতে পাঠানো হবে, স্বয়ং বাদশা উপস্থিত থেকে তাদের বিদায়-আশীর্বাদ দেবেন।

আমি যাইনি। বৃটিশ রাজদূতাবাসের এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীর মুখ থেকে বর্ণনাটা শুনলুম। তার নাম বলব না, সে নাম এখনো মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের খবরের কাগজে ধূমকেতুর মত দেখা দেয়। বললেন, 'গিয়ে দেখি, জনকুড়ি কাবুলী মেয়ে গার্ল গাইডের ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে। আমান উল্লা স্বয়ং উপস্থিত, অনেক সরকারী কর্মচারী, বিদেশি রাজদূতাবাসের গণ্যমান্য সভ্যগণ, আর একপাশে মহিলারা। রানী সুরাইয়াও আছেন, হ্যাটের সামনে পাতলা নেটের পরদা।

'আমান উল্লা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক খাঁটি এবং পুরানো কথা দিয়ে অবতরণিকা শেষ করে বললেন, 'আমি পর্দা-প্রথার পক্ষপাতী নই, তাই আমি এই মেয়েদের বিনা বোরকায় তুর্কি পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমি স্বাধীনতাপ্রয়াসী; তাই কাবুলের কোনো মেয়ে যদি মুখের সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে রাস্তায় বেরোতে চায়, তবে আমি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আবার আমি কাউকে জোর করতেও চাইনে, এমন কী, মহিষী সুরাইয়াও যদি বোরকা পরাই পছন্দ করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

কর্মচারীটি বললেন, 'এতটা ভালোয়-ভালোয় চলল। কিন্তু আমান উল্লার বক্তৃতা শেষ হতেই রানী সুরাইয়া এগিয়ে এসে নাটকি ঢঙে হ্যাটের সামনের পর্দা ছিঁড়ে ফেললেন। কাবুল শহরের লোক সভাস্থলে আফগানিস্থানের রাজমহিষীর মুখ দেখতে পেল।'

কর্মচারীটির রসবোধ অত্যন্ত কম, তাই বর্ণনাটা দিলেন নিতান্ত নীরস-নির্জলা। কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে জিজ্ঞেস করব, তারও উপায় নেই। হয়ত ঘুঘু এসেছেন রিপোর্ট তৈরি করবার মতলব নিয়ে— ঘটনাটা ভারতবাসীর মনে কী রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই হবে রিপোর্টের মশলা। আমিও 'পোকার' খেলার জুয়াড়ির মত মুখ করে বসে রইলুম।

যাবার সময় বললেন, 'এরকমধারা ড্রামাটিক কায়দায় পর্দা ছেঁড়ার কী প্রয়োজন ছিল? রয়েসয়ে করলেই ভালো হত না?'

আমি মনে মনে বললুম, 'ইংরেজের সনাতন পন্থা। সব কিছু রয়েসয়ে। সব কিছু টাপেটোপে। তা সে ইংরিজি লেখাপড়া চালানোই হোক, আর ঢাকাই মসলিনের বুক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করাই হোক। ছুঁচ হয়ে ঢুকবে, মুষল হয়ে বেরবে।'

কিছু একটা বলতে হয়। নিবেদন করলুম, 'এসব বিষয়ে এককালে ভারতবাসী মাত্রই কোনো না কোনো মত পোষণ করত। কারণ তখনকার দিনে আফগানিস্থান ভারতবর্ষের মুখের দিকে না তাকিয়ে কোনো কাজ করত না, কিন্তু এখন আমান উল্লা নিজের চোখে সমস্ত পশ্চিম দেখে এসেছেন, রাস্তা তাঁর চেনা হয়ে গিয়েছে, আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব, মঙ্গল কামনা করব, ব্যস।'

কর্মচারী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে ভাবলুম।

কিন্তু একটা কথা এখানে আমি আমার পাঠকদের বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি এবং কাবুলের আর পাঁচজন তখন আমান উল্লার এসব সংস্কার নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাইনি। মানুষের স্বভাব আপন ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে বড় করে দেখা—হাতের সামনের আপন মুঠি হিমালয় পাহাড়কে ঢেকে রাখে। দ্বিতীয়ত যে-সব সংস্কার করা হচ্ছিল তার একটাও আমার মত পাঁচজনের স্বার্থকে স্পর্শ করেনি। স্যুট সঙ্গে নিয়েই আমরা কাবুল গিয়েছি, কাজেই স্যুট পরার আইন আমাদের বিচলিত করবে কেন? আর আমরা পাতলা নেটের ব্যবসাও করিনি যে মহারানী তাঁর হ্যাটের নেট ছিঁড়ে ফেললে আমাদের দেউলে হতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ইরান-আফগানিস্থানের বাদশা দেশের লোকের মাল-জানের মালিক। আর সকলেই জানে এই দুই বস্তুই অত্যন্ত ফানি—নশ্বর। নশ্বর জিনিস এমনি যাবে অমনিও যাবে—বাদশাহের খামখেয়ালি নিমিত্তের ভাগী মাত্র। রাজা বাদশা তো আর গাধাখচ্চর নন যে, শুধু দেশের মোট পিঠে করে বইবেন আর জাবর কাটবেন—তাঁরা হলেন গিয়ে

তাজী ঘোড়ার জাত। দেশটাকে পিঠে নিয়ে যেমন হঠাৎ প্রগতির দিকে খামকা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটবেন, তেমনি কারণে অকারণে সোয়ারকে দুটো চারটে লাথিচাঁটও মারবেন। তাই বলে তো আর ঘোড়ার দানাপানি বন্ধ করে দেওয়া যায় না।

কাজেই কাবুল শহরের লোকজন খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমোচ্ছে, বেরিয়ে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় আমান উল্লার প্রতিজ্ঞা যে, তিনি সব মেয়েদের বেপর্দায় বেরবার সাহায্য করবেন এক ভিন্নরূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। শোনা গেল বাদশার হুকুম, কোনো স্ত্রীলোক যদি বেপর্দা বেরতে চায় তবে তার স্বামী যেন কোনো ওজর-আপত্তি না করে। যাদের আপত্তি আছে, তারা যেন বউদের তালাক দিয়ে দেয়। আর তারা যদি সরকারী চাকরি করে, তবে আমান উল্লা দেখে নেবেন। কী দেখে নেবেন? সেটা পষ্টাপষ্টি বলা হয়নি, তবে চাকরিটাও হয়ত বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সাধে কি আর বাঙলায় বলি, 'বিবিজান চলে যান লবে-জান করে।' শুধু বিবিজান চলে গেলে সুস্থ মানুষ—প্রেমিকদের কথা আলাদা—'লবে-জান' হবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটা গেলে পর মানুষ অনাহারে 'লবে-জান' হয়।

মির আসলম বললেন, 'গিন্নীকে গিয়ে বল্লু, ওগো চোখে সুরমা লাগিয়ে বে-বোরকায় কাবুল শহরে এট্টা রোঁদ মেরে এস। বিশ্বাস করবে না ভায়া, বদনা ছুঁড়ে মারলে। তা জানো তো, মোল্লাব পাগড়ি, বদনাটাই খেল টোল। আম্মো অবশ্যি টাল খেয়ে খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।'

আমি বললুম, 'হাঁ হাঁ জানি, পাগড়ি অনেক কাজে লাগে।'

মির আসলম বললেন, 'ছাই জানো, বে করলে জানতে। বেয়াড়া বউকে তোমার তো আর বেঁধে রাখতে হয় না।'

আমি বললুম, 'বাজে কথা। আমান উল্লা কাঁ্যাচ করে কেটে দিয়েছেন। আর ভালই করেছেন, বউকে বেঁধে রাখতে হয় মনের শিকল দিয়ে, হৃদয়ের জিঞ্জির দিয়ে।'

মির আসলম বললেন, 'হৃদয়মনের কথা ওঠে যেখানে তরুণ-তরুণীর ব্যাপার। ষাট বছরের বুড়ো ষোল বছরের বউকে কোন মনের শেকল দিয়ে বাঁধতে পারে বলো? সেখানে কাবিন-নামা, সর্বাঙ্গ ঢাকাবোরকা, আর পাগড়ির ন্যাজ।'

আমি বললুম, 'তাতো বটেই।'

মির আসলম বললেন, 'আমান উল্লা যে পর্দা ছেঁড়ার জন্য তম্বি লাগিয়েছেন তাতে জোয়ানদের কী? বেদনাটা সেখানে নয়। বুড়ো সর্দারদের ভিতর চিংড়ি বউদের ঠেকাবার জন্য সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'তরুণীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন নাকি?'

তিনি বললেন, 'ভ্যালা রে বিপদ, আমাকে তুমি নওরোজের আকবর বাদশা ঠাওরালে নাকি? চিংড়িদের আমি চিনব কোত্থেকে? ইস্তক মেয়ে নেই, ছেলের বউও নেই। গিন্নির বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু বয়স ভাঁড়িয়ে হাফ-টিকিট কেটেছেন, দেখলে বোঝা যায়, শ'খানেক হবে।'

আমি বললুম, 'তবে কি বুড়োরা খামকা ভয় পেয়েছেন?'

মির আসলম বললেন, 'শোনো, খুলে বলি। আমান উল্লার হুকুম শোনা মাত্র চিংড়িরা যদি লাফ দিয়ে উঠত, তবে বুড়োরাও না হয় তার একটা দাওয়াই বের করত, এই মনে কর তুমি যদি হঠাৎ তলোয়ার দিয়ে কাউকে হামলা করো, সেও কিছু একটা করবে। বীর হলে লড়বে, বকবীর কলিজা হলে ন্যাজ দেখাবে। কিন্তু এ তো বাপু তা নয়, এ হল মাথার ওপর ঝোলানো নাঙা তলোয়ার। চিংড়িরা হয়ত সব চুপ করে বসে আছে—রাস্তায় তো এখনো চাঁদের হাট বসেনি—কিন্তু এক একজন এক এক শ' খানা তলোয়ার হয়ে চাঁদির ওপর ঝুলে আছেন। চোখ দু'টি বন্ধ করে একটিবার দেখে নাও বাপু।'

শিউরে উঠলুম।

তেত্রিশ

একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ মূর্তি। চেনা চেনা মনে হল অথচ যেন অচেনা। তার হাতের ট্রের দিকে নজর যেতে দেখি সেটা সম্পূর্ণ চেনা। তার উপরকার রুটি, মাখন, মামলেট, বাসি কাবাবও নিত্যকার চেহারা নিয়ে উপস্থিত। ধূম দেখলে বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়; সকালবেলা আমার ঘরে এ রকমের ট্রে হাওয়ায় দুলতে পারে না, বাহক আবদুর রহমানের উপস্থিতি স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু কী বেশভূষা! পাজামা পরেনি, পরেছে পাতলুন। কয়েদীদের পাঁতলুনের মত সেটা নেমে এসেছে হাঁটুর ইঞ্চি তিনেক নিচে, উরুতে আবার সে পাতলুন এমনি টাইট যে মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাইট সাটিনের ব্রিচেস্ পরেছেন। শার্ট, কিন্তু কলার নেই। খোলা গলার উপর একটা টাই বাঁধা। গলা বন্ধ কোট, কিন্তু এত ছোট সাইজের যে, বোতাম লাগানোর প্রশ্নই ওঠে না—তাই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শার্ট আর টাই। দু'কান ছোঁয়া হ্যাট, ভুরু পর্যন্ত গিলে ফেলেছে। দোকানে যে রকম হ্যাট-স্ট্যাণ্ডের উপর খাড়া করানো থাকে।

পায়ে নাগরাই, চোখে হাসি, মুখে খুশি।

আবদুর রহমানের সঙ্গে এক বছর ঘর করেছি। চটে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে হস্তীর সঙ্গে নানাদিক দিয়ে তুলনা করেছি, কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ সুস্থ, তার মাথায় যে ছিট নেই, সে বিষয়ে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তাই চোখ বন্ধ করে বললুম, 'বুঝিয়ে বল।'

আমার যে খটকা লাগবে সে বিষয়ে সে সচেতন ছিল বলে বলল, 'দেরেশি পুশিদম'—অর্থাৎ 'স্যুট পরেছি।'

আমি শুধালুম, 'সরকারি চাকরি পেলে লোকে দেরেশি পরে; আমার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ নাকি?'

আবদুর রহমান বলল, 'তওবা, তওবা, আপনি সায়েব আমার সরকার, আমার রুটি দেনেওয়ালা।'

'তবে?'

'সকালবেলা রুটি কিনতে গেলে পর পুলিশ ধরলো। বলল, 'বাদশার হুকুম আজ থেকে কাবুলের রাস্তায় পাজামা, কুর্তা, জোব্বা পরে বেরোনো বারণ—সবাইকে দেরেশি পরতে হবে।' আমার কাছ থেকে এক পাই জরিমানাও আদায় করল। রুটি কিনে ফেরবার পথে আর দু'তিনটে পুলিশ ধরল। আপনার দোহাই পেড়ে কোনো গতিকে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ির সামনে আমাদের পড়শি কর্নেল সায়েবের সঙ্গে দেখা, তিনি ডেকে নিয়ে এই দেরেশি দিলেন, আমাকে তিনি বড্ড স্নেহ করেন কিনা, আমিও তাঁর ফাইফরমাশ করে দিই।'

গুম্ হয়ে শুনলুম। শেষটায় বললুম, 'দর্জির দোকানে তো এখন ভিড় হওয়ার কথা। দু'দিন বাদে গিয়ে তোমার পছন্দমত একটা দেরেশি কিনে নিয়ো।'

আবদুর রহমান হিসেবী লোক, বলল, 'এই তো বেশ।'

আমি বললুম 'চুপ! আর দুপুরবেলা এক জোড়া বুট কিনে নিয়ো।'

আবদুর রহমান কলরব করে বলল, 'না হুজুর তার দরকার নেই। পুলিশের ফিরিস্তিতে বুটের নাম নেই।'

প্রথমটা অবাক হলুম। পরে বুঝলুম ঠিকই তো; লক্ষ্মণ না হয় সীতাদেবীর পায়ের দিকে তাকাতে পারেন—রাজাপ্রজায় তো সে সম্পর্ক নয়!

বললুম, 'চুপ! দুপুরবেলা কিনবে। আর দেখো, এবার হ্যাটটা খুলে ফেলো।'

আবদুর রহমান চুপ।

বললুম, 'খুলে ফেলো।'

আবদুর রহমান আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হুজুরের সামনে?' তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ল উত্তর আফগানিস্থান তুর্কিস্থানে মানুষ শয়তানের ভয় পেলে পাগড়ি খুলে ফেলে। শুধু-মাথা দেখলে নাকি শয়তান পালায়। তাই আবদুর রহমান ফাঁপরে পড়েছে। তখন মনে পড়ল যে, হৌস অব কমন্সে হ্যাট না পরা থাকলে কথা কইতে দেয় না। বললুম, 'থাক তাহলে তোমার মাথার হ্যাট।'

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি শহর অন্যদিনের তুলনায় ফাঁকা। দেরেশির অভাবে লোকজন বাড়ি থেকে বেরতে পারেনি। পর্দা তুলে দেওয়াতে যেমন রাস্তাঘাটে মেয়েদের ভিড় বাড়ার কথা ছিল তেমনি দেরেশির রেওয়াজ এক নতুন ধরনের পর্দা হয়ে পুরুষদের হারেমবন্ধ করল।

যারা বেরিয়েছে তাদের দেরেশির বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। যত রকম ছেঁড়া, নোংরা, শরীরের তুলনায় হয় ছোট নয় বড়, কোট-পাতলুন, প্লাস-ফোর্স, ব্রিচেস্ দিয়ে যত রকমের সম্ভব অসম্ভব খিচুড়ি পাকানো যেতে পারে তাই পরে কাবুল শহর রাস্তায় বেরিয়েছে—গোটা দশেক পাগলা-গারদকে হলিউডের গ্রীনরুমে ছেড়ে দিলেও এর চেয়ে বিপর্যয় কাণ্ড সম্ভবপর হত না।

ইয়োরোপীয়রা বেরিয়েছে তামাশা দেখতে। আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আফগানিস্থানকে আমি কখনো পর ভাবিনি।

শহরতলি দিয়ে আমাকে কাজে যেতে হয়। সেখানে দেখি আরো কঠোর দৃশ্য। গ্রামের লকড়িওয়ালা, সবজিওয়ালা, আণ্ডাওয়ালা যেই শহরের চৌহদ্দির ভিতরে পা দেয় অমনি পুলিশ তাদের ধরে ধরে এক এক পাই করে জরিমানা করে। বেচারিদের কোনো রসিদ দেওয়া হয় না, কাজেই দশ পা যেতে না যেতেই তাদের কাছ থেকে অন্য পুলিশ এসে আবার নতুন করে জরিমানা আদায় করে। দুনিয়ার যত পুলিশ সেদিন কাবুলের শহরতলিতে জড়ো হয়েছে। খবর নিয়ে শুনলুম যারা এ সময়ে অফ-ডিউটি তারাও উর্দি পরে পয়সা রোজগার করতে লেগে গিয়েছে—জরিমানার পয়সা নাকি সরকারি তহবিলে জমা দেওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করা হয়নি।

দিবাদ্বিপ্রহরে যে কাবুলী পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমনোতে রেকর্ড ব্রেক করতে পারে, তার ব্যস্ততা দেখে মনে হল, যেন তার বাস্তুবাড়িতে আগুন লেগেছে।

এ অত্যাচার কদিন ধরে চলেছিল বলতে পারিনে।

দুই সপ্তাহ ধরে দেশের খবরের কাগজ চিঠিপত্র পাইনি। খবর নিয়ে শুনলুম জলালাবাদ-কাবুলের রাস্তা বরফে ঢাকা পড়ায় মেল-বাস আসতে পারেনি, দু-একজন ফিস্ফিস্ করে বলল, রাস্তায় নাকি লুঠতরাজও হচ্ছে। মির আসলম সাবধান করে গেলেন যেন যেখানে সেখানে যা তা প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করি।

অন্য কাজ শেষ হলে মেয়েদের ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস ও সেকেণ্ড মিস্ট্রেসকে আমি ইংরিজি পড়াতুম। আফগান মেয়েরা চালাক, জানে যে ধনীর কাছ থেকে টাকা বের করা শক্ত, কিন্তু গরিবের দরাজ হাত। জ্ঞানের বেলাতেও এই নীতি খাটবে ভেবে এই দুই মহিলা আমাকে বেছে নিয়েছিলেন।

হেডমিস্ট্রেসের বয়স পঞ্চাশের উপর; মাতৃভাষা বাদ দিলে জীবনে তিনি এই প্রথম ভাষা শিখছেন। কাজেই কাবুলের পাথর-ফাটা শীতেও তাকে আমি ইংরিজি বানান শেখাতে গিয়ে ঘেমে উঠতুম। ইংরিজি ভাষা শিখতে বসেছেন, কিন্তু ঐ এক বিষয় ছাড়া দুনিয়ার আর সব জিনিসে তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। বিশেষ করে মাস্টারমশায়ের বয়স কত, দেশ কোথায়, দেশের জন্য মন খারাপ হয় কী না, কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই তাঁর বাধতো না। তবে খুব সম্ভব আমার এপেনডিক্সের সাইজ ও এ জগতে আমার জন্মাবার কী প্রয়োজন ছিল, এ দুটো প্রশ্ন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন নি। আমার উত্তর দেবার কায়দাও ছিল বিচিত্র। আমার দেশ? আমার দেশ হল Bengal, বানানটা শিখে নিন, বি ই এন জি এ এল। উচ্চারণটাও শিখে নিন। কেউ বলে বেন্‌গোল, আবার কেউ বলে বেঙোল। ঠিক তেমনি France—এফ আর—তিনি বলতেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তা বলুন তো, বাঙালী মেয়েরা

দেখতে কী রকম? শুনেছি তাদের খুব বড় বড় চুল হয়, 'জুলফে বাঙাল,' বলে একরকম তেল এদেশে পাওয়া যায়। আপনি কী তেল মাখেন? আমাদের দু'জনার এই চাপান-উতোরের মাঝখানে পড়ে ইংরিজি ভাষা বেশি এগোতে পারতো না, বিশেষ করে তিনি যখন আমাকে আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেন। মায়ের কথা বলার ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে শট্‌কে শেখাবার এলেম আমার পেটে নেই।

সেকেণ্ড মিস্ট্রেসের বয়স কম—ত্রিশ হয় না হয়। দু'টি বাচ্চার মা, থলথলে দেহ, খাঁদা নাক, মুখে এক গাদা হাসি, পরনে বারো মাস শ্লিপওভার, লম্বা-হাতা ব্লাউজ আর নেভি ব্লু ফ্রক। কর্নেলের বউ, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, আর আমি যখন কর্ত্রীর প্রশ্নের চাপে নাজেহাল হতুম, তখন তিনি মিটমিটিয়ে হাসতেন আর নিতান্ত বেয়াড়া প্রশ্নে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলে মাঝে মাঝে উদ্ধার করে দিতেন।

জোর শীত কিন্তু তখনো বরফ পড়েনি, এমন সময় একদিন পড়াতে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি কর্নেলের বউ বইয়ের উপর মুখ গুঁজে টেবিলে ঝুঁকে পড়েছেন আর কর্ত্রী তার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে কর্নেলের বউ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। দেখি আর দিনের মত মুখে হাসির স্বাগতসম্ভাষণ নেই। চোখ দুটো লাল, নাকের ডগার চামড়া যেন ছড়ে গিয়েছে।

এসব জিনিস লক্ষ্য করতে নেই। আমি বউ খুলে পড়াতে আরম্ভ করলুম। দু'মিনিটও যায়নি, হঠাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাঝখানে কর্নেলের বউ দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলুম। কর্ত্রী শান্তভাবে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে থাকলেন, 'অধীর হয়ো না, অধীর হয়ো না। খুদাতালা মেহেরবান। বিশ্বাস হারিয়ো না, শান্ত হও।'

আমি চোখের ঠারে কর্ত্রীকে শুধালুম, 'আমি তাহলে উঠি?'

তিনি ঘাড় নেড়ে যেতে বারণ করলেন। দু'মিনিট যেতে না যেতে আবার কান্না, আবার সান্ত্বনা। আমি যে সে অবস্থায় কী করব ভেবেই পাচ্ছিলুম না। কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে যা বলছিলেন তার থেকে গোড়ার দিকে মাত্র এইটুকু বুঝলুম যে, তিনি তাঁর স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করে দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ভালো করে কিছু বলতে গেলেই কর্ত্রী বাধা দিয়ে তাঁকে ওসব কথা তুলতে বারণ করছিলেন। বুঝলুম যে, অমঙ্গল চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক নয় এবং এমন সব কারণও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে, সেগুলো প্রকাশ্যে বলা বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু তিনি তখন এমনি আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে বসেছেন যে, তাঁকে ঠেকানো মুশকিল। কখনো বলেন, 'শিনওয়ারীরা বর্বর জানোয়ার' কখনো বলেন, 'সাত দিন ধরে কোনো সরকারি খবর পাওয়া যায়নি.' কখনো বলেন, 'শিনওয়ারীরা শহরে পৌঁছলে কোনো অফিসার পরিবারের রক্ষা নেই।'

জলালাবাদ অঞ্চলে লুঠতরাজ হচ্ছে আগেই গুজব হিসেবে শুনেছিলুম, তার সঙ্গে এসব ছেঁড়াছেঁড়া খবর জুড়ে দিয়ে বুঝতে পারলুম যে, সে অঞ্চলে শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করে কাবুলের দিকে রওয়ানা হয়েছে, আমান উল্লা তাদের ঠেকাবার জন্য যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন সাতদিন ধরে তাদের সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাস্য খবর পাওয়া যায়নি, আর কাবুলের অফিসার মহলে গুজব, সে বাহিনীর অফিসাররা শিনওয়ারীদের হাতে ধরা পড়েছেন।

এত বড় দুঃসংবাদ ইংরিজি পড়ার চেষ্টা দিয়ে দমন করা অসম্ভব। আর আমি এসব সংবাদ জেনে ফেলেছি সেটাও কর্ত্রী আদপেই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু কর্নেলের বউকে তিনি কিছুতেই ঠেকাতেও পারছিলেন না। শেষটায় আমি এক রকম জোর করে ওঠবার চেষ্টা করলে কর্নেলের বউ হঠাৎ চোখ মুছে বললেন, 'না মুআল্লিম সায়েব, আপনি যাবেন না, আমি পড়াতে মন দিচ্ছি।'

এ রকম পড়া আমাকে যেন জীবনে আর না পড়াতে হয়। এবার যখন ভেঙ্গে পড়লেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, 'বাদশা আমান উল্লার মত যারা গোঁপ রেখেছেন তাদের ধরে ধরে উপরের ঠোঁট কেটে ফেলেছে।' আমান উল্লা ঠিক নাকের তলায় একটুখানি গোঁপ রাখেন—সেই টুথব্রাশ মুস্টাশ আফগান ফৌজী অফিসারদের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল।

এবারে আমি একটু সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পেলুম। বললুম, 'লড়াইয়ের সময় কত রকম গুজব রটে সে সব কি বিশ্বাস করতে আছে? আপনি অধীর হয়ে পড়েছেন তাই অমঙ্গল সংবাদ মাত্রই বিশ্বাস করছেন।'

আবার চোখ মুছে উঠে বসলেন। আমি যে পর-পুরুষ সে কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ আমার দু'হাত চেপে ধরে বললেন, 'মুয়াল্লিম সায়েব, সত্যি বলুন, ইমান দিয়ে বলুন, আপনি কয় সপ্তাহ ধরে হিন্দুস্থানের চিঠি পাননি?'

হিন্দুস্থানের ডাক শিনওয়ারী অঞ্চল হয়ে কাবুলে আসে। তিন সপ্তাহ ধরে সে ডাক বন্ধ ছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। তাঁর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললুম, 'আমি এ সপ্তাহেই দেশের চিঠি পেয়েছি।'

তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন দেখে আমি বললুম, 'আপনি তো আর পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেশেন না যে, হক খবর পাবেন। মেয়েরা স্বভাবতই একটুখানি বেশি ভয় পায়, আর নানারকম গুজব রটায়। তাই তো বাদশাহ আমান উল্লা পরদা পছন্দ করেন না।'

কর্ত্রী আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, 'যে সব খবর শুনলেন সেগুলো আর কাউকে বলবেন না।'

আমি বললুম, 'এসব খবর নয়, গুজব। গুজব রটালে শুধু কি আপনাদের বিপদ? আমি বিদেশি, আমাকে আরো বেশি সাবধানে থাকতে হয়।'

রাস্তায় বেরিয়ে একা হতেই বুঝলুম, মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার বিড়ম্বনাটা কী! সেটা কাটাবার জন্য পাঞ্জাবী গ্রামোফোনওয়ালার দোকানে ঢুকলুম। আমার গ্রামোফোন নেই, আমি রেকর্ড কিনিনে, তবু 'দেশের ভাই শুকুর মুহম্মদ' বলে দোকানদার আমাকে সব সময় আদর-আপ্যায়ন করত। জিজ্ঞেস করলুম, 'মৌলানার বাঙলা রেকর্ডগুলো কলকাতা থেকে এসেছে?'

দোকানদার বলল, 'না,' এবং ভাবগতিক দেখে বুঝলুম খোঁচাখুঁচি করলে কারণটা বলতেও তার বাধবে না। আমি কিন্তু তাকে না ঘাঁটিয়েই খানকয়েক রেকর্ড শুনে বাড়ি চলে এলুম।

কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি খোঁচাখুঁচি কিছুই করতে হল না। স্তরে স্তরে বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম গুজব এসে কাবুলের বাজারে স্তূপীকৃত হতে লাগল। সে-বাজার অন্ন বিক্রয় করে অর্থের পরিবর্তে, কিন্তু সন্দেশ দেয় বিনামূল্যে এবং বিনামূল্যের জিনিস যে ভেজাল হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? খবরের চেয়ে গুজব রটল বেশি।

কিন্তু এ-বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমান উল্লা অস্ত্রবলে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হননি, এখন যদি অর্থবলে কিছু করতে পারেন।

পূর্বেই বলেছি আফগানিস্থানের উপজাতি উপজাতিতে খুনোখুনি লড়াই প্রায় বারোমাস লেগে থাকে। সন্ধির ফলে কখনো কখনো অস্ত্রসংবরণ হলেও মিত্রতাহৃদ্যতার অবকাশ সেখানে নেই। কাজেই আফগান কূটনীতির প্রথম সূত্র : কোনো উপজাতি যদি কখনো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই উপজাতির শত্রুপক্ষকে অর্থ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। যদি অর্থে বশ না হয়, তবে রাইফেল দেবে। রাইফেল পেলে আফগান পরমোৎসাহে শত্রুকে আক্রমণ করবে— কাষ্ঠ রসিকেরা বলেন সে আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বন্দুকগুলোর তাগ পরীক্ষা করা।

কিন্তু এস্থলে দেখা গেল, বিদ্রোহের নীলছাপটা তৈরি করেছেন মোল্লারা এবং তাঁরা একথাটা সব উপজাতিকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যদি কোনো উপজাতি 'কাফির' আমান উল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তারা তখন দীন ইসলামের রক্ষাকর্তা। রাইফেল কিম্বা টাকার লোভে অথবা ঐতিহ্যগত সনাতন শত্রুতার স্মরণে তখন যারা আমান উল্লার পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়বে, তারাও তখন আমান উল্লার মতই কাফির। শুধু যে তারাই তখন দোজখে যাবে তা নয়, তাদের পূর্বতন অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ যেন স্বর্গদ্বার দর্শন করবার আশা মনে পোষণ না করে।

এ বড় ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত। ইহলোকে বক্ষলগ্ন থাকবে রাইফেল, পরলোকে হুরী, এই পুরুষ প্রকৃতির উপর আফগান-দর্শন সংস্থাপিত। কোনোটাতেই চোট লাগলে চলবে না। কিন্তু প্রশ্ন, আমান উল্লা কি সত্যিই কাফির?

এবারে মোল্লারা যে মোক্ষম যুক্তি দেখালেন তার বিরুদ্ধে কোনো শিনওয়ারী কোনো খুগিয়ানী একটি কথাও বলতে পারল না। মোল্লারা বললেন, 'নিজের চোখে দেখিসনি আমান উল্লা গণ্ডা-পাঁচেক কাবুলী মেয়ে মুস্তফা কামালকে ভেট পাঠিয়েছে; তারা যে এক রাত জলালাবাদে কাটিয়ে গেল, তখন দেখিসনি, তারা বেপর্দা বেহায়ার মতন বাজারের মাঝখানে গট্‌গট্‌ করে মোটর থেকে উঠল নামল?'

কথা সত্যি যে, বিস্তর শিনওয়ারী খুগিয়ানী সেদিনকার হাটবারে জলালাবাদে এসেছিল ও সেখানে বেপর্দা কাবুলী মেয়েদের দেখেছিল। আরো সত্যি যে, গাজী মুস্তফা কামাল পাশা আফগান মোল্লাদের কাছ থেকে কখনো গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাননি।

তবু নাকি এক 'মূর্খ' বলেছিল যে, মেয়েরা তুর্কি যাচ্ছে ডাক্তারি শিখতে। শুনে নাকি শিনওয়ারীরা অট্টহাস্য করেছিল—'মেয়ে ডাক্তার! কে কবে শুনেছে মেয়েছেলে ডাক্তার হয়? তার চেয়ে বললেই হয়, মেয়েগুলো তুর্কিতে যাচ্ছে গোঁপ গজাবার জন্য।'

কে তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে যে শিনওয়ারী মেয়েরাই বিনা পর্দায় ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, কে বোঝাবে যে, বুড়ী দাদীমা যখন হলুদ-পট্টী বাঁধতে, কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোক্ত তখন কাবুলী মেয়েরাই বা ডাক্তার হতে পারবে না কেন? কিন্তু এ সব বাজে তর্ক, নিষ্ফল আলোচনা। আসল একটা কারণের উল্লেখ কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু সেটা কতদূর সত্য, অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। আমান উল্লা নাকি রাজকোষের অর্থ বাড়াবার জন্য প্রতি আফগানের উপর পাঁচ মুদ্রা ট্যাক্স বসিয়েছিলেন।

আমান উল্লা এ সব কথাই আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু আর পাঁচজনের মত তিনিও সেই ফার্সী বয়েৎটি জানতেন, সোনার রত্তিটুকু থাকলে মানুষ মরা কুকুরকেও আদর করে। আমান উল্লা সব উজিরদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উপজাতিকে ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে কে কী জানেন?'

আমার বন্ধু আধ-পাগলা দোস্ত মুহম্মদ ভুল বলেননি, দেখা গেল অনেকেই অনেক কিছু জানেন, শুধু জানেন না, কোন উপজাতির সঙ্গে কোন উপজাতির শত্রুতা, কোন উপজাতির বড় বড় সর্দার উপস্থিত কারা, কাদের মধ্যস্থতায় তাদের কাছে গোপনে ঘুষ পাঠানো যায়, কোন মোল্লার কোন খুড়ো উপস্থিত কাবুলে যে, তার উপর চোটপাট করলে দেশের ভাইপো শায়েস্তা হবেন—অর্থাৎ জানবার মত কিছুই জানেন না।

তখন অনাদৃত উপেক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী বৃদ্ধদের ডাকা হল—তাঁরা বললেন যে, গত দশ বৎসর ধরে তাঁরা কোনো প্রকার কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন না বলে আফগান উপজাতিদের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজানুকম্পা বিগলিত হয়ে যে অর্থবারি তাঁদের পয়ঃপ্রণালী দিয়ে উপজাতিদের কাছে পৌঁছত, সে-সব পয়ঃপ্রণালী দশ বৎসরের অনাদরে জঞ্জালাবদ্ধ। এখন বন্যা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

অনেক ভেবে-চিন্তে আমান উল্লা তাঁর ভগিনীপতি আলী আহম্মদ খানকে জলালাবাদে পাঠালেন। শিনওয়ারীদের টাকার বানে ভাসিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, কেউ বলে দশ লাখ কেউ বলে বিশ লাখ।

শাস্ত্রের তর্কে, দর্শনের লড়াইয়ে দিশেহারা হলে ওমর খৈয়াম মৃৎপাত্র ভরে সুরা পান করতেন। সেই মাটির ভাঁড়ই নাকি তখন তাঁকে গভীরতম সত্যের সন্ধান দিত।

আমার মৃৎপাত্র আবদুর রহমান। তাকে সব খুলে বলে তার মতামত জানতে চাইলুম। গোড়ার দিকে সে আমাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে বারণ করত, কিন্তু শিনওয়ারী বিদ্রোহের পাকাপাকি খবর

শহরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজার গল্প গল্পের রাজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আবদুর রহমান বরফের জহুরী, আর সেই বরফই তার মাপকাঠি। সে বলল, 'নানা লোক নানা কথা কয়, তার হিসেব নিকেশ আমি করব কী করে? কিন্তু একটা কথা ভুলবেন না হুজুর, এই বরফ ভেঙে শিনওয়ারীরা কিছুতেই কাবুলে পৌঁছতে পারবে না। ওদের শীতের জামা নেই। বরফ গলুক, তারপর দেখা যাবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই বুঝি প্রবাদ, কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।'

ভেবে দেখলুম আবদুর রহমান কিছু অন্যায় বলেনি। ইতিহাসে দেখেছি, বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের বিদ্রোহবিপ্লবও ছেঁড়া কাঁথা গায়ে টেনে দিয়ে 'নিদ্রা যায় মনের হরিষে।'

চৌত্রিশ

এমন সময় যা ঘটল তার জন্য কেউ তৈরি ছিলেন না; প্রবীণ অর্বাচীন কারো কোনো আলোচনায় আমি এ ব্যাপারের কোনো আভাস ইঙ্গিত পাইনি।

বেলা তখন চারটে হবে। দোস্ত মুহম্মদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি রাস্তায় তুমুল কাণ্ড। দোকানীরা দুদ্দাড় করে দরজা জানালা বন্ধ করছে, লোকজন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করছে, চতুর্দিকে চিৎকার, 'ও ভাই কোথায় গেলি,' 'ও মামা শিগ্গির এসো।' লোকজনের ভিড়ের উপর দিয়ে টাঙাওয়ালারা খালি গাড়ি, বোঝাই গাড়ি এমনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চালিয়েছে যে, আমার চোখের সামনে একখানা গাড়ি হুড়মুড়িয়ে কাবুল নদীর বরফের ওপর গিয়ে পড়ল, কেউ ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

সব কিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে চিৎকার পৌঁছয়,'বাচ্চায়ে সকাও আসছে, বাচ্চায়ে সকাও এসে পড়ল।' এমন সময় গুড়ুম করে রাইফেলের শব্দ হল। লক্ষ্য করলুম শব্দটা শহরের উত্তর দিক থেকে এল। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য জনতা যেন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল। যাদের কাঁধে বোঁচকা-বুঁচকি ছিল তারা সেগুলো ফেলে দিয়ে ছুটলো, এক দল রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে নেমে গেছে, অন্য দল কাবুল নদীতে জমে-যাওয়া জলের উপর ছুটতে গিয়ে বারে বারে পিছলে পড়ছে। রাস্তার পাশে যে অন্ধ ভিখারী বসতো সে দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে, ভিড়ের ঠেলায় এদিক ওদিক টাল খাচ্ছে আর দু'হাত শূন্যে তুলে সেখানে যেন পথ খুঁজছে।

আমি কোনো গতিকে রাস্তা থেকে নেমে, নয়ানজুলি পেরিয়ে এক দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। স্থির করলুম, বিদ্রোহ বিপ্লবের সময় পাগলা ঘোড়ার চাঁট খেয়ে অথবা ভিড়ের চাপে দম বন্ধ হয়ে মরব না; মরতে হয় মরব আমার হিস্যার গুলি খেয়ে।

এক মিনিট যেতে না যেতে আর এক ব্যক্তি এসে জুটলেন। ইনি ইটালিয়ান 'কলোনেল্লো' অর্থাৎ কর্নেল, বয়স ষাটের কাছাকাছি, লম্বা করোগেটেড দাড়ি।

এই প্রথম লোক পেলুম যাকে ধীরেসুস্থে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়। বললুম 'আমি তো শুনেছিলুম ডাকাতসর্দার বাচ্চায়ে সকাও আসবে আমান উল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়বার জন্য। কিন্তু এ কী কাণ্ড?'

কলোনেল্লো বললেন, 'মনে হচ্ছে ভুল খবর। এ তো আসছে শহর দখল করবার জন্য।'

তাই যদি হয় তবে আমান উল্লার সৈন্যেরা এখনো শহরের উত্তরের দিকে যাচ্ছে না কেন, এ রকম অতর্কিতে বাচ্চায়ে সকাও এসে পৌঁছলই বা কী করে, তার দলে কী পরিমাণ লোকজন, শুধু বন্দুক না কামান-টামানও তাদের সঙ্গে আছে—এ সব অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর কলোনেল্লো দিতে পারলেন না—মাঝে মাঝে শুধু বললেন, 'কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!'

আমি বললুম, 'সাধারণ কাবুলী যে ভয় পেয়েছে সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ইয়োরোপীয়নরা এদের সঙ্গে জুটল কেন? এরা যাচ্ছে কোথায়?'

কলোনেল্লো বললেন, 'আপন আপন রাজদূতাবাসে আশ্রয়ের সন্ধানে।'

ততক্ষণে বন্দুকের আওয়াজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে—ভিড়ও দেখলুম ঢেউয়ে ঢেউয়ে যাচ্ছে, একটানা স্রোতের মত নয়। দুই ঢেউয়ের মাঝখানে আমি কর্নেলকে বললুম, 'চলুন বাড়ি যাই।' তিনি বললেন যে, শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি বাড়ি যাবেন না। মিলিটারি খেয়াল, তর্ক করা বৃথা।

বাড়ির দোরের গোড়ায় দেখি আবদুর রহমান। আমাকে দেখে তার দুশ্চিন্তা কেটে গেল। বাড়ি ঢুকতেই সে সদর দরজা বন্ধ করে তার গায়ে এক গাদা ভারি ভারি পাথর চাপাল। বিচক্ষণ লোক, ইতিমধ্যে দুর্গ রক্ষা করার যে বন্দোবস্তের প্রয়োজন সেটুকু সে করে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বেনওয়া সায়েব কোথায়?' বলল, 'তিনি মাত্র একটি সুটকেশ নিয়ে টাঙায় করে ফ্রেঞ্চ লিগেশনে চলে গিয়েছেন।'

ততক্ষণে বন্দুকের শব্দের সঙ্গে মেশিনগানের একটানা ক্যাট্‌ক্যাট্ যোগ দিয়েছে। আবদুর রহমান চা নিয়ে এসেছিল। কান পেতে শুনে বলল, 'বাদশার সৈন্যরা গুলি আরম্ভ করেছে। বাচ্চা মেশিনগান পাবে কোথায়?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'বাদশার সৈন্যরা কি এতক্ষণে বাচ্চার মুখোমুখি হল? তবে কি সে বিনা বাধায় কাবুল পৌঁছল?'

আবদুর রহমান বলল, 'দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেককেই তো জিজ্ঞেস করলুম, কেউ কিছু বলতে পারল না। বোধ হচ্ছে বাচ্চা বিনা বাধায়ই এসেছে। ওর দেশ হল কাবুলের উত্তর দিকে, আমার দেশ পানশির—তারও উত্তরে। ওদিকে কোনো বাদশাহি সৈন্যের আনাগোনা হলে আমি দেশের লোকের কাছ থেকে বাজারে খবর পেতুম। বাদশাহি সৈন্যের সবাই তো এখন পুব দিকে শিনওয়ারীদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছে—আলী আহম্মদ খানের তাঁবেতে।'

গোলাগুলি চলল। সন্ধ্যা হল। আবদুর রহমান আমাকে তাড়াতাড়ি খাইয়েদাইয়ে আগুনের তদারকিকে বসল। তার চোখমুখ থেকে আন্দাজ করলুম, সে কাবুলীদের মত ভয় পায়নি। কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম, বাচ্চা যদি জেতে তবে লুটতরাজ নিশ্চয় হবে এবং তাই নিয়ে আমার মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সে ঈষৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু এসব ছাপিয়ে উঠেছে তার কৌতূহল আর উত্তেজনা—শহরে সার্কাস ঢুকলে ছেলেপিলেদের যে রকম হয়।

কিন্তু এই বাচ্চায়ে সকাওটি কে? আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করতে হল না, সে নিজের থেকেই অনেক কিছু বলল এবং তার থেকে বুঝলুম যে, আবদুর রহমান বরফের জহুরী, ফ্রস্ট-বাইটের ওঝা, রন্ধনে ভীমসেন, ইন্ধনে নলরাজ, সব কিছুই হতে পারেন, কিন্তু বসওয়েল হতে এখনো তার ঢের দেরি। বাচ্চায়ে সকাও সম্বন্ধে সে যা বলল তার উপরে উত্তম রবিনহুড খাড়া করা যায়, কিন্তু সে বস্তু জলজ্যান্ত মানুষের জীবনী বলে চালানো অসম্ভব।

চোদ্দ আনা বাদ দেওয়ার পরও যেটুকু রইল তার থেকে বাচ্চার জীবনের এইটুকু পরিচয় পাওয়া গেল যে, সে প্রায় শ'তিনেক ডাকাতের সর্দার, বাসস্থান কাবুলের উত্তরদিকে কুহিস্থানে, ধনীকে লুটে গরীবকে পয়সা বিলোয়. আমান উল্লা যখন ইয়োরোপে ছিলেন তার পরাক্রম তখন এমনি বেড়ে গিয়েছিল যে, কাবুল-কুহিস্থানের পণ্য-বাহিনীর কাছ থেকে সে রীতিমত ট্যাক্স আদায় করত। আমান উল্লা ফিরে এসে কুহিস্থানের হাটে-বাজারে নোটিশ লাগান, 'ডাকাত বাচ্চায়ে সকাওয়ের মাথা চাই. পুরস্কার পাঁচ শ' টাকা'। বাচ্চা সেগুলো সরিয়ে পাল্টা নোটিশ লাগায়; 'কাফির আমান উল্লার মাথা চাই. পুরস্কার এক হাজার টাকা।'

আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করল, 'কর্নেলের ছেলে আমাকে শুধালো যে, আমি যদি আমান উল্লার মুণ্ডুটা কাটি, আর আমার ভাই যদি বাচ্চায়ে সকাওয়ের মুণ্ডুটা কাটে তবে আমরা দু'জনে মিলে কত টাকা পাব?' আমি বললুম, 'দেড় হাজার টাকা।' সে হেসে লুটোপুটি; বলল, 'এক পয়সাও নাকি পাব না। বুঝিয়ে বলুন তো হুজুর, কেন পাব না?'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'কেউ জ্যান্ত নেই বলে তোমাদের টাকাটা মারা যাবে বটে, কিন্তু কর্নেলের ছেলেকে বলো যে, তখন আফগানিস্থানের তখৎ তোমাদের পরিবারে যাবে।'

আরো শুনলুম, বাচ্চায়ে সকাও নাকি দিন দশেক আগে হঠাৎ জবলুস-সিরাজের সরকারি বড় কর্তার কাছে উপস্থিত হয়ে কোরান ছুঁয়ে কসম খেয়েছিল যে, সে আমান উল্ল'র হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়বে এবং সেই কসমের জোরে, শ'খানেক রাইফেল তার কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

তবে কি সেই বন্দুকগুলো নিয়েই বাচ্চার দল আমান উল্লাকে আক্রমণ করেছে? আশ্চর্য হবার কী আছে? আমান উল্লা যখন উপজাতিদের কাছ থেকে তোলা ট্যাক্সের পয়সায় ফৌজ পুষে তাদের কাবুতে রাখেন তখন বাচ্চাই বা আমান উল্লার কাছ থেকে বন্দুক বাগিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবে না কেন?

রাত তখন বারোটা। আবদুর রহমান বলল, 'আজ আমি আপনার বসবার ঘরে শোব।'

আমি বললুম, 'তুমি তো ঠাণ্ডা ঘর না হলে ঘুমোতে পারো না। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাকে এত দুর্ভাবনা করতে হবে না।'

আবদুর রহমান বলল, 'কিন্তু আমি অন্য ঘরে শুলে আমার বিপদ-আপদের খবর আপনি পাবেন কী করে? আমার জান বাবা আপনার হাতে সঁপে দিয়ে যাননি?'

কথাটা সত্যি। আবদুর রহমান আমার চাকরিতে ঢুকেছে খবর পেয়ে তার বুড়ো বাপ গাঁ থেকে এসে আমাকে তার জানের মালিক, স্বভাবচরিত্রের তদারকদার এবং চটে গেলে খুন করবার হক দিয়ে গিয়েছিল। আমি বুড়োকে খুশি করার জন্য 'সিংহ ও মুষিকে'র গল্প বলেছিলুম।

কিন্তু আবদুর রহমানের ফন্দিটা দেখে অবাক হলুম। সাক্ষাৎ নিউটন। এদিকে বাক্সে দুটো ফুটো করে দুটো বেড়ালের জন্য, অন্য দিকে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও আবিষ্কার করতে পারে—একদিকে কর্নেলের ছেলের ধাঁধায় বোকা বনে যায়, অন্য দিকে তর্কে বাঙালীকেও কাবু করে আনে।

আবদুর রহমান শুয়ে শুয়ে 'কতলে-আম' অর্থাৎ পাইকারী খুন-খারাবি লুটতরাজের যে বর্ণনা দিল তার থেকে বুঝলুম বাচ্চায়ে সকাও যদি শহর দখল করতে পারে তবে তার কোনোটাই বাদ যাবে না। চেঙ্গিস, নাদির রাজা-বাদশা হয়ে যখন এ সব করতে পেরেছেন তখন বাচ্চা ডাকাত হয়ে এসব করবে না সে আশা দিদিমার রূপকথাতেও করা যায় না।

ইরান আফগানিস্থান চীন প্রভৃতি সভ্য দেশে সাজা দেওয়ার নানা রকম বিদগ্ধ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া, কোমর অবধি মাটিতে পুঁতে চতুর্দিক থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে মারা, পেট কেটে চোখের সামনে নাড়িভুঁড়ি বের করে করে মারা, জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া তুলে মারা ইত্যাদি বহুতর কায়দার অনেক চাক্ষুষ বর্ণনা আমি শুনেছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে লম্বা পেরেক দিয়ে দু'কান দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া। আবদুর রহমানের কাছ থেকে শোনা, সে অবস্থায়ও নাকি মানুষের ঘুম পায়, আর মাথা বার বার ঝুলে পড়ে। তার তুলনায় রাইফেল-মেশিনগানের শব্দ, আর চেঙ্গিস নাদিরের কাহিনীস্মরণ ধুলি পরিমাণ। কাজেই সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়াটা বীর অথবা কাপুরুষ কোনো কিছুরই লক্ষণ নয়।

সকালবেলা দেউড়ি খুলে দেখি শহরে মেলার ভিড়। কাবুল শহরের আশেপাশের গাঁ থেকে নানা রকম লোক এসে জড়ো হয়েছে, সুযোগসুবিধে পেলে লুটে যোগ দেবে বলে। অনেকের কাঁধে বন্দুক, শীতের ভারি ভারি জামার ভিতর যে ছোরা পিস্তলও আছে সেটাও অনায়াসে বোঝা গেল। আবদুর রহমানের বাধা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটার তদারকতদন্ত করবার জন্য।

আর্ক কাবুল শহরের ভিতরকার বড় দুর্গ—হুমায়ুনের জন্ম এই আর্কের ভিতরেই হয়েছিল। আর্কথেকে বড় রাস্তা বেরিয়ে এসে কাবুল নদীর পারে ঠেকেছে, তাকেই কাবুলের চৌরঙ্গী বলা যেতে পারে। সেখানে

দেখি একটা বড় রকমের ভিড় জমেছে। কাছে গিয়ে বুঝলুম কোনো এক বড় রাজকর্মচারী— অফিসারও হতে পারেন—কাবুল শহরের লোকজনকে বাচ্চার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য শলা-মন্ত্রণা দিচ্ছেন।

'ওজার্ম সিতোআইয়াঁ'—'ধরো হাতিয়ার, ফ্রান্সের লোক, বাঁধো দল, বাঁধো দল' ধরনের ওজস্বিনী ফরাসিনী বক্তৃতা নয়—ভদ্রলোকের মুখ শুকনো, ফ্যাকাশে ঠোঁট কাঁপছে আর বিড় বিড় করে যা বলছেন দশ হাত দূর থেকে তা শোনা যাচ্ছে না।

টিমের কাপ্তান যে রকম প্র্যাক্টিসের পূর্বে আঁটা আঁটা হকিস্টিক বিলোয় তেমনি গাদা গাদা দামী ঝকঝকে রাইফেল বিলোনো হচ্ছে। বলা নেই কওয়া নেই, যার যা ইচ্ছে এক একখানা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। শুধু লক্ষ্য করলুম উত্তর দিকে কেউই গেল না—অথচ লড়াই হচ্ছে সেই দিকেই।

রাইফেল বিলোনো শেষ হতেই ভদ্রলোক তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন। বিপজ্জনক অবশ্যকর্তব্য কর্ম অর্ধসমাধান করে মানুষ যে রকম তড়িঘড়ি অকুস্থান থেকে সরে পড়ে। তখন চোখে পড়ল তার পরনে পাজামা-কুর্তা-জুব্বা-পাগড়ী—দেরেশি নয়। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখি কারো পরনেই দেরেশি নয়, আর সকলের মাথায়ই পাগড়ি। আমার পরনে স্যুট, মাথায় হ্যাট— অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

এমন সময় দেখি ভিড় ঠেলে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছেন মির আসলম। কোনো কথা না কয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চললেন—আমার কোনো প্রশ্নের উত্তরে মুখ না খুলে, কোনো কথায় কান না দিয়ে। বাড়ি পৌঁছতেই আমাদের দু'জনকে দেখে আবদুর রহমান কী একটা বলে তিন লম্ফে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোল।

মির আসলম আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন। 'এ কি তামাশা দেখার সময়, না ইয়ার্কি করে ঘুরে বেড়াবার মোকা? তাও আবার দেরেশি পরে?'

আমি শুধু বললুম, 'কী করে জানবো বলুন যে, দেরেশি পরার আইন মকুব হয় গিয়েছে?'

মির আসলম বললেন, 'মকুব বাতিলের প্রশ্ন এখন কে শুধায় বাপু! যে কোনো মুহূর্তে বাচ্চায়ে সকাও শহরে ঢুকতে পারে। কাবুলীরা তাই দেরেশি ফেলে ফের 'মুসলমান' হয়েছে। দেখলে না ইস্তক সর্দার খান জোব্বা পরে রাইফেল বিলোলেন।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কী কথা, রাজপরিবার পর্যন্ত ভয় পেয়ে দেরেশি ছেড়েছেন?'

মির আসলম বললেন 'উপায় কী বলো? বাদশাহী ফৌজ থেকে সৈন্যরা সব পালিয়েছে। এখন আমান উল্লার একমাত্র ভরসা যদি কাবুল শহরের লোক রাইফেল বন্দুক নিয়ে বাচ্চাকে ঠেকাতে পারে। তাদের খুশি করার জন্য দেরেশি বর্জন করা হয়েছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন রাজধানীর সৈন্যরা কখনো বিদ্রোহ করে না।'

'বিদ্রোহ তারা করেনি। তারা সব পালিয়েছে। যাদের বাড়ি বহু দূরে, বরফ ভেঙে এখন যে সব জায়গায় পৌঁছানো যায় না, তারা এখনো শহরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। যারা নিতান্ত গা ঢাকাও দিতে পারেনি, তারাই লড়তে গেছে, অন্তত আমান উল্লার বিশ্বাস তাই। আসলে তারা দেহ্-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে বসে চন্দ্রসূর্য তাগ করে গুলি ছুঁড়ছে। বাচ্চাকে এখনো ঠেকিয়ে রেখেছে আমান উল্লার দেহরক্ষী খাস সৈন্যদল।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'মৌলানার বাসা তো দেহ্-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে। চলুন, তাঁর খবর নিয়ে আসি।'

মির আসলম বললেন, 'শান্ত হও। আমি সকালে সেই দিকেই গিয়েছিলুম, কিন্তু মৌলানার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি। সেখানে লড়াই হচ্ছে। আমি মোল্লা মানুষ—কাবুল শহর আমাকে চেনে। আমি যখন সেখানে পৌঁছতে পারিনি, তুমি যাবে কী করে?'

এ সংবাদ শুনে আমার মন থেকে অন্য সব প্রশ্ন মুছে গেল। চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কিছু করার উপায় আছে কি না। মীর আসলম আমাকে বাড়ি থেকে বেরতে পই পই করে বারণ করে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে আবদুর রহমান একখানা নতুন রাইফেল নিয়ে উপস্থিত। চোখে মুখে খুশি উপছে পড়ছে। বলল, 'হুজুর, চট করে একখানা কাগজে লিখে দিন আপনার রাইফেল নেই। আমি আরেকটা নিয়ে আসি।' আমি তখন মৌলানার কথা ভাবছি—আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আবদুর রহমান চলে গেল।

লুটপাট আরম্ভ হয়নি সত্য, কিন্তু হতে কতক্ষণ? সকালবেলা যখন বেরিয়েছিলুম তখন কোথাও কোনো পুলিশ দেখতে পাইনি। রাজার দেহরক্ষীরা পর্যন্ত বাচ্চাকে ঠেকাতে গিয়েছে, এখন শহর রক্ষা করবে কে? আর এ-পরিস্থিতি আফগান ইতিহাসে কিছু অভিনব বস্তু নয়। বাবুর বাদশাহ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কাবুল শহরে কোনো প্রকার অশান্তির উদ্ভব হলেই আশপাশের চোর-ডাকাত শহরের আনাচে কানাচে শিকারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করত। মীর আসলম আবার আরেকটা সুখবর দিলেন যে, বাবুরের আমলে কাবুল আজকের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য ছিল। অসম্ভব নয়, কারণ বাবুর লিখেছেন অশান্তির পূর্বাভাস দেখতে পেলেই তিনি রাস্তায় রাস্তায় সেপাই মোতায়েন করতেন, আমান উল্লা যে পারেননি সে তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

অবশ্য একটা সান্ত্বনার কথা হচ্ছে এই যে, কাবুলের বসতবাড়ি লুট করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক বাড়ি দুর্গের মত করে বানানো—চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, সেও আবার খানিকটা উঠে ভিতরের দিকে বেঁকে গিয়েছে—তাতে সুবিধে এই যে, মই লাগিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়ার উপায় নেই। দেয়ালের গায়ে আবার এক সারি ছেঁদা;বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে সে ছেঁদা দিয়ে রাইফেল গলিয়ে নির্বিঘ্নে বাইরে গুলি চালানো যায়। বাড়িতে ঢোকার জন্য মাত্র একখানা বড় দরজা—সে দরজা আবার শক্ত ঝুনো কাঠে তৈরি, তার গায়ে আবার ফালি ফালি লোহার পাত পেরেক দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

মোক্ষম বন্দোবস্ত। দুখানা রাইফেল দিয়ে পঞ্চাশজন ডাকাতকে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যায়। কারণ যারা রাস্তা থেকে হামলা করবে তাদের কোনো আচ্ছাদন আবরণ নেই যার তলা থেকে রাইফেলের গুলী বাঁচিয়ে দেওয়াল ভাঙবার বা দরজা পোড়াবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ডিসেম্বরের শীতে সমস্ত রাত ছাদের উপর টহল দিয়ে নজর রাখবে কে? বড় পরিবার হলে কথা নেই, পালা দিয়ে পাহারা দেওয়া যায়; কিন্তু এ স্থলে প্রাচীন সমস্যা, 'কাকা আর আমি একা, চোর আর লাঠি দু'জন।' বরঞ্চ তার চেয়েও খারাপ। চোর না হয়ে এরা হবে ডাকাত, হাতে লাঠি নয় বন্দুক—আর সংখ্যায় এদের নারায়ণী সেনা হতেও আপত্তি নেই।

এ অবস্থায় মৌলানা আর তার তরুণী ভার্যাকে ডেকে আনি কোন বুদ্ধিতে? কিন্তু ওদিকে তাঁরা হয়তো রয়েছেন 'আণ্ডার দি ফায়ার' দুই ফৌজের মাঝখানে। স্থির করলুম, বেশি ভেবে কোনো লাভ নেই। মৌলানার পাড়ায় ঢুকবার সুযোগ পেলেই তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলে নির্বাচনের ভারটা তাঁরই হাতে ছেড়ে দেব।

আবদুর রহমান খবর দিল, বাচ্চার ডাকুরা অ্যারোড্রোম দখল করে ফেলেছে বলে আমান উল্লার হাওয়াই জাহাজ উঠতে পারছে না।

আমি শুধালুম, 'কিন্তু আমান উল্লা বিদেশ থেকে যে সব ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ি এনেছিলেন সে সব কী হল?'

নিরুত্তর।

'কাবুল বাসিন্দাদের যে রাইফেল দেওয়া হল, তারা লড়তে যায়নি?'

আবদুর রহমান যা বললো তার হুবহু তর্জমা বাঙলা প্রবাদে আছে। শুধু এ স্থলে উলুখড়ের দু'খানা

পা আছে বলে দু' রাজার মাঝখানে সে যেতে রাজি হচ্ছে না। আমি বললুম, 'তাজ্জবের কথা বলছ আবদুর রহমান, বাচ্চায়ে সকাও ডাকাত, সে আবার রাজা হ'ল কী করে?' আবদুর রহমান যা বললো তার অর্থ, বাচ্চা শুক্রবার দিন মোল্লাদের হাত থেকে তাজ পেয়েছে, খুতবায় (আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে) তার নাম বাদশা হিসেবে পড়া হয়েছে, আমান উল্লা কাফির সে ফতোয়া প্রচারিত হয়েছে ও বাচ্চায়ে সকাও বাদশাহ হবীব উল্লা খান নাম ধারণ করে কাবুল শহর থেকে 'কাফির' আমান উল্লাকে বিতাড়িত করবার জন্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

অদৃষ্টের পরিহাস। আমান উল্লার পিতার নাম হবীব উল্লা। আততায়ীর হস্তে নিহত হবীব উল্লার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা কি স্বীয় নামেই প্রতিহিংসার রক্ত অনুসন্ধান করছে?

সন্ধ্যার দিকে আবদুর রহমান তার শেষ বুলেটিন দিয়ে গেল; আমান উল্লার হাওয়াই জাহাজ কোনো গতিকে উঠতে পারায় বোমা ফেলেছে। বাচ্চার দল পালিয়ে গিয়ে মাইলখানেক দূরে থানা গেড়েছে।

পঁয়ত্রিশ

জনমানবহীন রাস্তা। অথচ শান্তির সময় এ-রাস্তা গমগম করে। আমার গা ছমছম করতে লাগল।

দুদিকের দোকানপাট বন্ধ। বসত-বাড়ীর দেউড়ি বন্ধ। বাসিন্দারা সব পালিয়েছে না ঘুপটি মেরে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, বোঝবার উপায় নেই। যে কুকুব-বেড়াল বাদ নিয়ে কাবুলের রাস্তার কল্পনা করা যায় না, তারা সব গেল কোথায়? যেখানে গলি এসে বড় রাস্তায় মিশেছে, সেখানে ডাইনে-বাঁয়ে উঁকি মেরে দেখি একই নির্জনতা। এসব গলি শীতের দিনেও কাচ্চাবাচ্চার চিৎকারে গরম থাকে, মানুষের কানের তো কথাই নেই, বরফের গাদা পর্যন্ত ফুটো হয়ে যায়। এখন সব নিঝ্‌ঝুম, নীরব। গলিগুলোর চেহারা এমনিতেই নোংরা থাকে, এখন জনমানবের আবরণ উঠে যাওয়াতে যেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সর্বাঙ্গের ঘা-পাঁচড়া দেখাতে আরম্ভ করেছে।

শহরের উত্তরপ্রান্ত। পর্বতের সানুদেশ। মৌলানার বাড়ী এখনো বেশ দূরে। বাচ্চার একদল ডাকাত এদিকে আক্রমণ করেছিল। তারা সব পালিয়েছে, না আড়ালে বসে শিকারের অপেক্ষা করছে, কে জানে?

হঠাৎ দেখি দূরে এক রাইফেলধারী। আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ডাইনে-বাঁয়ে গলি নেই যে ঢুকে পড়ব। দাঁড়িয়ে অথবা পিছন ফিরে লাভ নেই—আমি তখন মামুলি পাখী-মারা বন্দুকের পাল্লার ভিতরে। এগিয়ে চললুম। মনে হল রাইফেলধারীও আমাকে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু আমাকে হাতিয়ারহীন দেখে কাঁধে ঝোলানো রাইফেল হাতে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি। দু'জনে মুখোমুখি হলুম, সে একবার আমার মুখের দিকে তাকালোও না। চেহারা দেখে বুঝলুম, সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। তবে কি আমারই মত কারো সন্ধানে গিয়েছিল, নিরাশ হয়ে ফিরছে? কে জানে, কী?

মৌলানার বাড়ী গলির ভিতরে। সেখানে পৌঁছনো পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। কিন্তু এবারে নতুন বিপদ; দরজায় কড়া নেড়ে নেড়ে হাতে কড়া পড়ে গেল—কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে কি মৌলানারা কেউ নেই? অথবা সে শীতে দরজা-জানালা সব কিছু বন্ধ বলে কড়া নাড়া, আমার চিৎকার, কিছুই তাঁদের কানে পৌঁচচ্ছে না। কতক্ষণ ধরে চেঁচামেচি করেছিলুম বলতে পারব না, হঠাৎ আমার মনে আরেক চিন্তার উদয় হল। মৌলানা যদি গুম্ হয়ে গিয়ে থাকেন, আর তার বউ বাড়ীতে খিল দিয়ে বসে আছেন, স্বামীর গলা না শুনলে দরজা খুলবেন না; অথবা একা থেকে থেকে ভয়ে মূর্ছা গেছেন? আমার গলা থেকে বিকৃত চিৎকার বেরতে লাগল। নিজের নাম ধরে পরিচয় দিয়ে চেঁচাচ্ছি, মনে হচ্ছে, এ আমার গলা নয়, আমার নাম নয়।

হঠাৎ শুনি মিয়াও; জিয়াউদ্দীনের বেড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মৌলানা। চোখ ফোলা, গলা [illegible]সিতে ভাঙা—আরো বসে গিয়েছে। দু'দিনে দশ বছর বুড়িয়ে গিয়েছেন।

বললেন, [illegible] প্রথম গোলমাল শুরু হতেই চাকরকে টাঙা আনতে পাঠিয়েছিলেন, সে এখনো

ফেরেনি। পাড়ার আর সবাই পালিয়েছে। ইতিমধ্যে বাচ্চার সেপাই দু'বার এ-রাস্তা দিয়ে নেমে এসে দু'বার হটে গিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী আল্লার হাতে জান সঁপে দিয়ে ডাকাতের হানার অপেক্ষা করছিলেন।

সে তো হল। কিন্তু এখন চল। এই নির্জন ভুতুড়ে পাড়ায় আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। তখন মৌলানা যা বললেন, তা শুনে বুঝলুম, এ সহজ বিপদ নয়। তাঁর স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা। আমার বাড়ী পর্যন্ত হেঁটে যাবার মত অবস্থা হলে তিনি বহু পূর্বেই চলে আসতেন।

বললুম, 'তাহলে আর বসব না। টাঙার সন্ধানে চললুম।'

শহরে ফিরে এসে পাক্কা দু'ঘণ্টা এ-আস্তাবল, সে-বাগ্‌গীখানা অনুসন্ধান করলুম। একটা ঘোড়া দেখতে পেলুম না, শুনলুম, ডাকাত এবং রেকুইজিশনের ভয়ে সবাই গাড়ী ফেলে ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে।

এখন উপায়? একমাত্র উপায় আবদুর রহমানের গায়ের জোর। মৌলানার বউকে কোলে-কাঁধে করে বাড়ী নিয়ে আসতে পারবে নিশ্চয়ই কিন্তু—নাঃ, এতে কোনো কিন্তু নেই। রাজি করাতেই হবে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে যে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলুম, তেমনটা জীবনে আর কখনো দেখিনি। আমার আঙ্গিনা যেন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীর সামনের গৌর-প্রাঙ্গণ; বেনওয়া সায়েব আর মৌলানা নিশ্চিন্তের মত দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে গল্প করছেন। আবদুর রহমানও সসম্ভ্রম গলা-খাখারি দিয়ে বোঝালো, 'পর্দা বাঁধকে—জনানা হ্যায়।'

জিয়াউদ্দীন বললেন যে, আমি চলে আসার ঘণ্টাখানেক পরেই নাকি তাঁর চাকর টাঙা নিয়ে উপস্থিত হয়। আনন্দের আতিশয্যে প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলুম না, এ-দুর্দিনে সে টাঙা পেল কোথায়।

তারপর তাকিয়ে দেখি, বেনওয়া সায়েবের গালে দু'দিনের দাড়ি, কোট-পাতলুন দুমড়ানো, চেহারা অধৌত। ভদ্রলোক ফরাসী, হামেশাই ফিটফাট থাকেন—শান্তিনিকেতনের সবাই জানে যে, বিদেশিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বাঙালী ফিটবাবুর মত ধুতি কুঁচিয়ে পরতে জানতেন, শুধু তাই নয়, বাঁ-হাত দিয়ে কোঁচাটি ডানদিকে টেনে নিয়ে খানিকটা উঁচুতে তুলে দরকার হলে হনহন করে হাঁটতেও পারতেন।

বললেন, পরশুদিন টাঙা ফরাসী লিগেশনে পৌঁছতে পারেনি—লিগেশন শহরের উত্তর দিকে বলে পাগলা জনতা উজিয়ে গাড়ি খানিকটে চলার পর গাড়ি-গাড়োয়ান দু'জনই দিশেহারা হয়ে যায়, শেষটায় গাড়োয়ান সায়েবের কথায় কান না দিয়ে সোজা গ্রামের রাস্তা ধরে পূর্বদিকে তিন মাইল দূরে নিজের গাঁয়ে উপস্থিত হয়। সায়েব দু'রাত্তির একদিন গরীব চাষার গোয়াল-ঘরে না আর কোথাও লুকিয়ে কাটিয়েছেন। দু'চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর নাকি গাড়োয়ান আর তার ভাই-বেরাদর গলার উপর হাত চালিয়ে সায়েবকে বুঝিয়েছে যে, কাবুল শহরের সব ফিরিঙ্গিকে জবাই করা হচ্ছে। বেনওয়া সাহেব ভালো সাহিত্যিক, কাজেই বর্ণনাটা দিলেন বেশ রসিয়ে রসিয়ে, আপন দুশ্চিন্তা-উদ্বেগটা ঢেকে-চেপে, কিন্তু চেহারা দেখে বুঝতে পারলুম যে, ১৯১৪-১৮ সালের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার তুলনায় এই অভিজ্ঞতার মূল্য তিনি কিছু কম দেননি।

মৌলানা বললেন, 'সায়েব, বড় বেঁচে গেছেন; গাঁয়ের লোক যে আপনার গলা কেটে 'গাজী' হবার লোভ সম্বরণ করতে পেরেছে সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

বেনওয়া বললেন, 'চেষ্টা হয়নি কি না বলতে পারব না। যখনই দেখেছি দু'তিনজন মিলে ফিসফাস করছে, তখনই সন্দেহ করেছি, আমাকে নিয়েই বুঝি কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বাড়ীওয়ালা আমাকে অতিথি হিসেবে ধরে নিয়ে আমার প্রাণ বাঁচানো নিজের কর্তব্য বিবেচনা করে আর পাঁচজনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।'

আমি বললুম, 'আমি কাবুলের গাঁয়ে এক বছর কাটিয়েছি, আমার বিশ্বাস, কাবুল উপত্যকার সাধারণ চাষা অত্যন্ত নিরীহ। পারতপক্ষে খুন-খারাবি করতে চায় না।'

বেনওয়া সায়েব বেশভূষা পরিবর্তন করে আপন লিগেশনে চলে গেলেন।

আমি মৌলানাকে বললুম, 'দেখলে, ফরাসী, জর্মন, রুশ, তুর্ক, ইরানি, ইতালি সবাই আপন আপন লিগেশনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। শুধু তোমার-আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

মৌলানা বললেন, 'বৃটিশ লিগেশন বৃটিশের জন্য—বাঙলা কথা। যদিও লিগেশন তৈরি ভারতীয় অর্থে, চলে ভারতের পয়সায়, ইস্তেক হিজ ব্রিটানিক ম্যাজেস্টিস মিনিস্টার লেফটেনাণ্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিস নুন খান ভারত সরকারের।'

আমি বললুম, 'বিস্তর নুন; মাসে তিন চার হাজার টাকার।'

দুজনেই একবাক্যে স্বীকার করলুম যে, পরাধীন দেশের অবমাননা লাঞ্ছনা বিদেশ না গেলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না।

জর্মন কবি গ্যেটে বলেছেন, যে বিদেশ যায়নি, সে স্বদেশের স্বরূপ চিনতে পারেনি।

ছত্রিশ

চারদিন অরাজকতার ভিতর দিয়ে কাটল। কনফুৎসিয় বলেছেন, 'বাঘ হতে ভয়ঙ্কর অরাজক দেশ', আমি মনে মনে বললুম, 'তারও বাড়া যবে ডাকু পরে রাজবেশ।'

আমান উল্লা বসে আছেন আর্কের ভিতরে। তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা শহরের লোককে সাধ্য-সাধনা করছে বাচ্চার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য। কেউ কান দিচ্ছে না। শহর চোরডাকাতে ভর্তি। যেসব বাড়ী পাকাপোক্ত মাল দিয়ে তৈরি নয়, সেগুলো লুট হচ্ছে। একটুখানি নির্জন রাস্তায় যাবার যো নেই—ওভারকোটের লোভে শীত-কাতুরে ফিচকে ডাকাত সব কিছু করতে প্রস্তুত। টাকার চেয়েও ডাকাতের লোভ ঐ জিনিসের উপর—কারণ টাকা দিয়েও কোনো কিছু কেনার উপায় নেই। হাট বসছে না বলে দুধ, মাংস, আলু, পেঁয়াজ কিছুই কেনা যাচ্ছে না। গম-ডালের মুদীও গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, দাম চড়বার আশায়—কাবুল শহর বাকি দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

শ্বেতাঙ্গরা রাস্তায় বেরচ্ছে না; একমাত্র রুশ পাইলটরা নির্ভয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে ভিড ঠেলে বিমানঘাঁটিতে যাওয়া-আসা করছে। হাতে রাইফেল পর্যন্ত নেই, কোমরে মাত্র একটি পিস্তল।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম খাস কাবুল বাসিন্দাদের ব্যবহার দেখে। রাইফেল ঝুলিয়েছে কাঁধে, বুলেটের বেল্ট বেঁধেছে কোমরে, কেউ পরেছে আড়াআড়ি করে পৈতের মত বুকের উপরে, কেউবা বাজুবন্ধ বানিয়ে বাহুতে, কেউ কাঁকন করে কব্জীতে, দু'একজন মল করে পায়ে।

যে অস্ত্র বিদ্রোহী, নরঘাতক, দস্যুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য দীন আফগানিস্থান নিরন্ন থেকে ক্রয় করেছিল, সে আজ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হল।

কিন্তু আশ্চর্য, নগরী রক্ষা করাতে এদের কোনো উৎসাহ নেই! দস্যু জয়লাভ করলে লুণ্ঠিত হবার ভয় নেই, প্রিয়জনের অপমৃত্যুর আশঙ্কা সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন, সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি!

মির আসলম কানে কানে বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন, কাবুলের বড় বড় মহল্লার সর্দার আর বাচ্চার ভিতরে গোপনে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে যে, কাবুলীরা যদি আমান উল্লার হয়ে না লড়ে, তবে বাচ্চা শহর লুট করবে না।

কথাগুলো যীশু খ্রীস্টের করাঙ্গুলি হয়ে আমার অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিল। মির আসলমের খবর সত্য বলে ধরে নিলে কাবুলবাসীর নির্বিকল্প সমাধির চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু হায়, অস্ত্রবলে হীন, অর্থ-সামর্থ্যে দীন যে রাজা শুদ্ধ সাহসের বলে বিশ্বরাজ ইংরেজকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করলেন, অনুর্বর অনুন্নত দেশকে যে রাজা প্রগতিপথে চালিত করবার জন্য আপন সুখ-শান্তি বিসর্জন দিলেন, বিশ্বের সম্মুখে যে নরপতি আপন দেশের মুখোজ্জ্বল করলেন তাঁকে বর্জন করে

কাবুলের লোক বরণ করল ঘৃণ্য নীচ দস্যুকে? একেই কি বলে কৃতজ্ঞতা, নিমকহালালি?

তবে কি আমান উল্লা 'কাফির'?

মির আসলম গর্জন করে বললেন, 'আলবাৎ না; যে-রাজা প্রজার ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না, নমাজ, রোজা যিনি বারণ করেননি, হজে যেতে জকাত দিতে যিনি বাধা দেননি, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মহাপাপ, তাঁর শত্রুর সঙ্গে যোগ দেওয়া তেমনি পাপ। পক্ষান্তরে বাচ্চায়ে সকাও খুনী ডাকাত— ওয়াজিব-উল-কৎল্, কতলের উপযুক্ত। সে কস্মিনকালেও আমির-উল-মুমিনীন (বাদশা) হতে পারে না।'

মির আসলম বহু শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। আমার বিবেকবুদ্ধিও তাঁর কথায় সায় দিল। তবু বললুম, 'কিন্তু আপনি আবার কবে থেকে আমান উল্লার খয়ের খাঁ হলেন?'

মির আসলম আরো জোর হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'আমি যা বলেছি, তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক; আমি বলি, আমান উল্লা কাফির নয়। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না-জায়িজ—অশাস্ত্রীয়।'

নাস্তিক রাশান রাজদূতাবাসে গিয়ে শুনি সেখানেও ঐ মত। দেমিদফকে বললুম, 'রেভোলিউশন আরম্ভ হয়েছে।' তিনি বললেন, 'না, রেবেলিয়ন।' আমি শুধালুম, 'তফাৎটা কী?' বললেন 'রেভোলিউশন প্রগতিকামী, রেবেলিয়ন প্রগতিপরিপন্থী।'

ভাবলুম মির আসলমকে এ-খবরটা দিলে তিনি খুশি হবেন। বুড়ো উল্টে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সমরকন্দ-বুখারার মুসলিমদের উচিত রুশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। রুশ সরকার তাদের মক্কায় হজ করতে যেতে দেয় না।'

খামখেয়ালি ছোটলাটের আশু আগমন সংবাদ শুনে যে রকম গাঁয়ের পণ্ডিত হতবুদ্ধি হয়ে যান, মৌলানা আর আমি সেই রকম একে অন্যের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই। মৌলানার বউ যে-বড়লাটকে নিমন্ত্রণ করে বসে আছেন, তিনি কোন দিন কোন গাড়ীতে কী কায়দায় আসবেন, তাঁকে কে অভ্যর্থনা করবেন, তিনি এলে তাঁকে কোথায় রাখতে হবে, কী খাওয়াতে পরাতে হবে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ আমাদের কারো হয়নি—মৌলানার বউও কিছুই জানেন না; তাঁর এই প্রথম বাচ্চা হচ্ছে।

শুনেছি আফগান মেয়েরা ক্ষেতের কাজ খানিকক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে সন্তান প্রসব করে—আসন্নপ্রসবার জন্য আফগান পণ্যবাহিনীও নাকি প্রতীক্ষা করে না। সে নাকি বাচ্চা কোলে করে একটু পা চালিয়ে পণ্যবাহিনীতে আবার যোগ দেয়। মৌলানার বউ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, তাঁর কাছ থেকে এরকম কসরৎ আশা করা অন্যায়। লক্ষণ দেখেও আমরা ঘাবড়ে গেলুম। কিছু খেতে পারেন না, রাত্তিরে ঘুম হয় না, সমস্ত দিন ঢুলুঢুলু চোখ, মৌলানাকে এক মিনিটের তরে সেই ঢুলুঢুলু চোখের আড়াল হতে দেন না।

অন্যের প্রাণহরণ করা ব্যবসা হলেও নিজের প্রাণ দেবার বেলা সব মানুষের একই আচরণ। ডাক্তার কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরতে রাজি হল না। সেদিন তাকে যা সাধা-সাধনা করেছিলুম, তার অর্ধেক তোষামোদে কালো ভঙ্গজ মেয়ের জন্য বিনাপণে নিকষ্যি নটবর বর মেলে। বাড়ী ফেরার সময় সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ডাক্তারি পড়াব—শ্মশান-বৈরাগ্যের মত এ হল শ্মশান-প্রতিজ্ঞা।

সিভিল সার্জন যে রকম গরীব রোগীর অর্থ-সামর্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আড়াই গজী প্রেসক্রিপশন্ ঝেড়ে যান, কাবুলী ডাক্তার তেমনি পথ্যির ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন। শুনে ভয় পেয়ে মৌলানা আর আমি খাটের তলায় আশ্রয় নিলুম। চারদিন ধরে খাচ্ছি রুটি, ডাল আর বিন-দুধ চা—এ দুর্দিনে স্বয়ং আমান উল্লা ওসব ফেন্সি পথ্যি জোগাড় করতে পারবেন না। দুধ! আঙুর!! ডিম!!! বলে কী? পাগল, না মাথা-খারাপ?

আবদুর রহমান সবিনয়ে নিবেদন করল, সন্ধ্যার সময় তাকে একটা রাইফেল আর দু'ঘণ্টার ছুটি দিলে সে চেষ্টা করে দেখতে রাজি আছে। ডাকাতিতে আমার মরাল অবজেকশন নেই—যস্মিন দেশাচার, তদুপরি প্রবাসে নিয়ম নাস্তি—কিন্তু সব সময় সব ডাকাত তো আর বাড়ী ফেরে না। যদি আবদুর রহমান বাড়ী না ফেরে? তবে যে বাড়ী অচল হয়ে যাবে।

এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি বাচ্চায়ে সকাও যেন ডাক্তারের বেশ পরে স্টেথস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে করে আমাকে বলছে, 'হয় দাও আঙুর, না হয় নেব মাথা।'

সাঁইত্রিশ

চারদিনের দিন আবদুর রহমান তার দৈনিক বুলেটিনের এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে খবর জানালো, বাচ্চা মাইল দশেক হটে গিয়েছে। দিন দশেকের ভিতর শহরের ইস্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত খুলল।

আমান উল্লা দম ফেলবার ফুরসৎ পেলেন।

কিন্তু বাচ্চাকে তাড়াতে পেরেও তিনি ভিতরে ভিতরে হার মেনেছেন। দেরেশির আইন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, মেয়ে স্কুল বন্ধ করা হয়েছে আর রাস্তা-ঘাট থেকে ফ্রক-ব্লাউজ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যে সব মেয়েরা এখন রাস্তায় বেরন তাঁরা পরেন সেই তাম্বু ধরণের বোরকা। হ্যাট পরার সাহস আর পুরুষ স্ত্রীলোক কারো নেই—হয় পাগড়ি, নয় পশমের টুপি। যেসব স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা এই ডামাডোলের বাজারে পালিয়েছিল তাদের ধরে আনবার কোনো চেষ্টা করা হল না—করার উপায়ও ছিল না, কারণ পুলিশের দল তখনো 'ফেরার', আসামী ধরবে কে?

মৌলানা বললেন, 'সব শুদ্ধ মিলিয়ে দেখলে বলতে হবে ভালোই হয়েছে। আমান উল্লা যদি এ যাত্রা বেঁচে যান তবে বুঝতে পারবেন যে দেরেশি চাপানো, পর্দা তুলে দেওয়া আর বৃহস্পতিবারে ছুটির দিন করা এই অনুন্নত দেশের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার নয়। বাকি রইল শিক্ষাবিস্তার আর শিল্পবাণিজ্যের প্রসার—এবং এ দুটোর বিরুদ্ধে এখনো কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি। বিপদ কাটার পর আমান উল্লা যদি এই দুটো নিয়ে লেগে যান তবে আর সব আপনার থেকেই হয়ে যাবে।'

মির আসলম এসে বললেন, 'অবস্থা দেখে বিশেষ ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। শিনওয়ারীরা এখনো মারমুখো হয়ে আছে। আমান উল্লার সঙ্গে তাঁদের সন্ধির কথাবার্তা চলছে। তার ভিতরে দুটো শর্ত হচ্ছে, তুর্কী থেকে কাবুলী মেয়ে ফিরিয়ে আনা আর রানী সুরাইয়াকে তালাক দেওয়া। রানী নাকি বিদেশে পর-পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে মান ইজ্জৎ খুইয়ে এসেছেন।'

আমরা বললুম, 'সে কী কথা? সমস্ত পৃথিবীর কোথাও তো রানী সুরাইয়া সম্বন্ধে এ রকম বদনাম রটেনি। ভারতবর্ষের লোক পর্দা মানে, তারা পর্যন্ত রানী সুরাইয়াব প্রশংসা ভিন্ন নিন্দা করেনি। শিনওয়ারীরা এ আজগুবি খবর পেল কোত্থেকে আর রটাচ্ছে কোন লজ্জায়!'

মির আসলম বললেন, 'শিনওয়ারী মেয়েরা বিনা পর্দায় খেতের কাজ করে বটে কিন্তু পর-পুরুষের দিকে আড় নয়নে তাকালেও তাদের কী অবস্থা হয় সে কথা সকলেই জানে—আমান উল্লাও জানেন। তবে বল দেখি, তিনি কোন বুদ্ধিতে সুরাইয়াকে বল্ নাচে নিয়ে গেলেন? জলালাবাদের মত জংলী শহরেও দু'একখানা বিদেশী খবরের কাগজ আসে—তাতে ছবি বেরিয়েছে রানী পর-পুরুষের গলা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটা যে কতদূর মারাত্মক আমান উল্লা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি—তাঁর মা পেরেছেন, তিনি আমান উল্লাকে পীড়াপীড়ি করছেন সুরাইয়াকে তালাক দেবার জন্য।'

রানী-মার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি। উল্লসিত হয়ে বললুম, 'রানী-মা ফের আসরে নেমেছেন? তাহলে আর ভাবনা নেই; শিনওয়ারী, খুগিয়ানী, বাচ্চা-কাচ্চা সবাইকে তিনি তিন দিনের ভিতর চাটনি

বানিয়ে দেবেন।'

মির আসলম বললেন, 'কিন্তু আমান উল্লা তাঁর উপদেশে কান দিচ্ছেন না।'

শুনে অত্যন্ত নিরাশ হলুম। মির আসলম যাবার সময় বললেন, 'তোমাকে একটা প্রাচীন ফার্সী প্রবাদ শিখিয়ে যাই। রাজ্য চালনা হচ্ছে সিংহের পিঠে সওয়ার হয়ে জীবন কাটানো। ভেবেচিন্তেই বললুম 'জীবন কাটানো'—অর্থাৎ সে-সিংহের পিঠ থেকে এক মুহূর্তের জন্য নামবার উপায় নেই। যতক্ষণ উপরে আছ, সিংহ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাকেও অহরহ সজাগ থাকতে হবে। আমান উল্লা সন্ধির কথাবার্তা তুলেছেন, অর্থাৎ সিংহের পিঠ থেকে নেবে দু'দণ্ড জিরোতে চান—সেটি হবার জো নেই। শিনওয়ারী সিংহ এইবার আমান উল্লাকে গিলে ফেলবে।'

আমি চুপ করে কিছুক্ষণ ভেবে বললুম, 'কিন্তু আমার মনে হয় প্রবাদটার জন্মভূমি এদেশ নয়। ভারতবর্ষেই তখ্‌ৎকে সিংহাসন বলা হয়। আফগানিস্থানে কি সিংহ জানোয়ারটা আছে?'

এমন সময় আবদুর রহমান এসে খবর দিল পাশের বাড়ীর কর্নেল এসেছেন দেখা করতে। যদিও প্রতিবেশী, তবু তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়নি। খাতির যত্ন করে বসাতেই তিনি বললেন যে লড়াইয়ে যাবার পূর্বে আমাদের আশীর্বাদ মঙ্গল-কামনা ভিক্ষা করতে এসেছেন। মির আসলম তৎক্ষণাৎ হাত তুলে দোয়া (আশীর্বাদ-কামনা) পড়তে আরম্ভ করলেন, আমরাও দু'হাত তুলে 'আমেন, আমেন' (তথাস্তু, তথাস্তু) বললুম। আবদুর রহমান তামাক নিয়ে এসেছিল, সেও মাটিতে বসে প্রার্থনায় যোগ দিল।

কর্নেল চলে গেলেন। মির আসলম বললেন, 'পাড়া প্রতিবেশীর আশীর্বাদ ও ক্ষমা ভিক্ষা করে যুদ্ধযাত্রা করা আফগানিস্থানের রেওয়াজ।'

আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় বাচ্চা কাবুল শহরের উত্তর প্রান্তে শহর-আরায় ঢুকতে পেরেছিল। সেখানে হবীবিয়া ইস্কুল। ডাকাতদলের অগ্রভাগ—বাঙলা 'আগডোম বাগডোম' ছড়ার তারাই 'অগ্রডোম' বা ভ্যানগার্ড—ইস্কুলের হস্টেলে প্রথম রাত কাটায়। বেশির ভাগ ছেলেই ভয়ে পালিয়েছিল, শুধু বাচ্চার জন্মস্থান কুহিস্থানের ছেলেরা 'দেশের ভাই শুকুর মুহম্মদের' প্রতীক্ষায় আগুন জ্বেলে তৈরী হয়ে বসেছিল। ডাকাতরা হস্টেলের চাল চর্বি দিয়ে পোলাও রাঁধে, ইস্কুলের বেঞ্চি টেবিল, স্টাইনগাস ভলাস্টনের মোটা মোটা অভিধান, ছেলেদের ক্লাশের পাঠ্য বই খাতাপত্র দিয়ে উনুন জ্বালায়। তবে সব চেয়ে তারা নাকি পছন্দ করেছিল ক্যাম্বিস আর কাঠের তৈরী রোল করা মানচিত্র।

আমান উল্লা 'কাফির', পুথিপত্র 'কাফিরী', চেয়ার টেবিল 'কাফিরীর' সরঞ্জাম—এসব পুড়িয়ে নাকি তাদের পুণ্যসঞ্চয় হয়েছিল।

ডাকাতেরও ধর্মজ্ঞান আছে। হস্টেলের ছেলেরা যদিও 'কাফির' আমান উল্লার তালিম পেয়ে 'কাফির' হয়ে গিয়েছে, তবু তারা তাদের অভুক্ত রাখেনি। শুধু খাওয়ার সময় একটু অতিরিক্ত উৎসাহের চোটে তাদের পিঠে দু'চারটে লাথি চাঁটি মেরেছিল। বাচ্চার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে নাকি হস্টেল-বাসিন্দা ছিল; সে মামার হয়ে ফপরদালালি করেছে; তবে বাচ্চার পলায়নের সময় অবস্থাটা বিবেচনা করে 'কাফিরী তালিম' ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে 'গাজীত্ব' লাভ করেছে।

বাড়ী ফেরার সময় দেখলুম ছোট ছোট ছেলেরা রাস্তা থেকে বুলেটের খোসা কুড়োচ্ছে।

খবর পেলুম, ব্রিটিশ রাজদূত স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিসের মতে কাবুল আর বিদেশিদের জন্য নিরাপদ নয়। তাই তিনি আমান উল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের এদেশ থেকে সরিয়ে ফেলবার বন্দোবস্ত করেছেন। আমান উল্লা সহজেই সম্মতি দিয়েছেন, কারণ তিনিও চাননি যে বিদেশিরা আফগানিস্থানের এই ঘরোয়া ব্যাপারে অনর্থক প্রাণ দেয়। কাবুল বাকি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে এ্যারোপ্লেনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

এ্যারোপ্লেন এল। প্রথমে মেয়েদের পালা। ফরাসী গেল, জর্মন গেল, ইতালিয় গেল, পোল গেল, এককথায় দুনিয়ার অনেক জাতের অনেক স্ত্রীলোক গেল, শুধু ভারতীয় মেয়েদের কথা কেউ শুধালো না। এ্যারোপ্লেনগুলো ভারতীয় অর্থে কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়। অথচ সব চেয়ে বিপদাপন্না ভারতীয় মেয়েরাই—অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা আপন আপন লিগেশনের আশ্রয়ে ছিল, কিন্তু ভারতীয়দের দেখে কে? প্রফেসর, দোকানদার, ড্রাইভারের বউকে ব্রিটিশ লিগেশনে স্থান দিলে স্যার ফ্রান্সিস বিদেশি সমাজে মুখ দেখাবেন কী করে? বামুনের জাত গেলে প্রায়শ্চিত্ত আছে, আর মুসলমানের তো জাত যায় না; কিন্তু ইংরেজের জাতিভেদ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। তার দেশের যেরকম কাগজে কলমে লেখা, আইনে বাঁধা কন্সস্টিটুশন নেই ঠিক তেমনি তার জাতিভেদ প্রথা কোনো বাইবেল প্রেয়ার বুকে আপ্তবাক্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অথচ সে জাতিভেদ রবীন্দ্রনাথের ভূতের কানমলার মত। 'সে কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।' দর্শন, অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হোন, মার্কসিজমের দিগ্বিজয়ী কৌটিল্যই হোন, অথবা কয়লার খনির মজুরই হোন, এই কানমলা স্বীকার করে করে হৌস অব লর্ডসে না পৌঁছানো পর্যন্ত দর্শন মিথ্যা, মার্কসিজম্ ভুল, শ্রমিকসঙ্ঘের দেওয়া সম্মান ভণ্ডুল। যে এই কানমলা স্বীকার করে না ইংরেজের কাছে সে আধপাগল। তার নাম বার্নার্ড শ।

বাড়াবাড়ি করছি? মোটেই না। ধান ভানতে শিবের গীত? তাও নয়। বিপ্লব-বিদ্রোহ রক্তপাত রাহাজানি মাত্রই রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য—এতক্ষণ সে কথাই হচ্ছিল, এখন তাঁর নন্দী-ভৃঙ্গী সম্বাদের পালা।

ইংরেজের এই 'আভিজাত্য', এই 'স্নবারি' ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে ব্রিটিশ রাজদূতের মনোবৃত্তির যুক্তিযুক্ত অর্থ করা যায় না। ব্রিটিশ লিগেশনের যা আকার তাতে কাবুলের বাদবাকি সব ক'টা রাজদূতাবাস অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। একখানা ছোটখাট শহর বললেও অত্যুক্তি হয় না— নিজের জলের কল, ইলেকট্রিক পাওয়ার-হৌস, এমন কি ফায়ার-ব্রিগেড পর্যন্ত মৌজুদ। শীতকালে সায়েব-সুবোদের খেলাধুলোর জন্য চা-বাগানের পাতা শুকোবার ঘরের মত যে প্রকাণ্ড বাড়ী থাকে তারই ভিতরে সমস্ত ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থিনীর জায়গা হতে পারত। আহারাদি? ব্রিটিশ লিগেশন কাবুল থেকে পালিয়ে আসার সময় যে টিনের খাদ্য ফেলে এসেছিল তাই দিয়ে মেয়েদের পাকা ছ'মাস চলতে পারত।

ফ্রেঞ্চ লিগেশনে যে মিনিস্টারকে বেনওয়া সায়েব রসিকতা করে 'মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ নিগেশন' বলতেন তিনি পর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থী ফরাসীদের মন চাঙ্গা করার জন্য ভাণ্ডার উজাড় করে শ্যাম্পেন খাইয়েছিলেন।

ডাক্তার আসে না, অন্ন জুটছে না, পথ্যের অভাব, দাই নেই, আসন্নপ্রসবার আশ্রয় জুটছে না; তাকে ফেলে রেখে ভারতীয় পয়সায় কেনা হাওয়াই জাহাজ ভারতবর্ষে যাচ্ছে ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, সকল জাতের মেম সায়েবদের নিয়ে! হে দ্রৌপদীশরণ, চক্রধারণ, এ দ্রৌপদী যে অন্তঃসত্ত্বা!

উত্তরদিক থেকে কাবুল শহর আক্রমণ করতে হলে ব্রিটিশ রাজদূতাবাস অতিক্রম করে আরো এক মাইল ফাঁকা জায়গা পেরতে হয়। বাচ্চা তাই করে শহর-আরা হস্টেলে পৌঁচেছিল। সুবে আফগানিস্থান জানে সে সময় পাক্কা চারদিন ব্রিটিশ রাজদূতাবাস তথা মহামান্য স্যার ফ্রান্সিসের জীবন বাচ্চার হাতের তেলোয় পুঁটি মাছের মত এক গণ্ডুষ জলে খাবি খাচ্ছিল। বাচ্চা ইচ্ছে করলেই যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত লিগেশনকে কচু-কাটা করতে পারত— একটু ঔদাসীন্য দেখালেই তার উদগ্রীব সঙ্গীরা সবাইকে কতল করে বাদশাহি লুট পেত, কিন্তু জলকরঙ্কবাহীর তস্করপুত্র অভিজাততনয়ের প্রাণ দান করল। তবু দস্যুদত্ত করুণালব্ধ সে প্রাণ বিপন্না নারীর দুঃখে বিগলিত হল না।

গল্প শুনেছি, জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর নাতিকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। পথে এক নিগ্রো হ্যাট তুলে দু'জনকে নমস্কার করল। ওয়াশিংটন হ্যাট তুলে প্রতিনমস্কার করলেন, কিন্তু নাতি নিগ্রোকে তাচ্ছিল্য করে নমস্কার গ্রহণ করল না। জর্জ ওয়াশিংটন নাতিকে বললেন, 'নগণ্য নিগ্রো

তোমাকে ভদ্রতায় হার মানালো।'

দয়া দাক্ষিণ্যে, করুণা ধর্মে মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য **প্রতিভূ হিজ** একসেলেন্সি লেফটেনেন্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিসকে হার মানালো ডাকুর বাচ্চা!

চিরকুট পেলুম, দেমিদফ লিখেছেন রাশান এম্বেসিতে যেতে। এ রকম চিঠি আর কখনো পাইনি, কারণ কোনো কিছুর দরকার হলে তিনি নিজেই আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন।

চেহারা দেখেই বুঝলুম কিছু একটা হয়েছে। দোরের গোড়াতেই বললুম, 'কী হয়েছে, বলুন।' দেমিদফ কোনো উত্তর না দিয়ে আমাকে ঘরে এনে বসালেন। মুখোমুখি হয়ে বসে দু'হাত দু'জানুর উপর রেখে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলশফ মারা গিয়েছেন।'

আমি বললুম, 'কী!'

দেমিদফ বললেন, 'আপনি জানতেন যে বিদ্রোহ আরম্ভ হতেই বলশফ নিজের থেকে আমান উল্লার কাছে উপস্থিত হয়ে বাচ্চায়ে সকাওয়ের দলের উপর এ্যারোপ্লেন থেকে বোমা ফেলার প্রস্তাব করেন। কাল বিকেলে—'

আমি ভাবছি, বলশফ কিছুতেই মরতে পারে না। অবিশ্বাস্য!

'—কাল বিকেলে অন্য দিনের মত বোমা ফেলে এসে এম্বেসির ক্লাব ঘরে দাবা খেলতে বসেছিলেন। ব্রিচেসের পকেটে ছোট্ট একটি পিস্তল ছিল; বাঁ হাত দিয়ে ঘুঁটি চালাচ্ছিলেন, ডান হাত পকেটে রেখে পিস্তলের ঘোড়াটা নিয়ে খেলা করছিলেন—জানেন তো বলশফের স্বভাব, কিছু একটা নাড়াচাড়া না করে বসতে পারতেন না। হঠাৎ ট্রিগারে একটু বেশী চাপ পড়াতেই গুলী পেটের ভিতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছ পর্যন্ত চলে যায়। ঘণ্টা ছয়েক বেঁচে ছিলেন, ডাক্তার কিছু করতে পারলেন না।'

আমার তখনো কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না বলশফের মত বটগাছ কী করে বিনা ঝড়ে পড়ে যেতে পারে। এত লড়াই লড়ে, এত জখম কাটিয়ে উঠে শেষে নিজের হাতে— ?

দেমিদফ বললেন, 'আপনার খুব লাগবে আমি জানতুম তাই সংক্ষেপে বললুম, আর যদি কিছু জানতে চান—।' আমি বললুম, 'না।'

'চলুন দেখতে যাবেন।'

আমি বললুম, 'না'। বাড়ী যাবার জন্য উঠলুম। মাদাম তাড়াতাড়ি আমার সামনের পথ বন্ধ করে বললেন, 'এখানে খেয়ে যান।'

আমি বললুম, 'না'।

টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে বেরবার সময় হঠাৎ যেন শুনতে পেলুম বলশফের গলা, 'জদ্রাস্‌ভুইয়িতে মই প্রিয়াতেল—এই যে বন্ধু, কী রকম?' চমকে উঠলুম। আমার মন তখনো বিশ্বাস করছে না, বলশফ নেই। এই টেনিস কোর্টেই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, আর এই যে দেউড়ি দিয়ে বেরচ্ছি এরই ভিতর দিয়ে কতবার তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি।

বাড়ি এসে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার অজানাতে মন সমস্ত রাত বলশফের কথা ভেবেছে। ঘুম ভাঙতে যেন শুধু সচেতন হলুম। মনে পড়ল তাঁর সঙ্গে শেষ কথাবার্তা। ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'বলশফ, তুমি আমান উল্লার হয়ে লড়ছ কেন? আমান উল্লা রাজা, বাচ্চার দল প্রলেতারিয়েস্ট অব দি প্রলেতারিয়া। তোমার উচিত বাচ্চার দলে যোগ দিয়ে লড়া।'

বলশফ বলেছিল, 'বাচ্চা কী করে প্রলেতারিয়া হল? সেও তো রাজার মুকুট পরে এসেছে। রাজায় রাজায় লড়াই; এক রাজা প্রগতিপন্থী, আরেক রাজা প্রগতির শত্রু। চিরকাল প্রগতির জন্য লড়েছি, এখনো লড়ছি, তা সে ত্রৎস্কির নেতৃত্বেই হোক আর আমান উল্লার আদেশেই হোক।'

আমান উল্লার সেই চরম দুর্দিনে সব বিদেশীর মধ্যে একমাত্র বলশফের কর্তৃত্বে রাশান পাইলটরাই

তাঁকে সাহায্য করেছিল। বাচ্চা জিতলে তাদের কী অবস্থা হবে সে সম্বন্ধে একদম পরোয়া না করে।

দিন পনেরো পরে খবর পেলুম, এ্যারোপ্লেন কাবুল থেকে বিদেশী সব স্ত্রীলোক কাচ্চা-বাচ্চা ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে, বিদেশী বলতে এখন বাকি শুধু ভারতীয়। তিন লম্ফে ব্রিটিশ লিগেশনে উপস্থিত হয়ে মৌলানার বউয়ের কথাটা সকাতরে সবিনয়ে নিবেদন করলুম। ব্রিটিশের দয়া অসীম। ভারতবাসিনী লাদাই উড়োজাহাজের প্রথম খেপেই তিনি স্থান পেলেন। পুনরপি তিন লম্ফে বাড়ি পৌঁছে আঙিনা থেকেই চিৎকার করে বললুম, 'মৌলানা, কেল্লা ফতেহ্, সীট পেয়ে গিয়েছি। বউকে বলো তৈরি হতে। এখন ওজন করাতে নিয়ে যেতে হবে—কর্তারা ওজন জানতে চান।'

মৌলানা নিরুত্তর। আমি অবাক। শেষটায় বললেন যে, তাঁর বউ নাকি একা যেতে রাজি নন, বলছেন মরবার হলে এদেশে স্বামীর সঙ্গেই মরবেন। আমি শুধালুম, 'তুমি কী বলছ?' মৌলানা নিরুত্তর। আমি বললুম, 'দেখ মৌলানা, তুমি পাঞ্জাবী, কিন্তু শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে আর গুরুদেবের মোলায়েম গান গেয়ে গেয়ে তুমি বাঙালীর মত মোলায়েম হয়ে গিয়েছ। 'বাঁধিনু যে রাখী-টাখি' এখন বাদ দাও।' মৌলানা তবু নিরুত্তর। চটে গিয়ে বললুম, 'তুমি হিন্দু হয়ে গিয়েছ, তাও আবার ১৮১০ সালের—সতীদাহে বিশ্বাস করো। কিন্তু জানো, যে গুরুদেবের নাম শুনে অজ্ঞান হও, তাঁরই ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুর টাকা দিয়ে সতীদাহের বিরুদ্ধে বিলেতে মোকদ্দমা লড়িয়েছিলেন।' মৌলানা নিরুত্তর। এবারে বললুম, 'শোনো ব্রাদার, এখন ঠাট্টামস্করার সময় নয়, কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার বউয়ের কবে বাচ্চা হবে, তার হিসেব-টিসেব রাখোনি—না হয় বদ্যি পেলুম, ধাই পেলুম, কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার পর তোমার বউয়ের—' বার তিনেক গলা-খাঁখারি দিয়ে বললুম—'তাহলে আমি দুধ যোগাড় করব কোথা থেকে? বাজারে ফের কবে দুধ উঠবে তার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।' মৌলানা বউয়ের কাছে গেলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কান্নার শব্দ শুনতে পেলুম। মৌলানা বেরিয়ে এসে বললেন, 'রাজি হচ্ছেন না।'

তখন মৌলানাকে বাইরে রেখে ভিতরে গেলুম। বললুম, 'আপনি যে মৌলানাকে ছেড়ে যেতে চাইছেন না, তার কারণ যে আমি বুঝতে পারছিনে তা নয়; কিন্তু ভেবে দেখুন তো, আপনার না যাওয়াতে তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? আপনি যদি চলে যান, তবে তিনি যেখানে খুশি কোনো ভালো জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবেন; শুধু তাই নয়, অবস্থা যদি আরো খারাপ হয়, তবে হয়ত তাঁকেও এদেশ ছাড়তে হবে। আপনি না থাকলে তখন তাঁর পক্ষে সব কিছুই অনেক সহজ হয়ে যাবে। এসব কথা তিনি আপনাকে কিছুই বলেননি, কারণ এখন তিনি নিজের কথা আদপেই ভাবছেন না, ভাবছেন শুধু আপনার মঙ্গলের কথা। আপনি তাঁর স্ত্রী, আপনার কি এদিকে খেয়াল করা উচিত নয়?'

ওকালতি করছি আর ভাবছি মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ব্যারিস্টারি পড়াব। মেয়ে হলে আমান উল্লার মায়ের হাতে সঁপে দেব।

ওষুধ ধরল। ভারত-নারীর শ্মশানচিকিৎসা স্বামীর স্বার্থের দোহাই পাড়া।

পরদিন সকালবেলা মৌলানা বউকে নিয়ে এ্যারোড্রোমে গেলেন। বিপদ-আপদ হলে আবদুর রহমানের কাঁধ কাজে লাগবে বলে সেও সঙ্গে গেল। আমি রইলুম, বাড়ি পাহারা দিতে। দিন পরিষ্কার ছিল বলে ছাতে দাঁড়িয়ে দেখলুম, পুব থেকে প্রকাণ্ড ভিকারস্ বমার এল, নামল, ফের পুব দিকে চলে গেল। মাটিতে আধঘণ্টার বেশি দাঁড়ায়নি—কাবুল নিরাপদ স্থান নয়।

জিয়াউদ্দীন ফিরে এসে মুখ ঝামর করে উপরে চলে গেলেন। আবদুর রহমান বলল, 'মৌলানা সায়েবের বিবির জামা-কাপড় দেখে পাইলট বলল যে, এ্যারোপ্লেন যখন আসমানে অনেক উপরে উঠবে, তখন ঠাণ্ডায় তাঁর পা জমে যাবে। তাই বোধহয় তারা সঙ্গে খড় এনেছিল—মৌলানা সায়েব সেই

খড় দিয়ে তাঁর বিবির দু'পা বেশ করে পেঁচিয়ে দিলেন— দেখে মনে হল যেন খড়ে জড়ানো বিলিতী সিরকার বোতল। সব মেয়েদেরই পা এরকম কায়দায় সফর-দুরুস্ত করতে হল।'

আমরা দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলুম। এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে একটা মড়া নিয়ে কয়েকজন লোক চলে যাচ্ছে দেখে আবদুর রহমান হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ভারবাহীরা আমার প্রতিবেশী কর্নেলের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আবদুর রহমান কড়া নাড়ল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, আর্ত ক্রন্দনধ্বনি যেন তীরের মত বাতাস ছিঁড়ে আমার কানে এসে পৌঁছল—মড়া দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকাতে যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণ গলার পর গলা সে আর্তনাদে যোগ দিতে লাগল। চিৎকারে চিৎকারে মানুষের বেদনা যেন সপ্তম স্বর্গের ভগবানের পায়ের কাছে পৌঁছতে চাইছে।

কান্না যেন হঠাৎ কেউ গলা টিপে বন্ধ করে দিল—মড়া বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই নিস্তব্ধতা তখন যেন আমাকে কান্নার চেয়ে আরো বেশি অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে গিয়ে মৌলানার ঘরে ঢুকলুম। আবদুর রহমান এসে খবর দিল, 'কর্নেল লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন।'

মৌলানা দু'হাত তুলে দোয়া পড়তে আরম্ভ করলেন। আবদুর রহমান আর আমি যোগ দিলুম। দোয়া শেষে মৌলানা বললেন, 'লড়াইয়ে যাওয়ার আগে কর্নেল আমাদের দোয়া মাঙতে এসেছিলেন, আমাদের উপর এখন তাঁর হক্ আছে।' তারপর মৌলানা ওজু করে কুরান শরীফ পড়তে আরম্ভ করলেন।

দুপুরবেলা মৌলানার ঘরে গিয়ে দেখি, কুরান পড়ে পড়ে তাঁর চেহারা অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছে। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর বিরহ ও তাঁর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা মন থেকে কেটে গিয়েছে।

কর্নেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগল। কোনো কোনো মানুষ মরে গিয়েও অন্যের মনে শান্তির উপলক্ষ্য হয়ে যান।

কিন্তু আমার মনে খেদও জেগে রইল। যে-মানুষটিকে পাঁচ মিনিটের জন্য চিনেছিলুম তাঁর মৃত্যুতে মনে হল যেন একটি শিশু সন্তান অকালে মারা গেল। আমাদের পরিচয় তার পরিপূর্ণতা পেল না।

আটত্রিশ

আফগান প্রবাদ 'বাপ-মা যখন গদগদ হয়ে বলেন, 'আমাদের ছেলে বড় হচ্ছে' তখন একথা ভাবেন না যে, ছেলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও গোরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।' আমান উল্লা শুধু তাঁর প্রিয় সংস্কার-কর্মের দিকেই নজর রেখেছিলেন, লক্ষ্য করেননি যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজত্বের দিনও ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু শুধু আমান উল্লাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—তাঁর উজির-নাজির সঙ্গী-সাথী ও রাস্তার আর পাঁচজন, বাচ্চার পালিয়ে যাওয়াতে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টাতে ছিল।

বাচ্চার আক্রমণের ঠিক একমাস পরে—জানুয়ারির কঠোর শীতের মাঝামাঝি—একদিন শরীর খারাপ ছিল বলে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, এমন সময় এক পাঞ্জাবী অধ্যাপক দেখা করতে এলেন। শহর তখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, দিনের বেলা চলাফেরা করাতে বিশেষ বিপদ নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, 'খবর শুনেছেন?'

আমি শুধালুম, 'কী খবর?'

বললেন, 'তাহলে জানেন না, শুনুন। এরকম খবর আফগানিস্থানের মত দেশেও রোজ রোজ শোনা যায় না।'

'ভোরবেলা চাকর বলল, রাজপ্রাসাদে কিছু একটা হচ্ছে, শহরের বহুলোক সেদিকে যাচ্ছে। গিয়ে

দেখি প্রাসাদে আফগানিস্থানের সব উজির, তাঁদের সহকারী, ফৌজের বড় অফিসার এবং শহরের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিও উপস্থিত। সক্কলের মাঝখানে মুইন-উস্-সুলতানে ইনায়েত উল্লা খান ও তাঁর বড় ছেলে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি যে, শহরের এত বড় মজলিসের মাঝখানে আমান উল্লা নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করার আগেই এক ভদ্রলোক—খুব সম্ভব রইস-ই-শুরাই (প্রেসিডেন্ট অব দি কৌন্সিল) হবেন—একখানা ফরমান পড়তে আরম্ভ করলেন। দূরে ছিলুম বলে সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাইনি। কিন্তু শেষের কথাগুলো পাঠক বেশ জোর দিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন বলে সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। আমান উল্লা সিংহাসন ত্যাগ করেছেন ও বড় ভাই মুইন-উস্-সুলতানে ইনায়েত উল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন।'

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'হঠাৎ? কেন? কী হয়েছে?'

'শুনুন, ফরমান পড়া শেষ হলে কাবুলের এক মাতব্বর ব্যক্তি আফগানিস্থানের পক্ষ থেকে ইনায়েত উল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তখন ইনায়েত উল্লা অত্যন্ত শান্ত এবং নির্জীব কণ্ঠে যা বললেন, তার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, তিনি কখনো সিংহাসনের লোভ করেননি—দশ বৎসর পূর্বে যখন নসর উল্লা-আমান উল্লায় রাজ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তখনো তিনি অযথা রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখে আপন অধিকার ত্যাগ করেছিলেন।'

অধ্যাপক দম নিয়ে বললেন, 'তারপর ইনায়েত উল্লা যা বললেন সে অত্যন্ত খাঁটি কথা। বললেন, 'দেশের লোকের মঙ্গলচিন্তা করেই আমি এতদিন ন্যায্য সিংহাসন গ্রহণ করিনি; আজ যদি দেশের লোক মনে করেন যে, আমি সিংহাসন গ্রহণ করলে দেশের মঙ্গল হবে তবে আমি শুধু সেই কারণেই সিংহাসন গ্রহণ করতে রাজি আছি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমান উল্লা?'

অধ্যাপক বললেন, 'তখন খবব নিয়ে শুনলুম, আমান উল্লার ফৌজ কাল রাত্রে লড়াই হেরে গিয়ে পালিয়েছে। খবর ভোরের দিকে আমান উল্লার কাছে পৌঁছয়; তিনি তৎক্ষণাৎ ইনায়েত উল্লাকে ডেকে সিংহাসন নিতে আদেশ করেন। ইনায়েত নাকি অবস্থাটা বুঝে প্রথমটায় রাজি হননি—তখন নাকি আমান উল্লা তাঁকে পিস্তল তুলে ভয় দেখালে পর তিনি রাজি হন।

'আমান উল্লা ভোরের দিকে মোটরে করে কান্দাহার রওয়ানা হয়েছেন। যাবার সময় ইনায়েত উল্লাকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, পিতৃপিতামহের দুর্‌রানী ভূমি কান্দাহার তাঁকে নিরাশ করবে না। তিনি শীঘ্রই ইনায়েত উল্লাকে সাহায্য করার জন্য সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হবেন।'

আমান উল্লা তাহলে শেষ পর্যন্ত পালালেন? চুপ করে অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে লাগলুম।

অধ্যাপক হেসে বললেন, 'আপনি তো টেনিস খেলায় ইনায়েত উল্লার পার্টনার হন। শুনেছি, তিনি তাঁর বিরাট বপু নাড়াচাড়া করতে পারেন না বলে আপনি কোর্টের বারোআনা জমি সামলান—এইবার আপনি আফগানিস্থানের বারোআনা না হোক অন্তত দু'চারআনা চেয়ে নিন।'

আমি বললুম, 'তাতো বটেই। কিন্তু বাচ্চার বুলেটের অন্তত দু'চারআনা ঠেকাবার ভার তাহলে আমার উপর পড়বে না তো?'

অধ্যাপক বললেন, 'তওবা, তওবা। বাচ্চা এখন আর লড়বে কেন বলুন? তাঁর কাছে ইত্যবসরে শোরবাজারের হজরত আর সর্দার ওসমান খান, ইনায়েত উল্লার পক্ষ থেকে খবর নিয়ে গিয়েছেন যে, 'কাফির' আমান উল্লা যখন সিংহাসন ত্যাগ করে পালিয়েছে তখন আর যুদ্ধবিগ্রহ করার কোনো অর্থ হয় না। বাচ্চা যেন বাড়ি ফিরে যান—তাঁর সঙ্গে ইনায়েত উল্লার কোনো শত্রুতা নেই।'

অধ্যাপক চলে গেলে পর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর্কের দিকে চললুম।

এবারে শহরের দৃশ্য আরো অদ্ভুত। বাচ্চার প্রথম ধাক্কার পর তবু কাবুল শহরে রাজা ছিলেন,

তিনি দুর্বল না সবল সাধারণ লোকে জানত না বলে রাজদণ্ডের মর্যাদা তখনো কিছু কিছু ছিল, কিন্তু এখন যেন আকাশে বাতাসে অরাজকতার বিজয়লাঞ্ছনা অঙ্কিত। যারা রাস্তা দিয়ে চলেছে তারা স্পষ্টত কাবুলবাসিন্দা নয়। তাদের চোখে মুখে হত্যা লুণ্ঠনের প্রতীক্ষা আর লুক্কায়িত নয়। এরা সব দল বেঁধে চলেছে—কেউ কোথাও একবার আরম্ভ করলে এদের আর ঠেকানো যাবে না।

ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করলুম কিন্তু একটিমাত্র পরিচিত লোককেও দেখতে পেলুম না। তখন ভালো করে লক্ষ্য করলুম যে, প্রায় সবাই দল বেঁধে চলেছে, ভিখারী-আতুর ছাড়া একলা একলি আর কেউ বেরোয়নি।

খাঁটি খবর দিতে পারে এমন একটিও লোক পেলুম না। আভাসে আন্দাজে বুঝলুম, ইনায়েত উল্লা আর্কের ভিতরে আশ্রয় নিয়ে দুর্গ বন্ধ করেছেন। আমান উল্লার কী পরিমাণ সৈন্য ইনায়েত উল্লার বশ্যতা স্বীকার করে দুর্গের ভিতরে আছে তার কোনো সন্ধান পেলুম না।

দোস্ত মুহম্মদ আমান উল্লার হয়ে লড়তে গিয়েছেন জানতুম, তাই এক মাস ধরে তাঁর বাড়ি বন্ধ ছিল। ভাবলুম এবার হয়ত ফিরেছেন, কিন্তু সেখানে গিয়েও নিরাশ হতে হল। বাড়ি ফিরে দেখি মৌলানা তখনো আসেননি, তাই পাকাপাকি খবরের সন্ধানে মির আসলমের বাড়ি গেলুম।

বুড়ো আবার সেই পুরানো কথা দিয়ে আরম্ভ করলেন, যখন কোনো দরকার নেই তখন এই বিপজ্জনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করি কেন?

আমি বললুম, 'সামলে কথা বলবেন স্যার, জানেন বাদশা আমার পার্টনার। চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার কী চাই বলুন, যা দরকার বাদশাকে বলে করিয়ে দেব।'

মির আসলম অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর বললেন, 'ফার্সীতে একটা প্রবাদ আছে, জানো—

রাজত্ববধূরে যেই করে আলিঙ্গন,
তীক্ষ্ণধার অসি পরে সে দেয় চুম্বন।

'কিন্তু তোমার বাদশাহ অদ্ভুত! সাধারণ বাদশাহ কামানবন্দুক চালিয়ে অন্ততপক্ষে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে সিংহাসন দখল করে, তোমার বাদশা ইনায়েত উল্লা পিস্তলের ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসনের উপরে গিয়ে বসলেন!'

আমি বললুম, 'কিন্তু দেখুন, শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে যার হক ছিল তিনিই বাদশা হলেন। কাবুলের লোকজন তো আর ভুলে যায়নি যে, ইনায়েত উল্লা শহীদ বাদশা হবীব উল্লার বড় ছেলে।'

মির আসলম বললেন, 'সে কথা ঠিক, কিন্তু হক্কের মাল এত দেরীতে পৌঁচেছে যে, এখন সে মালের উপর আরো পাঁচজনের নজর পড়ে গিয়েছে। শুনেছ বোধহয় শোরবাজারের হজরত বাচ্চাকে ফেরাতে গিয়েছেন। তোমার কী মনে হয়?'

আমি বললুম, 'ইনায়েত উল্লা তো আর 'কাফির' নন। বাচ্চা ফিরে যাবে।'

মির আসলম বললেন, 'শোরবাজারের হজরতকে চেন না—তাই একথাটা বললে। তিনি আফগানিস্থানে সবচেয়ে বড় মোল্লা। আমান উল্লা বিদ্রোহের গোড়ার দিকেই তাঁকে জেলে পুরেছিলেন, সাহস সঞ্চয় করে ফাঁসি দিতে পারেন নি। আজ শোরবাজার স্বাধীন, কিন্তু ইনায়েত উল্লা বাদশা হলে তাঁর কী লাভ? আজ না হয় তিনি বিপদে পড়ে শোরবাজারের হাতে-পায়ে ধরে তাঁকে দূত করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বাচ্চা যদি ফিরে যায় তবে দু'দিন বাদে তাঁর শক্তি বাড়বে; সিংহাসনে কায়েম হয়ে বসার পর তিনি আর শোরবাজারের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। রাজার ছেলে রাজা হলেন, তিনি রাজত্ব চালাতে জানেন, শোরবাজারকে দিয়ে তাঁর কী প্রয়োজন?

'পক্ষান্তরে বাচ্চা যদি ইনায়েত উল্লাকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা হতে পারে তবে তাতে শোরবাজারের লাভ। বাচ্চা ডাকাত, সে রাজ্যচালনার কী জানে? যে মোল্লাদের উৎসাহে বাচ্চা আজ লড়ছে সেই মোল্লাদের মুকুটমণি শোরবাজার তখন রাজ্যের কর্ণধার হবেন।

'কিন্তু তারো চেয়ে বড় কারণ রয়েছে, বাচ্চা কেন ফিরে যাবে না। তার যে-সব সঙ্গী-সাথীরা এই একমাস ধরে বরফের উপর কখনো দাঁড়িয়ে কখনো শুয়ে লড়ল, বাচ্চা তাদের শুধু হাতে বাড়ি ফেরাবে কী করে? কাবুল লুটের লালস দেখিয়েই তো বাচ্চা তাদের আপন ঝাণ্ডার তলায় জড়ো করেছে।'

আমি বললুম, 'বাঃ! আপনিই তো সেদিন বললেন, বাচ্চা মহল্লা-সর্দারদের কথা দিয়েছে যে, কাবুলীরা যদি আমান উল্লার হয়ে না লড়ে তবে সে কাবুল লুট করবে না।'

মির আসলম বললেন, 'এরই নাম রাজনীতি। ইংরেজ যেরকম লড়াইয়ের সময় আরবদের বলল তাদের প্যালেস্টাইন দেবে, ইহুদিদের বলল তাদেরও দেবে।'

বাড়ি ফিরে এসে দেখি পাঞ্জাবী অধ্যাপকরা দল বেঁধে মৌলানাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে আড্ডা জমিয়েছেন। আমাকে নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টা করলেন; কেউ বললেন, 'দাদা, আমার ছ'মাসের ছুটির প্রয়োজন', কেউ কেউ বললেন, 'পাঁচ বছর ধরে প্রোমোশন পাইনি, বাদশাকে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবেন।' মৌলানা আমার হয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, 'স্বপ্নেই যদি পোলাও খাবেন তবে ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছেন কেন? যা চাইবার দরাজ-দিলে চেয়ে নিন।'

দেখলুম, এদের সকলেরই বিশ্বাস বাচ্চা শুধু হাতে বাড়ি ফিরে যাবে, আর কাবুলে ফের হারুন-অর্-রশীদের রাজত্ব কায়েম হবে।

সন্ধ্যার দিকে আবদুর রহমান বুলেটিন ঝেড়ে গেল, বাচ্চা ফিরতে নারাজ; বলছে, 'যে তাজ পাঁচজন আমাকে পরিয়েছেন, সে তাজ আমার শিরোধার্য।' বুঝলুম, মির আসলম ঠিকই বলেছেন, 'রাজা হওয়ার অর্থ সিংহের পিঠে সওয়ার হওয়া---একবার চড়লে আর নামবার উপায় নেই।'

সে রাত্রে বাড়িতে ডাকু হানা দিল। আবদুর রহমান তার রাইফেল ব্যবহার করতে পেয়ে যত না গুলী ছুঁড়ল তার চেয়ে আনন্দে লাফাল বেশি। ফিচকে ডাকাতই হবে, আবদুর রহমানের রণনাদ শুনে পালাল।

আবদুর রহমান তার বুলেটিনের মাল-মসলা সংগ্রহ করে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে। রাস্তা দিয়ে যে যায় তাকেই ডেকে পই-পই করে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে—আমান উল্লা চলে যাওয়ায় তার শেষ ডর ভয় কেটে গিয়েছে। তবে এখন বাচ্চাযে সকাও না বলে সম্মানভরে হবীব উল্লা খান বলে।

দুপুরবেলার বুলেটিনের খবর, ইনায়েত উল্লা খান আর্ক দুর্গের ভিতর বসে আমান উল্লার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতীক্ষা করছেন। বাচ্চা তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিয়েছেন। না হলে সে কাবুল শহরের কাউকে জ্যান্ত রাখবে না—ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে। ইনায়েত উল্লা উত্তর দিয়েছেন, 'কাবুলবাসীদের প্রচুর রাইফেল আর অপর্যাপ্ত বুলেট আছে, তাই দিয়ে তারা যদি আত্মরক্ষা না করতে পারে, তবে এসব ভেড়ার পালের মরাই ভালো।'

মৌলানা বললেন, 'বাচ্চা এখন আর কাবুলের মহল্লা-সর্দারদের কেয়ার করে না।' তারপর আবদুর রহমানকে পার্লিমেন্টি কায়দায় সপ্লিমেন্টরি শুধালেন, 'আর্কে কী পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আছে? সৈন্যরা টিকতে পারবে কতদিন?' আবদুর রহমান কাঁচা ডিপ্লোমেট— নোটিশের হুমকি দিল না। বলল, 'অন্তত ছয় মাস।'

তৃতীয় দিনের বুলেটিন, 'বাচ্চা বলেছে, ইনায়েত উল্লা যদি আত্মসমর্পণ না করেন তবে যে সব আমির-ওমরাহ সেপাই-সান্ত্রী তাঁর সঙ্গে আর্কে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে সে খুন করবে। ইনায়েত উল্লা উত্তর দিয়েছেন, 'কুছ পরোয়া নেই।'

ফালতো প্রশ্ন, 'বাচ্চা দুর্গ আক্রমণ করছে না কেন?'

অবজ্ঞাসূচক উত্তর, 'রাইফেলের গুলী দিয়ে পাথরের দেয়াল ভাঙা যায় না।'

সে সন্ধ্যায় ব্রিটিশ লিগেশনের এক কেরানি প্রাণের ভয়ে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। শহরে এসেছিলেন কী কাজে, বাচ্চার ফৌজ দলে দলে শহরে ঢুকছিল বলে লিগেশনে ফিরে যেতে পারেননি।

রাত্রে তাঁর মুখে শুনলাম যে, দুর্গের ভিতরে বন্ধ আমির-ওমরাহদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার দুর্গের বাইরে। ইনায়েত উল্লার পরিবার দুর্গের ভিতরে। আমিরগণ ও বাদশাহের স্বার্থ এখন আর সম্পূর্ণ এক নয়। আমিরগণ তাঁদের পরিবার বাঁচাবার জন্য আত্মসমর্পণ করতে চান। ইনায়েত উল্লা নাকি নিরাশ হয়ে বলেছেন, যে সব আমির-ওমরাহদের অনুরোধে তিনি অনিচ্ছায় রাজা হয়েছিলেন, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখন তিনি আর দুর্গ রক্ষা করতে রাজি নন।

আবদুর রহমান সভাস্থলে উপস্থিত ছিল। বলল, 'আমি শুনেছি, সেপাইরা দুর্গ রক্ষা করতে রাজি, যদিও তাদের পরিবার দুর্গের বাইরে। তারা বলছে, 'বউ-বাচ্চার জান আমানত দিয়ে তো আর ফৌজে ঢুকিনি।' ভয় পেয়েছেন অফিসার আর আমির-ওমরাহদের দল।'

কেরানি বললেন, 'আমিও শুনেছি কিন্তু কোনটা খাঁটি কোনটা ঝুটা বুঝবার উপায় নেই। মোদ্দা কথা, ইনায়েত উল্লা সিংহাসন ত্যাগ করতে তৈরি, তবে তাঁর শর্ত : কোনো তৃতীয়পক্ষ যেন তিনি আর তাঁর পরিবারকে নিরাপদে আফগানিস্থানের বাইরে নিয়ে যাবার জিম্মাদারি নেন। স্যার ফ্রান্সিস রাজি হয়েছেন।'

আমরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'স্যার ফ্রান্সিসের কাছে প্রস্তাবটা পাড়ল কে?'

'বলা শক্ত। শোরবাজার, ইনায়েত উল্লা, বাচ্চা—থুড়ি—হবীব উল্লা খান—তিনজনের একজন, অথবা সকলে মিলে। এখন সেই কথাবার্তা চলছে।'

সে-রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি মৌলানা আর কেরানি সায়েবেতে আফগান রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক হল।

সকালবেলা আবদুর রহমান হাতে-সেঁকা রুটি, নুন আর বিনা দুধ চিনিতে চা দিয়ে গেল। আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভদ্রলোক কিছুই স্পর্শ করতে পারলেন না। প্রবাদ আছে, 'কাজির বাড়ির বাঁদিও তিন কলম লিখতে পারে।' বুঝতে পারলুম, ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের কেরানিও রাজভোগ খায়—এই দুর্ভিক্ষেও।

দুপুরের দিকে কেরানি সায়েবের সঙ্গে শহরে বেরলুম। বাচ্চার সেপাইয়ে সমস্ত শহর ভরে গিয়েছে। আর্কের পাশের বড় রাস্তায় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি—তিনি লিগেশনে যাবেন, আমি বাড়ি ফিরব—এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই এক সঙ্গে শ'খানেক রাইফেল আমাদের চারপাশে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, রাস্তার লোকজন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারে সেদিকে ছুটছে। আশ্রয়ের সন্ধানে নিশ্চয়ই, কিন্তু কে কোন দিকে যাচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য না করে। চতুর্দিকে বাচ্চার ডাকাত, তাই সবাই ছুটেছে দিশেহারা হয়ে।

বাচ্চার প্রথম আক্রমণের দিন শহরে যা দেখেছিলুম তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। সেদিনকার কাবুলী ভয় পেয়েছিল যেন বাঘের ডাক শুনে, এবারকার ত্রাস হঠাৎ বাঘের থাবার সামনে পড়ে যাবার। কেরানি সায়েব পেশাওয়ারের পাঠান। সাহসী বলে খ্যাতি আছে। তিনি পর্যন্ত আমাকে টেনে নিয়ে ছুটে চলেছেন, মুশকিল-আসানই জানেন কোন দিক দিয়ে। পাশ দিয়ে গা ঘেঁষে একটা ঘোড়া চলে গেল। নয়ানজুলিতে পড়তে পড়তে তাকিয়ে দেখি, ঘোড়-সওয়ারের পা জিনের পাদানে বেঁধে গিয়ে মাথা নিচের দিকে ঝুলছে আর ঘোড়ার প্রতি গ্যালপের সঙ্গে সঙ্গে মাথা রাস্তার শানে ঠোক্কর খাচ্ছে।

ততক্ষণে রাস্তার সুর-রিয়ালিস্টিক ছবিটার এলোপাতাড়ি দাগ আমার মনে কেমন যেন একটা আবছা আবছা অর্থ এনে দিয়েছে। কেরানি সায়েবের হাত থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে খালাস করে দাঁড়িয়ে গেলুম। ছবিটার যে জিনিস আমার অবচেতন মন ততক্ষণে লক্ষ্য করে একটা অর্থ খাড়া করেছে, সে হচ্ছে যে ডাকুরা কাউকে মারার মতলবে, কোনো 'কৎলে আম্' বা পাইকারি কচু-কাটার তালে নয়—তারা গুলি ছুঁড়ছে আকাশের দিকে। কেরানি সায়েবের দৃষ্টিও সেদিকে আকর্ষণ করলুম।

ততক্ষণে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে শুধু বাচ্চার ডাকাত দল, কেরানি সায়েব আর আমি; বাদবাকি

নয়ানজুলিতে, দোকানের বারান্দায়, না হয় কাবুল নদীর শক্ত বরফের উপর উঁচু পাড়ির গা ঘেঁষে। তিন চার মিনিট ধরে গুলি চলল—আমরা কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আবার সবাই এক একজন করে আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এল। ডাকাতের দল ততক্ষণে হা হা করে হাসতে আরম্ভ করেছে—তাদের 'শাদীয়ানা' শুনে কাবুলের লোক এরকম ধারা ভয় পেয়ে গেল! কীসের 'শাদীয়ানা'? জানো না খবর, ইনায়েত উল্লা তখ্‌ৎ ছেড়ে দিয়ে হাওয়াই জাহাজে করে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন। তাই বাচ্চা—থুড়ি—বাদশা হবীব উল্লা খান হুকুম দিয়েছেন রাইফেল চালিয়ে 'শাদীয়ানা' বা বিজয়োল্লাস প্রকাশ করার জন্য।

জিন্দাবাদ 'বাদশা' 'গাজী' হবীব উল্লা খান।

বর্বরদেশে নতুন দলপতি উদুখলে বসলে নরবলি করার প্রথা আছে। আফগানিস্থানে এরকম প্রথা থাকার কথা নয়, তবু অনিচ্ছায় গোটা পাঁচেক নরবলি হয়ে গেল; 'শাদীয়ানা'র হাজার হাজার বুলেট আকাশ থেকে নামার সময় যাদের মাথায় পড়ল তাদের কেউ কেউ মরল—পুরু মীর আসলমী পাগড়ি মাথায় প্যাঁচানো ছিল না বলে।

পাগড়ি নিয়ে হেলাফেলা করতে নেই। গরিব আফগানের মামুলি পাগড়ি নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে গিয়ে আমান উল্লার রাজমুকুট খসে পড়ল।

উনচল্লিশ

ডাকাত সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় পরল।

মোল্লারা আশীর্বাদ করলেন।

পরদিন ফরমান বেরোল। তার মূল বক্তব্য, আমান উল্লা কাফির, কারণ সে ছেলেদের এলজেব্রা শেখাত, ভূগোল পড়াত, বলত পৃথিবী গোল। বিংশ শতাব্দীতে এ রকম ফরমান বেরতে পারে সে কথা কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বাচ্চার মত ডাকাত যখন তখ্‌ৎ-নশীন হতে পারে তখন এরকম ফরমান আর অবিশ্বাস করার কোনো উপায় থাকে না। শুধু তাই নয়, ফরমানের তলায় মোল্লাদের সই ছাড়াও দেখতে পেলুম সই রয়েছে আমান উল্লার মন্ত্রীদের।

মির আসলম বললেন, 'পেটের উপর সঙ্গীন ঠেকিয়ে সইগুলো আদায় করা হয়েছে। না হলে, বলো কোন সুস্থ লোক বাচ্চাকে বাদশাহি দেবার ফরমানে নাম সই করতে পারে?' রাগের চোটে তাঁর চোখ-মুখ তখন লাল হয়ে গিয়েছে, দাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গর্জন করে বললেন, 'ওয়াজিব্‌-উল্‌-কৎল্‌—প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যাকে দেখা মাত্র কতল করা সে কিনা বাদশা হল!'

আমি বললুম, 'আপনি যা বলছেন তা খুবই ঠিক; কিন্তু আশা করি এসব কথা যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন না।'

মির আসলম বললেন, 'শোনো, সৈয়দ মুজতবা আলী, আমান উল্লার নিন্দা যখন আমি করেছি তখন সকলের সামনেই করেছি, বাচ্চায়ে সকাওয়ের বিরুদ্ধে যা বলবার তাও আমি প্রকাশ্যে বলি। তুমি কি ভাবছ কাবুল শহরের মোল্লারা আমাকে চেনে না, ফরমানের তলায় আমার সই লাগাতে পারলে ওরা খুশি হয় না? কিন্তু ওরা ভালো করেই জানে যে, আমার বাঁ হাত কেটে ফেললেও আমার ডান হাত সই করবে না। ওরা ভালো করেই জানে যে, আমি ফতোয়া দিয়ে বসে আছি, 'বাচ্চায়ে সকাও ওয়াজিব্‌-উল্‌-কৎল্‌—অবশ্য বধ্য'।'

মির আসলম চলে যাওয়ার পর মৌলানা বললেন, 'যতদিন আফগানিস্থানে মির আসলমের মত একটি লোকও বেঁচে থাকবেন ততদিন এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম 'হক কথা, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের ভাবনা এই বেলা একটু ভেবে নিলে ভালো হয় না?'

দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম, কখনো মুখ ফুটে কখনো যার যার আপন মনে। বিষয় ঃ বাচ্চা তার ফরমানে আমান উল্লা যে কাফির সে কথা সপ্রমাণ করে বলেছেন, 'যেসব দেশি-বিদেশি মাস্টার প্রফেসর আমান উল্লাকে এ সব কর্মে সাহায্য করতো, তাদের ডিসমিস করা হল; স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল।'

শেষটায় মৌলানা বললেন, 'অত ভেবে কদ্দু হবে। আমরা ছাড়া আরো লোকও তো ডিসমিস হয়েছে—দেখাই যাক না তারা কী করে।' মৌলানার বিশ্বাস দশটা গাধা মিললে একটা ঘোড়া হয়।

কিন্তু এসব নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা।

আবু হোসেন নাটক যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা হয়ত ভাবছেন যে, কাবুলে তখন জোর রগড়। কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনায় তখন আমির ফকির সকলেরই রসকষ কাবুল নদীর জলের মত জমে গিয়ে বরফ হয়ে গিয়েছে। বাচ্চাও শহরবাসীকে সন্দেহের দোদুলদোলায় বেশিক্ষণ দোলালো না। হুকুম হলো আমান উল্লার মন্ত্রীদের ধরে নিয়ে এসো, আর তাদের বাড়ি লুঠ করো।

সে লুঠ কিস্তিতে কিস্তিতে হল। বাচ্চার খাস-পেয়ারারা প্রথম খবর পেয়েছিল বলে তারা প্রথম কিস্তিতে টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি দামী টুকিটাকি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় কিস্তিতে সাধারণ ডাকাতরা আসবাবপত্র, কার্পেট, বাসন-কোসন, জামা-কাপড় বেছে বেছে নিয়ে গেল, তৃতীয় কিস্তিতে আর সব ঝড়ের মুখে উড়ে গেল—শেষটায় রাস্তার লোক কাঠের দরজা-জানালা পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে গিয়ে শীত ভাঙালো।

মন্ত্রীদের খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড় করিয়ে হরেক রকম সম্ভব অসম্ভব অত্যাচার করা হল গুপ্তধন বের করবার আশায়। তার বর্ণনা শুনে কাবুলের লোক পর্যন্ত শিউরে উঠেছিল—মৌলানা আর আমি শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলুম।

তারপর আমান উল্লার ইয়ারবক্সি, ফৌজের অফিসারদের পালা। বন্ধ দোর-জানালা ভেদ করে গভীর রাত্রে চিৎকার আসত—ডাকু পড়েছে। সে আবার সরকারি ডাকু—তার সঙ্গে লড়াই করার উপায় নেই, তার হাত থেকে পালাবার পথ নেই।

কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেল—রাস্তার উপর শীতে জমে যাওয়া রক্ত, উলঙ্গ মড়া, রাত্রে ভীত নরনারীর আর্ত চিৎকার সবই সহ্য হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, অভ্যাস হল না শুধু শুকনো রুটি, নুন আর বিনা দুধ চিনিতে চা খাওয়ার। মায়ের কথা মনে পড়ল, তিনি একদিন বলেছিলেন, চা-বাগানের কুলিরা যে প্রচুর পরিমাণে বিনা দুধ চিনিতে লিকার খায় সে পানের তৃপ্তির জন্য নয়, ক্ষুধা মারবার জন্য। দেখলুম অতি সত্যি কথা, কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কাবুলে ম্যালেরিয়া নেই, থাকলে তারপর চা-বাগানের কুলির যা হয়, আমারও তাই হত এবং তার পরমা গতি কোথায়, বাঙালীকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। মৌলানাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'না খেতে পেয়ে, বুলেট খেয়ে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে, এই তিন মার্গের ভিতর মরার পক্ষে কোনটা প্রশস্ততম বলো তো?'

মৌলানা কবিতা আওড়ালেন আরেক মৌলানার—কবি সাদীর—

চুন আহঙ্গে রফ্‌তন্ কুনদ্ জানে পাক্,
চি বর তখ্‌ৎ মুরদন চি বর্ সরে খাক্?
পরমায়ু যবে প্রস্তুত হয় মহাপ্রস্থান তরে
একই মৃত্যু—সিংহাসনেতে অথবা ধূলির পরে।

বাচ্চার ফরমান জারির দিন সাতেক পরে ভারতীয়, ফরাসী, জর্মন শিক্ষক-অধ্যাপকেরা এক ঘরোয়া সভায় স্থির করলেন, স্যার ফ্রান্সিসকে তাঁদের দুরবস্থা নিবেদন করে হাওয়াই জাহাজে করে ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য বন্দোবস্ত ভিক্ষা করবেন।

অধ্যাপকেরা বললেন, কাবুল থেকে বেরবার রাস্তা চতুর্দিকে বন্ধ—স্যার ফ্রান্সিস বললেন,

'হ্যাঁ'; অধ্যাপকেরা নিবেদন করলেন, কাবুলে কোনো ব্যাঙ্ক নেই বলে তাঁদের জমানো যা কিছু সম্বল তা পেশাওয়ারে এবং সে পয়সা আনাবার কোনো উপায় নেই—স্যার ফ্রান্সিস বললেন, 'হুঁ'; অধ্যাপকেরা কাতর অনুনয়ে জানালেন, স্ত্রী-পরিবার নিয়ে তাঁরা অনাহারে আছেন—সায়েব বললেন, 'অ'; অধ্যাপকেরা মরীয়া হয়ে বললেন, এখানে থাকলে তিলে তিলে মৃত্যু—সায়েব বললেন 'আ'।

একদিকে ফুল্লরার বারমাসী, অন্যদিকে সায়েবের অ-আ করে বর্ণমালা পাঠ। ক্লাশ সিক্সের ছেলে আর প্রথম ভাগের খোকাবাবু যেন একই ঘরে পড়াশুনা করছেন।

বর্ণমালা যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন সায়েব বললেন, 'এখানকার ব্রিটিশ লিগেশন ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র। ভারতবাসীদের সুখ-সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ব্রিটিশ লিগেশনের কর্তব্য নয়। আমি যদি কিছু করতে পারি তবে সেটা 'ফেবার' হিসেবে করব, আপনাদের কোনো 'রাইট' নেই।'

যাত্রাগানে বিস্তর দুর্যোধন দেখেছি। সায়েবের চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, না, কিছু কিছু গরমিল রয়েছে। দুর্যোধন 'ফেবার', 'রাইট' কোনো হিসেবেই পাঁচখানা গাঁ দিতে রাজি হননি, ইনি 'ফেবারেবল কনসিডারেশন' করতে রাজি আছেন।

এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ হলে হয়ত তিনি বগল বাজিয়ে সুখবর দেবার জন্য পাণ্ডব-শিবিরে ছুটে যেতেন, কিন্তু আমার মনে পড়ল যুধিষ্ঠিরের কথা। একটি মিথ্যে কথা বলবার জন্য তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। ভাবলুম, এদিকে দুর্যোধন, ওদিকে বাচ্চায়ে সকাও, এর মাঝখানে যদি সাহস সঞ্চয় করে একটিবারের মত এই জীবনে সত্যি কথা বলে ফেলতে পারি তবে অন্তত একবারের মত স্বর্গ দর্শন লাভ হলে হতেও পারে। বললুম, 'হাওয়াই জাহাজগুলো ভারতীয় পয়সায় কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়, পেশাওয়ারের বিমানঘাঁটি ভারতের নিজস্ব—এ অবস্থায় আমাদের কি কোনো হক নেই?' ব্রিটিশ লিগেশন যে ভারতীয় অর্থে তৈরি, সায়েব যে ভারতীয় নিমক খান, সেকথা আর ভদ্রতা করে বললুম না।

সায়েব ভয়ঙ্কর চটে গেলেন, অধ্যাপকরাও ভয় পেয়ে গেলেন। বুঝলুম, জীবনমরণের ব্যাপার—ভারতীয়েরা কোনো গতিকে দেশে ফিরে যেতে পেলে রক্ষা পান—'মেহেরবানী' 'হক' নিয়ে নাহোক তর্ক করে কোনো লাভ নেই। বললুম, 'আমি যা বলেছি, সে আমার ব্যক্তিগত মত। আমি নিজে কোনো 'ফেবার' চাইনে, কিন্তু আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেন আর পাঁচজনের স্বার্থে আঘাত না করে।'

এর পর কথা কাটাকাটি করে আর কোনো লাভ নেই। আমার যা বক্তব্য সায়েব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন, আর সায়েবের বক্তব্য ভারতবাসীর কাছে কিছু নতুন নয়—'ফেবার' শব্দ দরখাস্তে যিনি যত ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখতে পারেন, তাঁকেই আমরা ভারতবর্ষে গেল একশ' বছর ধরে ইংরিজিতে সুপণ্ডিত বলে সেলাম করে আসছি।

সেই সন্ধ্যায়ই খবর পেলুম, যেসব ভারতবাসী স্বদেশে ফিরে যেতে চান, তাঁদের একটা ফিরিস্তি তৈরি করা হয়েছে। সায়েব স্বহস্তে আমার নামে ঢ্যারা কেটে দিয়েছেন।

আবদুর রহমান এখন শুধু আগুনের তদারকি করে। বাদাম নেই যে খোসা ছাড়াবে, কালি নেই যে জুতো পালিশ করবে। না খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে, দেখলে দুঃখ হয়।

মৌলানা শুতে গিয়েছেন। আবদুর রহমান ঘরে ঢুকল। আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, সব দিকে তো ডাকাতের পাল রাস্তা বন্ধ করে আছে। পানশিরে যাবার উপায় আছে?'

আবদুর রহমান আমার দু'হাত আপন হাতে তুলে নিয়ে শুধু চুমো খায়, আর চোখে চেপে ধরে, বলে, 'সেই ভালো হুজুর, সেই ভালো। চলুন আমার দেশে। এরকম শুকনো রুটি আর নুন খেলে

দু'দিন বাদে আপনি আর বিছানা থেকে উঠতে পারবেন না। তার চেয়ে ভালো খাওয়ার জিনিস আমাদেরই বাড়িতে আছে। কিছু না হোক, বাদাম, কিসমিস, পেস্তা, আঞ্জীর, মোলায়েম পনীর, আর হুজুর, আমার নিজের তিনটে দুম্বা আছে। আর একটি মাস, জোর দেড় মাস, তারপর বরফ গলতে আরম্ভ করলেই আপনাকে নদী থেকে মাছ ধরে এনে খাওয়াব। ভেজে, সেঁকে, পুড়িয়ে যে-রকম আপনার ভালো লাগে। আপনি আমাকে মাছের কত গল্প বলেছেন, আমি আপনাকে খাইয়ে দেখাব। আরামে শোবেন, ঘুমবেন, জানলা দিয়ে দেখবেন—'

আবদুর রহমানকে বাধা দিতে কষ্টবোধ হল। বেচারি অনেকদিন পরে আবার প্রাণ খুলে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, পানশিরের পুরানো স্বপ্নে নতুন রঙ লাগিয়ে আমার চোখে চটক লাগাবার চেষ্টা করছে, তার মাঝখানে ভোরের কাকের কর্কশ কা-কা করে তার সুখ-স্বপ্ন কেটে ফেলতে অত্যন্ত বাধো বাধো ঠেকল। বললুম, 'না আবদুর রহমান আমি যাব না, আমি বলছি, তুমি চলে যাও। জানো তো আমার চাকরি গেছে, তোমাকে মাইনে দেবার টাকা আমার নেই। ডাল-চাল ফুরিয়ে গিয়ে গমে এসে ঠেকেছে, তাও তো আর বেশি দিন চলবে না। তুমি বাড়ি চলে যাও, খুদা যদি ফের সুদিন করেন, তবে আবার দেখা হবে।'

ব্যাপারটা বুঝতে আবদুর রহমানের একটু সময় লাগল। যখন বুঝল, তখন চুপ করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমারও মন খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু করিই বা কী? আবদুর রহমানের সঙ্গে বহু সন্ধ্যা, বহু যামিনী কাটিয়ে বুঝতে পেরেছি যে, সে যদি নিজের থেকে কোনো জিনিস না বোঝে, তবে আমার যুক্তিতর্ক তার মনের কোনো কোণে ঠাঁই পায় না। আমার ব্যবস্থাটা যে তার আদপেই পছন্দ হয়নি সেটা বুঝতে পারলুম, কিন্তু আমি আশা করেছিলুম, সে আপত্তি জানাবে, আমি তাহলে তর্কাতর্কি করে তাকে খানিকটা শায়েস্তা করে নিয়ে আসব। দেখলুম তা নয়, সরল লোক আর সোজা সুপারি গাছে মিল রয়েছে; একবার পা হড়কালে আপত্তি-অজুহাতের শাখা-প্রশাখা নেই বলে সোজা ভূমিতলে অবতরণ।

খানিকক্ষণ পরে নিজের থেকেই ঘরে ফিরে এল। মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি নিজের হাতে মেপে সকালবেলা দু'মুঠো আটা দেবেন। আমার তাইতেই চলবে।'

কী করে লোকটাকে বোঝাই যে, আমার অজানা নয় সে মাসখানেক ধরে দু'মুঠো আটা দিয়েই দুবেলা চালাচ্ছে। আর খাবারের কথাই তো আসল কথা নয়—আমার প্রস্তাবে যে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছে, সেটা লাঘব করি কী করে? যুক্তিতর্ক তো বৃথা—পূর্বেই বলেছি। ভাবলুম, মৌলানাকে ডাকি। কিন্তু ডাকতে হল না। আবদুর রহমান বলল, 'যখন সব কিছু পাওয়া যেত, তখন আমি এখানে যা খেয়েছি, আমার বাবা তার শ্বশুরবাড়িতেও সেরকম খায়নি।' তারপর বেশ একটু গলা চড়িয়ে বলল, 'আর আজ কিছু জুটছে না বলে আমাকে খেদিয়ে দিতে চান? আমি কি এতই নিমকহারাম?'

অনেক কিছু বলল। কিছুটা যুক্তি, বেশির ভাগ জীবনস্মৃতি, অল্পবিস্তর ভর্ৎসনা, সবকিছু ছাপিয়ে অভিমান। কখনো বলে, 'দেরেশি করিয়ে দেননি', কখনো বলে 'লেপ করিয়ে দেননি'—'কাবুলের ক'টা সর্দারের ওরকম লেপ আছে, আমি গেলে বাড়ি পাহারা দেবে কে, আমাকে তাড়িয়ে দেবার হক আপনার সম্পূর্ণ আছে—আপনার আমি কী খেদমত করতে পেরেছি?'

যেন পানশিরের বরফপাত। গাদা-গাদা, পাঁজা-পাঁজা। আমি যেন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, আর আমার উপর সে বরফ জমে উঠছে। আবদুর রহমানই আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন বলেছিল, তখন নাকি সেই বরফ-আস্তরণের ভিতর বেশ ওম বোধ হয়। আমিও আরাম বোধ করলুম।

কিন্তু না খেতে পেয়ে আবদুর রহমানের পানশিরী তাগদ মিইয়ে গিয়েছে। সাত দিন ধরে বরফ পড়ল না—মিনিট খানেক বর্ষণ করেই আবদুর রহমান থেমে গেল। আমি বললুম, 'তা তো বটেই,

তুমি চলে গেলে আমাকে বাঁচাবে কে? অতটা ভেবে দেখিনি।'

আবদুর রহমান তদ্দণ্ডেই খুশ। সরল লোককে নিয়ে এই হল মস্ত সুবিধে। তক্ষুনি হাসিমুখে আগুনের তদারকিতে বসে গেল।

তার মন থেকে যে শেষ গ্লানিটুকু কেটে গিয়েছে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলুম শুতে যাবার সময়। তোষকের তলায় লেপ গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'জানেন সায়েব, আমি যদি বাড়ি চলে যাই তবে বাবা কী করবে? প্রথমে আমার কাছ থেকে একটা বুলেটের দাম চেয়ে নেবে; তারপর আমাকে গুলি করে মারবে। কতবার আমাকে বলেছে, 'তোর মত হতভাগাকে মারবার জন্য যে গ্যাঁটের পয়সায় বুলেট কেনে সে তোর চেয়েও হতভাগা।'

আমি বললুম, 'ও, তাই বুঝি তুমি পানশির যেতে চাও না? প্রাণের ভয়ে?'

আবদুর রহমান প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। তারপর হাসল। আমারও হাসি পেল—যে আবদুর রহমান এতদিন ধরে শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে রূপ ধারণ করে বিরাজ করত, আমার আলবাল-সিঞ্চনে সে যে একদিন রসবোধকিশলয়ে মুকুলিত হয়ে সরসতরুবর হবে সে আশা করিনি।

আবদুর রহমান একখানা খোলা-চিঠি দিয়ে গেল; উপরে আমান উল্লার পলায়নের তারিখ।

'কমরত ব্ শিকনদ—

এতদিন বাদে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আগা আহমদের মাইনের পাঁচ বছরের জমানো তিন শ' টাকা আর তার ভাইয়ের রাইফেল লোপাট মেরে আফ্রিদী-মুল্লুকে চললুম। সেখানে গিয়ে পিতৃপিতামহের ব্যবসা ফাঁদব। শুনতে পাই খাইবারপাসের ইংরেজ অফিসার পাকড়ে পাকড়ে খালাসির পয়সা আদায় করার প্রাচীন ব্যবসা উপযুক্ত লোকের অভাবে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়েছে।

কিন্তু আচ্ছা ইংরিজি-জাননেওয়ালা একজন দোভাষীর আমার প্রয়োজন—আমার ইংরিজি বিদ্যে তো জান। তোমার যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে তবে পত্রপাঠ জলালাবাদের বাজারে এসে আমার অনুসন্ধান করো। মাইনে? কাবুলে এক বছরে যা কামাও, আমি এক মাসে তোমাকে তাই দেব। কাবুলের ডাকাতের চাকর হওয়ার চেয়ে আমার বেরাদর হয়ে ইমান-ইনসাফে কামানো পয়সার বখরাদার হওয়া ঢের ভালো।

আমান উল্লা নেই—তবু ফী আমানিল্লা।*

দোস্ত মুহম্মদ

পুঃ। আগা আহমদ সঙ্গে আছে। কাঁধে আমান উল্লার বিলি করা একখানা উৎকৃষ্ট মাউজার রাইফেল।'

রাজা হয়ে ভিস্তিওয়ালার ডাকাত ছেলে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় রাজপ্রাসাদে কী বঙ্গবস করল তার গল্প আস্তে আস্তে বাজারময় ছড়াতে আরম্ভ করল। আধুনিক ঔপন্যাসিকের বালিগঞ্জের কাল্পনিক ড্রইনিংরুমে পাড়াগেঁয়ে ছেলে যা করে তারই রাজসংস্করণ। নতুনত্ব কিছু নেই—তবে একটা গল্প আমার বড় ভালো লাগল। মৌলানার কপিরাইট।

আমান উল্লা লণ্ডনে পঞ্চম জর্জের সঙ্গে যে রোলস-রয়েস চড়ে কুচকাওয়াজ পালাপরবে যেতেন, রাজা জর্জ সেই বজরার মত মোটর আমান উল্লাকে বিদায়-ভেট দেন। সে গাড়ি রাক্ষসের মত তেল খেত বলে আমান উল্লা পালাবার সময় সেখানা কাবুলে ফেলে যান।

বাচ্চা রাজা হয়ে বিশেষ করে সেই মোটরই পাঠালো বাস্তগাঁয়ে বউকে নিয়ে আসবার জন্য। বউ নাকি তখন বাচ্চার বাচ্চার মাথার উকুন বাছছিল। সারা গাঁয়ের হুলুস্থূলের মাঝখানে বাচ্চার বউ নাকি

* 'আমান উল্লা' কথার অর্থ 'আল্লার আমানত' এবং 'ফী আমান ইল্লা' কথার অর্থ '(তোমাকে) আল্লার আমানতে রাখলুম'।

ড্রাইভারকে বলল, 'তোমার মনিবকে গিয়ে বলো, নিজে এসে আমাকে খচ্চরে বসিয়ে যেন নিয়ে যায়।'

দিগ্বিজয় করে বুদ্ধদেব যখন কপিলাবস্তু ফিরেছিলেন, তখন যশোধরা এমনি ধারা অভিমান করেছিলেন।

চল্লিশ

ফরাসডাঙার জরিপেড়ে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর ফুরফুরে রেশমি উড়নি পরে বসে আছি। কব্জিতে গোড়ে, গোঁফে আতর। চাকর ট্যাক্সি আনতে গিয়েছে—বায়স্কোপে যাব।

সত্যি নয়, তুলনা দিয়ে বলছি।

তখন যেমন ট্যাক্সির অপেক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোনো কাজে মন দেওয়া যায় না, আমাদের অবস্থা হল তখন তাই। তফাত শুধু এই, স্যার ফ্রান্সিসের হাতে হাওয়াই ট্যাক্সি রয়েছে—কিন্তু সাঁঝের বেলা শিখ ড্রাইভার যে রকম মদমত্ত হয়ে চক্ষু দুইডা রাঙা কইরা, এড্ডা চিক্কৈর দিয়া বলে, 'নহী জায়েঙ্গে' সায়েব তেমনি স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে বলছেন—চুলোয় যাকগে কী বলছেন।

অপেক্ষা করে করে একমাস কাটিয়ে দিয়েছি।

চা ফুরিয়ে গিয়েছে—ক্ষুধা মারবার আর কোনো দাওয়াই নেই। এখন শুধু রুটি আর নুন—নুন আর রুটি। রুটিতে প্রচুর পরিমাণ নুন দিলে শুধু রুটিতেই চলে কিন্তু ভোজনের পদ বাড়াবার জন্য আবদুর রহমান নুন রুটি আলাদা আলাদা করে পরিবেশন করত।

সপ্তাহ তিনেক হল বেনওয়া সাহেব এ্যারোপ্লেন করে হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি, তিনি শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা হলে কী হয়! পাসপোর্ট খানা তো ফরাসী দেশের—এবং তার রঙটা তো সাদা। তাই ভারতীয় বিমানে তিনি জায়গা পেলেন বিনা মেহন্নতে। আমাদের তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, কিন্তু সব ফরাসীর জন্য তো আর এ রকম দরাজদিল হতে পারব না।

যাবার আগের দিন বেনওয়া বাড়িতে এসে মৌলানা আর আমাকে গোপনে এক টিন ফরাসী তরকারি দিয়ে যান—সার্ডিন টিনের সাইজ। বহুকাল ধরে রুটি ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু পেটে পড়েনি; মৌলানাতে আমাতে সেই তরকারি গো-গ্রাসে গোস্ত-গেলার পদ্ধতিতে খেয়ে পেটের অসুখে সপ্তাহখানেক ভুগলুম। আমাদের ভোগান্তি অনেকটা গরিব চাষির ম্যালেরিয়ায় ভোগার মত হল। চাষি যে রকম ভোগার সময় বিলক্ষণ বুঝতে পারে কুইনিন ফুইনিন কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই, সাতদিন পেট ভরে খেতে পেলে দুনিয়ার কুল্লে জ্বর ঝেড়ে ফেলে উঠতে পারবে, আমরা তেমনি ঠিক জানতুম তিন দিন পেট ভরে খেতে পেলে আমাদেরও পেটের অসুখ আমান উল্লার সৈন্যবাহিনীর মত কর্পূর হয়ে উবে যাবে।

সেই অনাহার আর অসুখের দরুন মৌলানা আর আমার মেজাজ তখন এমনি তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছে যে বেড়ালটা কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে তার শব্দে লাফ দিয়ে উঠি (অথচ স্নায়ু জিনিসটা এমনি অদ্ভুত যে, বন্দুকগুলীর শব্দে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না), কথায় কথায় দু'জনাতে তর্ক লাগে, মৌলানার দিকে তাকালেই আমার মনে হয় ওরকম জংলী দাড়ি মানুষ রাখে কেন, মৌলানা আমার চেহারা সম্বন্ধে কী ভাবতেন জানিনে, তবে প্রকাশ করলে খুব সম্ভব খুনোখুনি হয়ে যেত। মৌলানা পাঞ্জাবী কিন্তু আমিও তো বাঙাল।

মৌলানা লোকটা ভারী কুতর্ক করে। আমি যা বললুম সে কথা তাবৎ দুনিয়া সৃষ্টির আদিকাল থেকে স্বীকার করে আসছে। আমি বললুম, 'সরু চালের ভাত আর ইলিশমাছ ভাজার চেয়ে উপাদেয় খাদ্য আর কিছুই হতে পারে না।' মূর্খ বলে কি না বিরিয়ানি-কুর্মা তার চেয়ে অনেক ভালো। পাঞ্জাবীদের সংকীর্ণমনা প্রাদেশিকতার আর কী উদাহরণ দিই বলুন। শান্তিনিকেতনে থেকেও লোকটা মানুষ হল না। যে নরাধম ইলিশ মাছের অপমান করে তার মুখদর্শন করা মহা পাপ, অথচ দেখুন, বাঙালীর

চরিত্র কী উদার, কী মহান—আমি মৌলানার সঙ্গে মাত্র তিন দিন কথা বন্ধ করেছিলুম।

আর শীতটা যা পড়েছিল! বায়স্কোপে জব্বর গরমের ছ'হাজার ফুটি বর্ণনা দেখা যায়, কিন্তু মারাত্মক শীতের বয়ান তার তুলনায় বহুৎ কম। কারণ বায়স্কোপ বানানো হয় প্রধানত সায়েবসুবোদের জন্য আর তেনারা শীতের তক্‌লিফ বাবদে ওয়াকিফহাল, কাজেই সে-জিনিস তাদের দেখিয়ে বক্স আপিস ভরবে কেন? আর যদি বা দেখানো হয় তবে শীতের সঙ্গে হামেশাই ঝড় বা ব্লিজার্ড জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আসলে যেমন কালবৈশাখী বিপজ্জনক হলেও তার সঙ্গে দিনের পর দিন ১১২ ডিগ্রীর অত্যাচারের তুলনা হয় না, তেমনি বরফের ঝড়ের চেয়েও মারাত্মক দিনের পর দিন ১০ ডিগ্রীর অত্যাচার।

জামা ধুয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দিলেন। জামার জল জমে বরফ হল, রোদ্দুরে সে জল শুকোনো দূরের কথা বরফ পর্যন্ত গলল না। রোদ থাকলেই টেম্পারেচার ফ্রিজিঙের উপর ওঠে না। জামাটা জমে তখন এমনি শক্ত হয়ে গিয়েছে যে, এক কোণে ধরে রাখলে সমস্ত জামাটা খাড়া হয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে এনে আগুনের কাছে ধরলে পর জামা চুবসে গিয়ে জবুথবু হয়।

বলবেন বানিয়ে বলছি, কিন্তু দেশ ভ্রমণের হলপ, দোতলা থেকে থুথু ফেললে সে থুথু মাটি পৌঁছবার পূর্বেই জমে গিয়ে পেঁজা বরফের মত হয়ে যায়। আবদুর রহমান একদিন দুটো পেঁয়াজ যোগাড় করে এনেছিল—খুদায় মালুম চুরি না ডাকাতি করে—কেটে দেখি পেঁয়াজের রস জমে গিয়ে পরতে পরতে বরফের গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।

সে শীতে জ্বালানি কাঠ ফুরোলো।

খবরটা আবদুর রহমান দিল বেলা বারোটার সময়। বাইরের কড়া রৌদ্র তখন বরফের উপর পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, আমরা কিন্তু সে-সংবাদ শুনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলুম। রোদ সত্ত্বেও টেম্পারেচার তখন ফ্রিজিঙ-পয়েন্টের বহু নিচে।

সে রাত্রে গরম বানিয়ান, ফ্লানেলের শার্ট, পুল-ওভার, কোট, ইস্তেক ওভারকোট পরে শুলুম। উপরে দু'খানা লেপ ও একখানা কার্পেট। মৌলানা তাঁর প্রিয়তম গান ধরলেন,

'দারুণ অগ্নিবানে
হৃদয় তৃষায় হানে—'

আমি সাধারণত বেসুরো পোঁ ধরি। সে-রাত্রে পারলাম না, আমার দাঁতে দাঁতে করতাল বাজছে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকে পর্দা সরিয়ে দিল। আকাশ তারায় তারায় ভরা। রবীন্দ্রনাথ উপমা দিয়ে বলেছেন,

'আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার ভাসে।'

ফরাসী কবি অন্য তুলনা দিয়েছেন, আকাশের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে তারা হয়ে গিয়েছে। আরেক নাম-না-জানা বিদেশি কবি বলেছেন, মৃতা ধরণীর কফিনের উপর সাজানো মোমবাতির গলে-যাওয়া জমে-ওঠা ফোঁটা ফোঁটা মোম তারা হয়ে গিয়েছে।

সব বাজে তুলনা, বাজে বাজে কাব্যি।

হে দিগম্বর ব্যোমকেশ, তোমার নীলাম্বরের নীলকম্বল যে লক্ষ লক্ষ তারার ফুটোয় ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে। তাই কি তুমিও আমারই মতন শীতে কাঁপছ? কাবুলে যে শ্মশান জ্বালিয়েছ তার আগুন পোয়াতে পারো না?

তিন দিন তিন রাত্তির লেপের তলা থেকে পারতপক্ষে বেরোইনি। চতুর্থ দিনে আবদুর রহমান অনুনয় করে বলল, 'ওরকম একটানা শুয়ে থাকলে শরীর ভেঙে পড়বে সায়েব, একটু চলাফেরা করুন, গা গরম হবে।'

আমাদের দেশের গরিব কেরানিকে যে রকম ডাক্তার প্রাতর্ভ্রমণ করবার উপদেশ দেয়, গরিব কেরানিরই মতন আমি চিঁ চিঁ করে বললুম, 'বড্ড ক্ষিদে পায় যে। শুয়ে থাকলে ক্ষিদে কম পায়।'

ডাকাতি করলে আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব এ কথা আবদুর রহমান জানত বলেই সে তখনো রাইফেল নিয়ে রাজভোগের সন্ধানে বেরোয়নি। আবদুর রহমান মাথা নিচু করে চুপ করে চলে গেল।

বেড়াল পারতপক্ষে বাস্তুভিটা ছাড়ে না। তিন দিন ধরে আমার বেড়াল দুটো না-পাত্তা। তার থেকে বুঝলুম, আমার প্রতিবেশীরা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালো খাওয়া দাওয়া করছে। তারা বিচক্ষণ, রাষ্ট্র বিপ্লবে ওয়াকিফহাল। গোলমালের গোড়ার দিকেই সব কিছু কিনে রেখেছিল।

শীতের দেশে নাকি হাতী বেশিদিন বাঁচে না। তবু আমান উল্লা শখ করে একটা হাতী পুষেছিলেন। কাবুলে কলাগাছ, আনারস গাছ, বনবাদাড় নেই বলে সে কালো হাতীকে পুষতে প্রায় সাদা হাতী পোষার খরচাই লাগত। কাবুলে তখন কাঠের অভাব, তাই হাতী-ঘরে আর আগুন জ্বালানো হত না। বাচ্চার ডাকাত ভাইবেরাদরের শখ চেপেছে হাতী চাপার। সেই দুর্দান্ত শীতে তারা হাতীকে বের করেছে চড়ে নগর প্রদক্ষিণ করার জন্য। তাকিয়ে দেখি হাতীর চোখের কোণ থেকে লম্বা লম্বা আইসিকল্ বা বরফের ছুঁচ ঝুলছে—হাতীর চোখের আর্দ্রতা জমে গিয়ে।

আমি জানতুম, হাতীটা ত্রিপুরা থেকে কেনা হয়েছিল। ত্রিপুরার সঙ্গে সিলেটের বিয়ে-সাদী লেন-দেন বহুকালের—সিলেটের জমিদার খুন করে ফেরারী হলে চিরকালই ত্রিপুরার পাহাড়ে টিপরাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

হাতীটার কষ্ট আমার বুকে বাজলো। তখন মনে পড়ল রেমার্কের চাষা বন্দুকগুলি অগ্রাহ্য করে ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, জখমি ঘোড়াকে গুলি করে মেরে তাকে তার যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য।

কুকুরের চোখেমুখে বেদনা সহজেই ধরা পড়ে। হাতীকে কাতর হতে কেউ কখনো দেখেনি, তাই তার বেদনাবোধ যখন প্রকাশ পায় তখন সে দৃশ্য বড় নিদারুণ।

আমান উল্লার বিস্তর মোটরগাড়ী ছিল। বাচ্চার সঙ্গীসাথীরা সেই মোটরগুলো চড়ে চড়ে তিনদিনের ভিতর সব পেট্রল শেষ করে দিল। শহরের সর্বত্র এখন দামী দামী মোটর পড়ে আছে—যেখানে যে গাড়ীর পেট্রল শেষ হয়েছে বাচ্চার ইয়াররা সেখানেই সে গাড়ি ফেলে চলে গিয়েছে। জানলার কাঁচ পর্যন্ত তুলে দিয়ে যায়নি বলে গাড়ীতে বৃষ্টি বরফ ঢুকছে, পাড়ার ছেলেপিলেরা গাড়ী নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করাতে দু'একটা নর্দমায় কাত হয়ে পড়ে আছে।

আমাদের বাড়ীর সামনে একখানা আনকোরা বীয়ুইক ঝলমল্ করছে। আবদুর রহমানের ভারী শখ গাড়ীখানা বাড়ীর ভিতর টেনে আনার। বিদ্রোহ শেষ হলে চড়বার ভরসা সে রাখে।

আমান উল্লা তো সেই কোন ফরাসী রাজার মত 'আপ্রেমওয়া ল্য দেল্যুজ' (হম্ গয়া তো জগ্ গয়া) বলে কান্দাহার পালালেন—আবদুর রহমান বলে, 'আপ্রে ল্য দেল্যুজ, অতমবিল্' (বন্যার পর পলিমাটি)।

আমাদের কাছে যেমন সব ব্যাটা গোরার মুখ একরকম মনে হয়, আবদুর রহমানের কাছে তেমনি সব মোটরের এক চেহারা। কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, 'দেল্যুজের' পর রাজবাড়ীর লোক চোরাই গাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে গাড়িখানা চিনে নিয়ে সেখানা পুরবে গ্যারাজে আর তাকে পুরবে জেলে।

অপ্‌টিমিস্ট।

কাবুলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। অনেকটা শিলঙের মত। হলে সবাই ছুটে ঘর থেকে বেরোয়।

দুপুরবেলা জোর ভূমিকম্প হল। আমি আর মৌলানা দুই খাটে শুয়ে ধুঁকছি। কেউ খাট ছেড়ে বেরলুম না।

একচল্লিশ

যেন অন্তহীন মহাকাল ভ্যাজর ভ্যাজর করার পর এক ভাষণ-বিলাসী আপন বক্তৃতা শেষ করে বললেন, 'আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় অজানাতে নষ্ট করে ফেলেছি বলে মাফ চাইছি। আমার সামনে ঘড়ি ছিল না বলে সময়ের আন্দাজ রাখতে পারিনি।' শ্রোতাদের একজন চটে গিয়ে বলল, 'কিন্তু সামনের দেয়ালে যে ক্যালেণ্ডার ছিল, তার কী? সেদিকে তাকালে না কেন?'

মৌলানা আর আমি বহুদিন হল ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকানো বন্ধ করে দিয়েছি। তবু জমে-যাওয়া হাড় ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এখনো শীতকাল।

ইতিমধ্যে ফরাসী, জর্মন প্রভৃতি বিদেশি পুরুষেরা ভারতীয় প্লেনে কাবুল ত্যাগ করেছেন— স্ত্রীলোকেরা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন। শেষটায় শুনলুম ভারতীয় পুরুষদের কেউ কেউ স্যার ফ্রান্সিসের ফেবারে স্বদেশ চলে যেতে পেরেছেন। আমার নামে তো ঢ্যারা, কাজেই মৌলানাকে বললুম তিনি যদি প্লেনে চাপবার মোকা পান তবে যেন পিছন পানে না তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরের মত সোজা পিতৃলোক চলে যান। অনুজ যদি অনুগ হবার সুবিধে না পায় তার জন্য অপেক্ষা করলে ফল পিতৃলোকে প্রত্যাগমন না হয়ে পিতৃলোকে মহাপ্রয়াণই হবে। চাণক্য বলেছেন, উৎসবে, ব্যসনে এবং রাষ্ট্রবিপ্লবে যে কাছে দাঁড়ায় সে বান্ধব। এস্থলে সে-নীতি প্রযোজ্য নয়, কারণ, চাণক্য স্বদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের কথাই ভাবছিলেন, বিদেশের চক্রব্যূহের খাঁচায় ইঁদুরের মত না খেয়ে মরবার উপদেশ দেননি।

অল্প অল্প জ্বরের অবচেতন অবস্থায় দেখি দরজা দিয়ে উর্দিপরা এক বিরাট মূর্তি ঘরে ঢুকছে। দুর্বল শরীর, মনও দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ভাবলুম, বাচ্চায়ে সকাওয়ের জল্লাদই হবে; আমার সন্ধানে এখন আর আসবে কে?

না, জর্মন রাজদূতাবাসের পিয়ন। কিন্তু আমার কাছে কেন? ওদের সঙ্গে তো আমার কোনো দহরমমহরম নেই। জর্মন রাজদূত আমাকে এই দুর্দিনে নিমন্ত্রণই বা করবেন কেন? আবার পইপই করে লিখেছেন, বড্ড জরুরী এবং পত্রপাঠ যেন আসি।

দু'মাইল বরফ ভেঙে জর্মন রাজদূতাবাস। যাই কী করে, আর গিয়ে হবেই বা কী? কোনো ক্ষতি যে হতে পারে না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত, কারণ আমি বসে আছি সিঁড়ির শেষ ধাপে, আমাকে লাথি মারলেও এর নিচে আমি নামতে পারি না।

শেষটায় মৌলানার ধাক্কাধাক্কিতে রওয়ানা হলুম। জর্মন রাজদূতাবাস যাবার পথ সুদিনে অভিসারিকাদের পক্ষে বড়ই প্রশস্ত—নির্জন এবং বনবীথিকার ঘনপল্লবে মর্মরিত। রাস্তার একপাশ দিয়ে কাবুল নদী এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে; তারই রসে সিক্ত হয়ে হেথায় কুঞ্জ, হোথায় পঞ্চ-চিনার। নিতান্ত অরসিকজনও কল্পনা করে নিতে পারে যে লুকোচুরি, রসকেলির জন্য এর চেয়ে উত্তম বন্দোবস্ত মানুষ চেষ্টা করেও করতে পারত না।

কিন্তু এ-দুর্দিনে সে-রাস্তা চোরডাকাতের বেহেশ্‌ৎ, পদাতিকের গোরস্থান।

আবদুর রহমান বেরবার সময় ছোট পিস্তলটা জোর করে ওভারকোটের পকেটে পুরে দিয়েছিল। নিতান্ত ফিচেল চোর হলে ওটা কাজে লেগে যেতেও পারে।

এসব রাস্তায় হাঁটতে হয় সগর্বে, সদম্ভে, ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে, মাথা খাড়া করে। কিন্তু আমার সে তাগদ কোথায়? তাই শিষ দিয়ে দিয়ে চললুম এমনি কায়দায় যেন আমি নিত্যিনিত্যি এ-পথ দিয়ে যাওয়া আসা করি।

পথের শেষে পাহাড়। বেশ উঁচুতে রাজদূতাবাস। সে চড়াই ভেঙে যখন শেষটায় রাজদূতের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম তখন আমি ভিজে ন্যাকড়ার মত নেতিয়ে পড়েছি। রাজদূত মুখের কাছে ব্র্যাণ্ডির গেলাস ধরলেন। এত দুঃখেও আমার হাসি পেল, মুসলমান মরার পূর্বে মদ খাওয়া ছাড়ে, আমি মরার আগে মদ ধরব নাকি? মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালুম।

জর্মনরা কাজের লোক। ভণিতা না করেই বললেন, 'বেনওয়া সায়েবের মুখে শোনা, আপনি নাকি জর্মনিতে পড়তে যাবার জন্য টাকা কামাতে এদেশে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সব টাকা নাকি এক ভারতীয় মহাজনের কাছে জমা ছিল, এবং সে নাকি বিপ্লবে মারা যাওয়ায় আপনার সব টাকা খোয়া গিয়েছে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

রাজদূত খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বিশেষ করে কেন জর্মনিতেই যেতে চেয়েছিলেন, বলুন তো?'

আমি বললুম, 'শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে কাজ করে, ও বিশ্বভারতীর বিদেশি পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে উচ্চশিক্ষার জন্য আমার পক্ষে জর্মনিই সব চেয়ে ভালো হবে।'

এ ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল, সেটা বললুম না।

রাজদূতেরা কখন খুশি, কখন বেজার হন সেটা বোঝা গেলে নাকি তাঁদের চাকরি যায়। কাজেই আমি তাঁর প্রশ্নের কারণের তাল ধরতে না পেরে, বাঁয়াতবলা কোলে নিয়ে বসে রইলুম।

বললেন, 'আপনি ভাববেন না এই কটি খবর সঠিক জানবার জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনিয়েছি। আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই, আমার দ্বারা যদি আপনার জর্মনি যাওয়ার কোনো সুবিধা হয় তবে আমি আপনাকে সে সাহায্য আনন্দের সঙ্গে করতে প্রস্তুত। আপনি বলুন, আমি কী প্রকারে আপনার সাহায্য করতে পারি?'

আমি অনেক ধন্যবাদ জানালুম। রাজদূত উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন, কিন্তু আমার চোখে কোনো পন্থাই ধরা দিচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—খোদা আছেন, গুরু আছেন—বললুম, 'জর্মন সরকার প্রতি বৎসর দু'একটি ভারতীয়কে জর্মনিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেন। তারই একটা যদি জোগাড় করে দিতে পারেন তবে—'

বাধা দিয়ে রাজদূত বললেন, 'জর্মন সরকার যদি একটি মাত্র বৃত্তি একজন বিদেশিকেও দেন তবে আপনি সেটি পাবেন, আমি কথা দিচ্ছি।'

আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'পোয়েট টেগোরের কলেজে আমি পড়েছি, তিনি খুব সম্ভব আমাকে সার্টিফিকেট দিতে রাজি হবেন।'

রাজদূত বললেন, 'তাহলে আপনি এত কষ্ট করে কাবুল এলেন কেন? টেগোরকে জর্মনিতে কে না চেনে?'

আমি বললুম, 'কিন্তু পোয়েট সবাইকে অকাতরে সার্টিফিকেট দেন। এমন কি একতেল কোম্পানীকে পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে তাদের তেল ব্যবহার করলে নাকি টাকে নতুন চুল গজায়।'

রাজদূত মৃদুহাস্য করে বললেন, 'টেগোর বড় কবি জানতুম কিন্তু এত সহৃদয় লোক সে-কথা জানতুম না।'

অন্য সময় হলে হয়ত এই খেই ধরে 'জর্মনিতে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের মালমশলা জোগাড় করে নিতুম, কিন্তু আমার দেহ তখন বাড়ী ফিরে খাটে শোবার জন্য আঁকুপাঁকু লাগিয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'এ দুর্দিনে যে আপনি নিজের থেকে আমার অনুসন্ধান করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। বৃত্তি হলে ভালো, না হলেও আমি সয়ে নিতে পারব। কিন্তু আপনার সৌজন্যের কথা কখনো ভুলতে পারব না।

রাজদূতও উঠে দাঁড়ালেন। শেকহ্যাণ্ডের সময় হাতে সহৃদয়তার চাপ দিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বৃত্তিটা পাবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

দূতাবাস থেকে বেরিয়ে বাড়ীটার দিকে আরেকবার ভালো করে তাকালুম। সমস্ত বাড়ীটা আমার

কাছে যেন মধুময় বলে মনে হল। তীর্থের উৎপত্তি কী করে হয় সে সম্বন্ধে আমি কখনও কোনো গবেষণা করিনি, আজ মনে হল, সহৃদয়তা, করুণা, মৈত্রীর সন্ধান যখন এক মানুষ অন্য মানুষের ভিতর পায় তখন তাঁকে কখনো 'মহাপুরুষ' কখনো 'অবতার' কখনো 'দেবতা' বলে ডাকে এবং তাঁর পাদপীঠকে জড় জেনেও 'পুণ্যতীর্থ' নাম দিয়ে অজরামর করে তুলতে চায়। এবং সে-বিচারের সময় মানুষ উপকারের মাত্রা দিয়ে কে 'মহাপুরুষ' কে 'দেবতা' সে-কথা যাচাই করে না, তার স্পর্শকাতর হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতার বন্যায় সব তর্ক, সব যুক্তি, সব পরিপ্রেক্ষিত, সব পরিমাণজ্ঞান ভাসিয়ে দেয়।

শুধু একটি পরিমাণজ্ঞান আমার মন থেকে তখনো ভেসে যায়নি এবং কস্মিন কালেও যাবে না— যে ভদ্রলোক আমাকে এই দুর্দিনে স্মরণ করলেন তিনি রাজদূত, স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিসও রাজদূত।

কিন্তু আর না। ভাবপ্রবণ বাঙালী একবার অনুভূতিগত বিষয়বস্তুর সন্ধান পেলে মূল বক্তব্য বেবাক ভুলে যায়।

তিতিক্ষু পাঠক, এস্থলে আমি করজোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। জর্মন রাজদূতের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কাহিনীটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং তার বয়ান ভ্রমণ-কাহিনীতে চাপানো যুক্তিযুক্ত কি না সে-বিষয়ে আমার মনে বড় দ্বিধা রয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে হিরন্ময় পাত্রে সত্যস্বরূপ রস লুক্কায়িত আছেন, তাঁর ব্যক্তি-হিরণ আপন চাকচিক্য দিয়ে আমার চোখ এমনি ধাঁধিয়ে দিয়েছে যে তাই দেখে আমি মুগ্ধ, সে পুষণ কোথায় যিনি পাত্রখানি উন্মোচন করে আমার সামনে নৈর্ব্যক্তিক, আনন্দঘন, চিরন্তন রসসত্তা তুলে ধরবেন?

বিপ্লবের একাদশী, ইংরেজ রাজদূতের বিদগ্ধ বর্বরতা, জর্মন রাজদূতের অযাচিত অনুগ্রহ অনাত্মীয় বৈরাগ্যে নিরীক্ষণ করা তো আমার কর্ম নয়।

জর্মন রাজদূতাবাস থেকে বেরিয়ে মনে পড়ল, বারো বৎসর পূর্বে আফগানিস্থান যখন পরাধীন ছিল, তখন আমির হবীব উল্লা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে এই বাড়িতে রেখে অতিথিসৎকার করেছিলেন। এই বাড়ীর পাশেই হিন্দুস্থানের সম্রাট বাবুর বাদশার কবর। সে-কবর দেখতে আমি বহুবার গিয়েছি, আজ যাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেন জানিনে, পা দু'খানা আমাকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে গেল।

খোলা আকাশের নিচে কয়েকফালি পাথর দিয়ে বানানো অত্যন্ত সাদাসিধে কবর। মোগল সরকারের নগণ্যতম মুহুরিদের কবরও হিন্দুস্থানে এর চেয়ে বেশি জৌলুশ ধরে। এ কবরের তুলনায় পুত্র হুমায়ুনের কবর তাজমহলেরও বাড়া। আর আকবর জাহাঙ্গীর যে-সব স্থপতি রেখে গিয়েছেন সে-সব তো বাবুরের স্বপ্নও ছাড়িয়ে যায়।

বাবুরের আত্মজীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা এই কবরের পাশে দাঁড়ালে যে অনুভূতি পাবেন সে অনুভূতি হুমায়ুন বা শাহজাহানের কবরের কাছে পাবেন না। বাবুর মোগল বংশের পত্তন করে গিয়েছেন এবং আরো বহু বহু বীর বহু বহু বংশের পত্তন করে গিয়েছেন, কিন্তু বাবুরের মত সুসাহিত্যিক রাজা-রাজড়াদের ভিতর তো নেই-ই সাধারণ লোকের মধ্যেও কম। এবং সাহিত্যিক হিসেবে বাবুর ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ মাটির মানুষ এবং সেই তত্ত্বটি তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় বার বার ধরা পড়ে। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয় আমি আমারই মত মাটির মানুষ, যেন এক আত্মজনের সমাধির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমাদের দেশের একজন ঐতিহাসিক সীজারের আত্মজীবনীর সঙ্গে বাবুরের আত্মজীবনীর তুলনা করতে গিয়ে প্রথমটির প্রশংসা করেছেন বেশি। তাঁর মতে বাবুরের আত্মজীবনী এ-শ্রেণীর লেখাতে দ্বিতীয় স্থান পায়। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। কিন্তু এখানে সে তর্ক জুড়ে পাঠককে আর হয়রান করতে চাইনে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু : দু'টি আত্মজীবনীই সাহিত্যসৃষ্টি, নীরস ইতিহাস নয়। এর

মধ্যে ভালো মন্দ বিচার করতে হলে ঐতিহাসিক হবার কোনো প্রয়োজন নেই। যে-কোনো রসজ্ঞ পাঠক নিজের মুখেই ঝাল খেয়ে নিতে পারবেন। তবে আপশোস শুধু এইটুকু, বাবুর তাঁর কেতাব জগতাই তুর্কিতে ও সীজার লাতিনে লিখেছেন বলে বই দু'খানি মূলে পড়া আমাদের পক্ষে সোজা নয়। সান্ত্বনা এইটুকু যে, আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকও কেতাব দু'খানা অনুবাদে পড়েছেন।

পূর্বেই বলেছি কবরটি অত্যন্ত সাদামাটা এবং এতই অলঙ্কারবর্জিত যে তার বর্ণনা দিতে পারে শুধু জবরদস্ত আলঙ্কারিকই। কারণ, বাবুর তাঁর দেহাস্থি কীভাবে রাখা হবে সে সম্বন্ধে এতই উদাসীন ছিলেন, যে নূর-ই-জাহানের মত

'গরীব গোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিও না
কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায়
বুলবুলে।'
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

—বলে কবিত্ব করেন নি, বা জাহান-আরার মত

বহুমূল্য আভরণে করিয়ো না সুসজ্জিত
কবর আমার
তৃণশ্রেষ্ঠ আভরণ দীনা আত্মা জাহান-আরা
সম্রাট কন্যার।*

—বলে পাঁচজনকে সাবধান করে দেবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তবে একথা ঠিক, তিনি তাঁর শেষ শয্যা যেমন কর্মভূমি ভারতবর্ষে গ্রহণ করতে চাননি ঠিক তেমনি জন্মভূমি ফরগনাকেও মৃত্যুকালে স্মরণ করেননি।

যীশু খ্রীস্ট বলেছেন—

'The foxes have holes and the birds of the air have nests : but the Son of man hath not where to lay his head.'

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিল
কে মোর আত্মপর?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিল
কোথায় আমার ঘর?

জীবিতাবস্থায়ই যখন মহাপুরুষের আশ্রয়স্থল নেই তখন মৃত্যুর পর তার জন্মভূমিই বা কী আর মৃত্যুস্থলই বা কী?

ইংরিজি 'সার্ভে' কথাটা গুজরাতীতে অনুবাদ করা হয় 'সিংহাবলোকন' দিয়ে। 'বাবুর' শব্দের অর্থ সিংহ। আমার মনে হল এই উঁচু পাহাড়ের উপর বাবুরের গোর দেওয়া সার্থক হয়েছে। এখান থেকে সমস্ত কাবুল উপত্যকা, পূর্বে ভারতমুখী গিরিশ্রেণী, উত্তরে ফরগনা যাবার পথে হিন্দুকুশ, সব কিছু ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সিংহাবলোকনে দেখছেন সিংহরাজ বাবুর।

নেপোলিয়নের সমাধি-আস্তরণ নির্মাণ করা হয়েছে মাটিতে গর্ত করে সমতলভূমির বেশ খানিকটা নিচে। স্থপতিকে এরকম পরিকল্পনা করার অর্থ বোঝাতে অনুরোধ করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'যে সম্রাটের জীবিতাবস্থায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে সকলকেই মাথা হেঁট করতে হত, মৃত্যুর পরও

* অনুবাদকের নাম ভুলে যাওয়ায় তাঁর কাছে লজ্জিত আছি।

তাঁর সামনে এসে সব জাতিকে যেন মাথা নিচু করে তাঁর শেষ-শয্যা দেখতে হয়।'

ফরগনার গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে যে-বাবুর সিংহাবলোকন দিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যে সিংহাবলোকনদক্ষতা বাবুরের শিরে হিন্দুস্থানের রাজমুকুট পরিয়েছিল সেই বাবুর মৃত্যুর পরও কি সিংহাবলোকন করতে চেয়েছিলেন?

জীবনমরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই কি বাবুর কাবুলের গিরিশিখরে দেহাস্থি রক্ষা করার শেষ আদেশ দিয়েছিলেন?

কিন্তু কী পরস্পর-বিরোধী প্রলাপ বকছি আমি? একবার বলছি বাবুর তাঁর শেষ-শয্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, আর তার পরক্ষণেই ভাবছি মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর বিহার-স্থলের সম্মোহন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবে কি মানুষের চিন্তা করার কল মগজে নয়, সেটা কি পেটে? না খেতে পেয়ে সে যন্ত্র স্টিয়ারিং-ভাঙা মোটরের মত চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগিয়েছে?

পিছন ফিরে শেষ বারের মত কবরের দিকে তাকাতে আমার মনের সব দ্বন্দ্বের অবসান হল। বরফের শুভ্র কম্বলে ঢাকা ফকীর বাবুর খোদাতালার সামনে সজদা (ভূমিষ্ঠ প্রণাম) নিয়ে যেন অন্তরের শেষ কামনা জানাচ্ছেন। কী সে কামনা?

ইংরেজ-ধর্ষিত ভারতের জন্য মুক্তি-মোক্ষ-নজাত কামনা করছেন।

শিবাজী উৎসবে গুরুদেব গেয়েছিলেন—

'মৃত্যু সিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমর মূরতি
সমুন্নত ভালে
যে রাজ কিরীট শোভে তার দিব্যজ্যোতি লুকাবে না
কভু কোনো কালে।
তোমারে চিনেছি আজি হে রাজন, চিনেছি চিনেছি
তুমি মহারাজ
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ।'

প্রথম সেটি আবৃত্তি করলুম; তারপর কুরান শরীফের আয়াত পড়ে, পরলোকগত আত্মার সদগতির জন্য মোনাজাত করে পাহাড় থেকে নেমে নিচে 'বাবুর-শাহ' গ্রামে এলুম।

শুনেছি মানস-সরোবরে যাবার পথে নাকি তীর্থযাত্রীরা অসহ্য কষ্ট সত্ত্বেও মরে না, মরে ফেরার পথে—শীত, বরফ, পাহাড়ের চড়াই ওৎরাই সহ্য হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। তখন নাকি তাদের সম্মুখে আর কোনো কাম্যবস্তু থাকে না বলে সব মনের জোর একদম লোপ পেয়ে যায়। ফিরে তো যেতে হবে সেই আপন বাসভূমে, দৈনন্দিন দুঃখযন্ত্রণা, আশানিরাশার একটানা জীবনস্রোতে। এ-বিরাট অভিজ্ঞতার পর সে-পতন এতই ভয়াবহ বলে মনে হয় যে তখন সামান্যতম সঙ্কটের সামনে তীর্থযাত্রী ভেঙে পড়ে আর বরফের বিছানায় সেই যে শুয়ে পড়ে তার থেকে আর কখনো ওঠে না।

আমার পা আর চলে না। কোমর ভেঙে পড়ছে। মাথা ঘুরছে।

শীতে হাত পায়ের আঙুলের ডগা জমে আসছে। কান আর নাক অনেকক্ষণ হল সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে গিয়েছে। জোরে হেঁটে যে গা গরম করব, সে শক্তি আমার শরীরে আর নেই।

নির্জন রাস্তা। হঠাৎ মোড় ঘুরতেই সামনে দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে গোটা আষ্টেক উর্দীপরা সেপাই। ভালো করে না তাকিয়েও বুঝতে পারলুম, এরা বাচ্চায়ে সকাওয়ের দলের ডাকাত— আমান উল্লার পলাতক সৈন্যদের ফেলে দেওয়া উর্দী পরে নয়া শাহিনশাহ বাদশার ভুঁইফোঁড়

ফৌজের গণ্যমান্য সদস্য হয়েছেন। পিঠে চকচকে রাইফেল ঝোলানো, কোমরে বুলেটের বেল্ট আর চোখেমুখে যে ক্রুর, লোলুপ ভাব তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন চেহারা আমি জেলের বাইরে ভিতরে কোথাও দেখিনি। জীবনের বেশির ভাগ এরা কাটিয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, হয় গোরস্থানে নয় পর্বতগুহার আধা-আলো-অন্ধকারে। পুঞ্জীভূত আশুষ্ক পুরীষস্তূপকে শূকর উল্টে-পাল্টে দিলে যে বীভৎস দুর্গন্ধ বেরোয় রাষ্ট্রবিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত এই দস্যুদল আমার সামনে সেই রূপ সেই গন্ধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

ডাকাতগুলোর গায়ে ওভারকোট নেই। সেই লোভেতেই তো তারা আমাকে খুন করতে পারে। নির্জন রাস্তায় নিরীহ পথিককে খুন করে তার সব কিছু লুটে নেওয়া তো এদের কাছে কোনো নতুন পুণ্যসঞ্চয় নয়।

আমার পালাবার শক্তি নেই, পথও নেই। তার উপরে আমি গাঁয়ের ছেলে। বাঘ দেখলে পালাই, কিন্তু বুনো শুয়োরের সামনে থেকে পালাতে কেমন যেন ঘেন্না বোধ হয়। পালাই অবশ্য দুই অবস্থাতেই।

আমার থেকে ডাকাতরা যখন প্রায় দশ গজ দূরে তখন তাদের সর্দার হঠাৎ হুকুম দিল, 'দাঁড়া!' সঙ্গে সঙ্গে আটজন লোক ডেড্ হল্ট্ করলো। দলপতি বলল, 'নিশান্ কর'। সঙ্গে সঙ্গে আটখানা রাইফেলের গোল ছ্যাঁদা আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো।

ততক্ষণে আমিও থমকে দাঁড়িয়েছি কিন্তু তারপর কী হয়েছিল আমার আর ঠিক ঠিক মনে নেই।

আমার স্মরণশক্তির ফিল্ম পরে বিস্তর ডেভালাপ করেও তার থেকে এতটুকু আঁচড় বের করতে পারিনি। আমার চৈতন্যের শাটার তখন বিলকুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মনের সুপার-ডবল-এক্সও কোনো ছবি তুলতে পারেনি।

আটখানা রাইফেলের অন্ধকোটর আমার দিকে তাকিয়ে আর আমি ঠায় দাঁড়িয়ে, এ দৃশ্যটা আমি তারপর বারকয়েক স্বপ্নেও দেখেছি, কাজেই আজ আর হলপ করে বলতে পারব না কোন ঘটনা কোন চিন্তাটা সত্যি 'বাবুর শাহ' গ্রামের কাছে বাস্তবে ঘটেছিল আর কোনটা স্বপ্নের কল্পনা মাত্র।

আবছা আবছা শুধু একটি কথা মনে পড়ছে, কিন্তু আবার বলছি হলপ করতে পারব না।

আমার ডান হাত ছিল ওভারকোটের পকেটে ও তাতে ছিল আবদুর রহমানের গুঁজে দেওয়া ছোট্ট পিস্তলটি। একবার বোধ করি লোভ হয়েছিল সেই পিস্তল বের করে অন্তত এক ব্যাটা বদমাইশকে খুন করার। মনে হয়েছিল, মরব যখন নিশ্চয়ই তখন স্বর্গে যাবার পুণ্যটাও জীবনের শেষ মুহূর্তে সঞ্চয় করে নিই।

আজ আমার আর দুঃখের সীমা নেই, কেন সেদিন গুলি করলুম না।

'পাগলা' বাদশা মুহম্মদ তুগলুক তাঁর প্রজাদের ব্যবহারে এবং প্রজারা তাঁর ব্যবহারে এতই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে তিনি যখন মারা গেলেন, তখন তুগলুকের সহচর ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী বলেছিলেন, 'মৃত্যুর ভেতর দিয়ে বাদশা তার প্রজাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, প্রজারা বাদশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল।'

সেদিন পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে যদি গুলি চালাতুম তাহলে সংসারের পাঁচজন আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন, আমিও তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতুম।

হঠাৎ শুনি অট্টহাস্য। 'তরসীদ', 'তরসীদ', সবাই চেঁচিয়ে বলছে, 'তরসীদ'—অর্থাৎ 'ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে, লোকটা ভয় পেয়েছে রে।' আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে কুটিকুটি। কেউ মোটা গলায় খক্ খক্ করে, কেউ বন্দুকটা বগলদাবায় চেপে খ্যাঁক খ্যাঁক করে, কেউ ড্রইংরুমবিহারিণীদের মত দু'হাত তুলে কলরব করে, আর দু'-একজন আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মিটমিটিয়ে।

একজন হেঁড়ে গলায় বলল, 'এই মুরগীটাকে মারার জন্য আটটা বুলেটের বাজে খরচা, ইয়া আল্লা!'

আমার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বর্ণনা দেব না, কারণ গড়পড়তা বাঙালীকে 'মুরগী' বলার হক্ এদের আছে।

'মুরগী' হই আর 'মোরগ'ই হই, আমি কসাইয়ের হাত থেকে খালাস পাওয়া মুরগীর মত পালাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু পেটের ভিতর কী রকম একটা অদ্ভুত ব্যথা আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে অতি আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করলুম।

আফগান রসিকতা হাস্যরস না রুদ্ররসের পর্যায়ে পড়ে সে বিচার আলঙ্কারিকেরা করবেন। আমার মনে হয় রসটা বীভৎসতা-প্রধান বলে 'মহামাংসের' ওজনে এটাকে 'মহারস' বলা যেতে পারে।

কিন্তু এই আমার শেষ পরীক্ষা নয়।

বাড়ী থেকে ফার্লংখানেক দূরে আরেকদল ডাকাতের সঙ্গে দেখা; কিন্তু এদের সঙ্গে নতুন ঝকমকে য়ুনিফর্ম পরা একটি ছোকরা অফিসার ছিল বলে বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলুম না। দলটা যখন কাছে এসেছে, তখন অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে যেন চেনা চেনা বলে মনে হল। আরে! এতো দু'দিন আগেও আমার ছাত্র ছিল। আর পড়াশোনায় এতই ডডনং এবং আকাটমূর্খ ছিল যে, তাকেই আমি আমার মাস্টারি জীবনে বকাঝকা করেছি সবচেয়ে বেশি।

সেই কথাটা মনে হতেই আমি আবার আটটা রাইফেলের চোঙা চোখের সামনে দেখতে পেলুম। ডাইনে গলি ছিল; বেয়াড়া ঘুড়ির মত গোত্তা খেয়ে সেদিকে টুঁ দিলুম। ছেলেটা যদি দাদ তোলার তালে থাকে, তবে অক্কা না হোক কপালে বেইজ্জতি তো নিশ্চয়ই। হে মুরশিদ, কী কুক্ষণেই না এই দুশমনের পুরীতে এসেছিলুম। হে মৌলা আলীর মেহেরবান, আমি জোড়া বকরী—।

পিছনে শুনি মিলিটারি বুটের ছুটে আসার শব্দ। তবেই হয়েছে। মুরশিদ, মৌলা সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছেন। ইংরিজি প্রবাদেরই তবে আশ্রয় নিই—ইভন দি ওয়ার্ম টার্নস। ঘুরে দাঁড়ালুম। ছেলেটা চেঁচাচ্ছে, 'মুআল্লিম সায়েব, মুআল্লিম সায়েব।' কাছে এসে আবদুর রহমানী কায়দায় সে আমার হাত দু'খানা তুলে ধরে বার বার চুমো খেল, কুশল জিজ্ঞেস করল এবং শেষটায় বেমক্কা ঘোরাঘুরির জন্য মুরুব্বির মত ঈষৎ তম্বিও করল। আমি 'হেঁ হেঁ, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, তা আর বলতে, অল্‌হমদুলিল্লা, অল্‌হমদুলিল্লা, তওবা তওবা' বলে গেলুম—কখনো তাগ-মাফিক ঠিক জায়গায়, কখনো ভয়ের ধকল কাটাতে গিয়ে উল্টোপাল্টা।

ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় আমারও সাহস বেড়ে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এ বেশ কোথায় পেলে, বৎস?'

বাবুর শাহ পাহাড়ের মত বুক উঁচু করে বৎস বলল, 'কর্নাইল শুদম্' অর্থাৎ 'আমি কর্নেল হয়ে গিয়েছি।'

ইয়া আল্লা! উনিশ বছর বয়সে রাতারাতি কর্নেল! আমাদের সুরেশ বিশ্বাসও—চেনার মধ্যে তো উনিই আমাদের নীলমণি—তো এত বড় কসরৎ দেখাতে পারেননি। আমার লোভ বেড়ে গেল। শুধালুম, জেনরাইল হবার দিল্লী কতদূর?'

গম্ভীর ভাবে বলল, 'দূর নীস্ত্।'

খুদাতালা মেহেরবান, বিপ্লবটা বড়ই পয়মন্ত।

কর্নেল্ সায়েব বুঝিয়ে বললেন, 'আমির হবীব উল্লা খান আমার পিসির দেবরের মামাশ্বশুর।'

সম্পর্কটা ঠিক কী বলেছিল, আমার মনে নেই, তবে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠতর নয়। আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করলুম। ধন্য আমার মাস্টারি, ধন্য আমার শিষ্য, ধন্য এ বিপ্লব, ধন্য এ উপবাস। আমার শিষ্য রাতারাতি কর্নেল্ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই অবস্থায়ই গেয়েছিলেন—

> 'এতদিনে জানলেম, যে কাঁদনে কাঁদলেম
>
> সে কাহার জন্য
>
> ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য!'

স্থির করলুম, ফুরসৎ পাওয়া মাত্রই 'প্রবাসী'তে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' পর্যায়ে আমার কীর্তির খবরটা পাঠাতে হবে। এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের বাঙালী দারোয়ান মারা গেলে যখন সাড়ম্বর খবর বেরতে পারে, তখন আমার এ কীর্তি উড়ে বলে কি বামুন নয়? পরের বাড়ী জ্বলছে সত্যি, তাই বলে সে আগুনে আমি সিগারেট ধরাবো না? আব্দার!

বললুম, 'তাহলে বৎস, যদি অনুমতি দাও তবে বাড়ী যাই।'

মিলিটারি কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। রাস্তায় অনেক ডাকু।' বলে অজানায় সে আপন সঙ্গীদের দিকেই তাকালো। তাই সই। দান উল্টে গিয়েছে। এখন তুমি গুরু, আমি শিষ্য।

আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার বসবার ঘরে কর্নেল দু'দণ্ড রসালাপ করলেন, আমান উল্লাকে শাপমন্যি দিলেন ও মৌলানাকে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে তালিম দিলেন।

আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় কর্নেল আবদুর রহমানের খাস কামরায় ঢুকল। কাবুলে ছাত্রেরা গুরুগৃহে ভৃত্যের সঙ্গে ধূমপান করে। কিন্তু আবদুর রহমান তো বিপদে পড়ল, বহুকাল থেকে তার তামাক বাড়ন্ত। লোকটা আবার ধাপ্পা দিতে জানে না—আমার সঙ্গে এতদিন থেকেও। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবারই বা কী? বনমালীও গুরুদেবের সঙ্গে বাস করে কবিতা লিখতে শেখেনি।

মৌলানা বললেন, 'সমস্ত সকাল কাটালুম ব্রিটিশ লিগেশন আর বাচ্চার পররাষ্ট্র-দফতরে। কান্নাকাটিও কম করিনি। দাড়িতে হাত রেখে শপথ করে বললুম, 'দু'মাস হল শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। আসছে পরশু থেকে সে রুটিও আর জুটবে না।' ব্রিটিশ লিগেশনে বললুম, 'কাবুলের পিঁজরা থেকে মুক্তি দাও।' পররাষ্ট্র দফতরে বললুম, 'দু'মুঠো অন্ন দাও'।'

আমি বললুম, 'পররাষ্ট্র দফতর আর মুদির দোকান এক প্রতিষ্ঠান নাকি? তোমার উচিত ছিল বলা ঃ

'মুরগে সইয়াদ তু অম্ ইফতাদে অম্ দর দামে ইশ্‌ক্।
ইয়া ব্ কুশ্, ইয়া দানা দেহ্, ইয়া অজ কফস্ আজাদ কুন্।'

'পাখির মতন বাঁধা পড়ে গেছি কঠিন প্রেমের ফাঁদ।
হয় মেরে ফেলো, নয় দানা দাও, নয় খোলো এই বাঁধ।'

'তুমি তো মাত্র দুটো পন্থা বাৎলালে, হয় দানা দাও, নয় খোলো বাঁধ। তৃতীয়টা বললে না কেন? নয় মেরে ফেলো। আপ্তবাক্যের বিকলাঙ্গ উদ্ধৃতি গোবধের ন্যায় মহাপাপ।'

মৌলানা বললেন, 'তাই সই। শিককাবাব করে খাবো।'

শীতে ধুঁকছি, যেন কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর। মাঝে মাঝে তন্দ্রা লাগছে। কখনো মনে হয় খাট থেকে পড়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ সটান লম্বা হয়ে যায়। কখনো চিৎকার করে উঠি, 'আবদুর রহমান, আবদুর রহমান!' কেউ আসে না। কখনো দেখি আবদুর রহমান খাটের বাজুতে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে বসে; কিন্তু কই, তাকে তো ডাকিনি। শুনি, যে দু'চারটে সামান্য মন্ত্র সে জানে তাই বিড় বিড় করে পড়ছে।

তার সঙ্গে দুঃস্বপ্ন; এ্যারোপ্লেনে বসে আছি, বাচ্চার ডাকাতদল আটটা রাইফেল বাগিয়ে ছুটে আসছে এ্যারোপ্লেন থামাবার জন্য, এঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। একসঙ্গে আটটা রাইফেলের শব্দ। ঘুম ভেঙে যায়। শুনি সত্যিকার রাইফেলের আওয়াজ আর চিৎকার। পাড়ায় ডাকু পড়েছে।

আর দেখি মা ইলিশ মাছ ভাজছেন।

মাগো।

অন্ধকার হয়ে আসছে। আবদুর রহমান সাঁঝের পিদিম দেখাচ্ছে না কেন? ওঃ, ভুলেই গিয়েছিলুম,

কেরোসিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর কী-ই বা হবে তেল দিয়ে, জীবনপ্রদীপ যখন—। চুলোয় যাক্‌গে কবিত্ব।

কিন্তু সামনে একী? প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি। তার ভিতরে আটা, রওগন, মটন, আলু, পেঁয়াজ, মুরগী আরো কত কী? তার সামনে বসে ভুঁইফোঁড় কর্নেল; মিটমিটিয়ে হাসছে। ভারী বেয়াদব। আবার আবদুর রহমানের মুখ এত পাণ্ডাশ কেন? আমার ঘুম ভাঙছে না দেখে ভয় পেয়েছে? নাঃ, এতো ঘুম নয়, স্বপ্নও নয়।

আবদুর রহমান বলল, 'হুজুর, কর্নাইল সায়েব সওগাত এনেছেন।'

একদিনে মানুষ কত উত্তেজনা সইতে পারে?

আবদুর রহমান আবার তাড়াতাড়ি বলল, 'হুজুর আমাকে দোষ দেবেন না, আমি কিছু বলিনি।'

কর্নেল বলল, 'হুজুর যে কত কষ্ট পেয়েছেন তা আপনার চেহারা থেকেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সবই খুদাতালার মরজি। এখন খুদাতালার মরজিতেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করতেন, সে কথা কি আমি ভুলে গিয়েছি?'

আমি বললুম, 'সে কী কথা! তোমাকেই তো আমি সবচেয়ে বেশি বকেছি।'

কর্নেল ভারী খুশি। 'হাঁ, হাঁ, হুজুর সেই কথাই তো হচ্ছে। আপনারও তাহলে মনে আছে। আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ না করলে সবচেয়ে বেশি বকলেন কেন?' তারপর মৌলানার দিকে তাকিয়ে খুশিতে গদ্গদ হয়ে বলল, 'জানেন সায়েব, একদিন মুআল্লিম সায়েব আমার উপর এমনি চটে গেলেন যে, আমাকে বললেন একটা বেত নিয়ে আসতে। ক্লাশের সবাই তাজ্জব হয়ে গেল। আমাদের দেশের মাস্টার বেত আনায় কাপ্তেনকে দিয়ে, না হয় দুষ্টু ছেলের দুশমনকে দিয়ে। সে তখন বেছে বেছে তেজ বেত নিয়ে আসে। আমি তখন কী করলুম জানেন? ভাবলুম, মুআল্লিম সায়েব যখন আর কাউকে কখনো চাবুক মারেননি, তখন তাঁর বউনিতে ফাঁকি দিলে আমার অমঙ্গল হবে। নিয়ে এলুম একখানা পয়লা নম্বরের বেত।' তারপর কর্নেল মৌলানার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, 'মুআল্লিম সায়েব তখন কী করলেন, জানেন? বেতখানা হাতে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেতের কাঁটাগুলো কেটে ফেলিস নি কেন?' ছেলেরা সবাই বলল, 'তাহলে লাগবে কী করে?'

মৌলানা বললেন, 'সেদিন মার খেয়েছিলে বলেই তো আজ কর্নেল হয়েছ।'

কর্নেল আপশোষ করে বলল, 'না, মুআল্লিম সায়েব মারেননি। আমি তো তৈরি ছিলুম। আমার হাতে বেত লাগে না।' বলে তার হাত দু'খানা মৌলানার সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল।

চাষার ছেলের হাত। অল্পবয়স থেকে কুহিস্থানে (কুহ = পর্বত) শক্ত জমিতে হাল ধরে ধরে দু'খানা হাতে কড়া পড়ে গিয়ে চেহারা হয়েছে মোষের কাঁধের মত। নখে চামড়ায় কোনো তফাৎ নেই, আর হাতের রেখা দেখে জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। লাঙলের ঘষায় হাতে অবশিষ্ট রয়েছে কুল্লে দেড়খানা রেখা। আয়ুরেখা তেলোর ইস্‌পার উস্‌পার। হেডলাইন নেই, আর হার্ট লাইন তেলোর মধ্যিখানে এসে আচম্বিতে 'মরুপথে হারালো ধারা।' ব্যস! এই দেড়খানা লাইন নিয়ে সে সংসার চালাচ্ছে—জুপিটার, ভিনাস, সলমনের মাউন্ট রেখা, কোনো কিচ্ছুর বালাই নেই। আর আঙুলগুলো এমনি কুষ্ঠরোগীর মত এবড়ো-থেবড়ো যে, হাতের আকার জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোনো পর্যায়েই পড়ে না। না পড়ারই কথা, কারণ, ডাকাত-গুষ্টির ছেলে কর্নেল হয়েছে সবশুদ্ধ ক'টা, আর তাদের সংস্পর্শে এসেছেন ক'জন বরাহমিহির, ক'জন কেইরো?

আবদুর রহমান ঝুড়ির সামনে মাথা নিচু করে বসে আছে।

মৌলানা কর্নেলকে ধন্যবাদ দিয়ে আবদুর রহমানকে ঝুড়ি রান্নাঘরে নিয়ে যেতে বললেন। সে ঝুড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ঘর থেকে বেরল না। আমি নিরুপায় হয়ে কর্নেলকে বললুম, 'রাত্রে এখানেই খেয়ে যাও।'

আবদুর রহমান তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে চলে গেল।

কর্নেল বলল, 'আমাকে মাফ করতে হবে হুজুর। বাদশার সঙ্গে আমার রাত্রে খানা খাওয়ার হুকুম।'

মৌলানা শুধালেন, 'বাদশা কী খান?'

কর্নেল বললেন, সেই রুটি পনির আর কিসমিস। ক্বচিৎ কখনো দু'মুঠো পোলাও। বলেন, 'যে খানা খেয়ে আমান উল্লা কাপুরুষের মত পালাল, আমি সে খানা খেয়ে কাপুরুষ হয়ে যাব না?' তারপর দুষ্টুহাসি হেসে বলল, 'আমি ওসব কথায় কান দিই না। আমান উল্লার বাবুর্চিই এখনো রাজবাড়ীতে রাঁধে। আমি তাই পেট ভরে খাই।'

কর্নেল যাবার সময় বলে গেল, আমি যেন আহারাদি সম্বন্ধে আর দুশ্চিন্তা না করি।

দশ মিনিটের ভিতর আবদুর রহমান কর্নেলের আনা কাঠ দিয়ে ঘরে আগুন জ্বেলে দিল।

আমি সে আগুনের সামনে বসে সর্বাঙ্গে, মাংসে, রক্তে, হাড়ে, মজ্জায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে যে সঞ্জীবনী বহ্নির অভিযান অনুভব করলুম, তার তুলনা বা বর্ণনা দিতে পারি এমনতরো শারীরিক অভিজ্ঞতা বা আলঙ্কারিক ক্ষমতা আমার নেই। রোদে-ফাটা জমি যে রকম সেচের জল ফাটলে ফাটলে, ছিদ্রে ছিদ্রে, কণা-কণায় শুষে নেয়, আমার শরীরের অণু-পরমাণু যেন ঠিক তেমনি আগুনের গরম শুষে নিল। আমার মনে হল, ভগীরথ যে রকম জহ্নুধারা নিয়ে সগররাজের সহস্র সন্তানের প্রাণদান করার বিজয় অভিযানে বেরিয়েছিলেন স্বয়ং ধন্বন্তরি ঠিক সেইরকম সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে বহ্নিধারা সঙ্গে নিয়ে আমার অঙ্গে প্রবেশ করলেন।

মুদ্রিত নয়নে শিহরণে শিহরণে অনুভব করলুম প্রতি ভস্মকণায় জহ্নুকণার স্পর্শ, আমার শিশির-বিদ্ধ অচেতন অণুতে অণুতে কৃশাণুর দীপ্তস্পর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভিষেক।

সমস্ত দেহমন দিয়ে বুঝলুম আর্য ঐতিহ্য, ভারতীয় সভ্যতা, সনাতনধর্মের প্রথম শব্দব্রহ্ম ঋগ্বেদের প্রথম পদে কেন 'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্' রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

এবং সেমিতি ধর্মজগতেও তো তাই। ইহুদি, খৃস্ট, ইসলাম তিন ধর্মই সম্মিলিত কণ্ঠে স্বীকার করে, একমাত্র মানুষ যিনি পরমেশ্বরের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি মুসা (মোজেস) এবং তখন পরমেশ্বর তাঁর প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রুদ্ররূপে বা 'তজল্লিতে'। মুসা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন; যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন দেখলেন তাঁর সামনের সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

গ্রিক দেবতা প্রমিথিয়ুস ও দেবরাজ জুপিটারের কলহ হয়েছিল অগ্নি নিয়ে। মানব-সভ্যতা আরম্ভ হয় প্রমিথিয়ুসের কাছ থেকে পাওয়া সেই অগ্নি দিয়ে। নলরাজ ইন্ধন প্রজ্জ্বালনে সুচতুর ছিলেন বলেই কি তিনি দেবতাদের ঈর্ষাভাজন হলেন? 'নল' শব্দের অর্থ 'চোঙা', প্রমিথিয়ুসও আগুন চুরি করেছিলেন চোঙার ভিতরে করে।

ভারতীয়-আর্য, গ্রিক-আর্য দুই গোষ্ঠী, এবং তৃতীয় গোষ্ঠী ইরানি-আর্য জরথুস্ত্রী—সকলেই অগ্নিকে সম্মান করেছেন। হয়ত এঁরা সকলেই এককালে শীতের দেশে ছিলেন এবং অগ্নির মূল্য এঁরা জানতেন, কিন্তু সেমিতি ভূমি উষ্ণপ্রধান, সেখানে অগ্নিমাহাত্ম্য কেন? তবে কি মরুভূমির মানুষ সূর্যের একচ্ছত্রাধিপত্য সম্বন্ধে এতই সচেতন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্রাধিপতির রুদ্ররূপে বা 'তজল্লিতে' অগ্নিরই আভাস পায়?

আগুনের পরশমনির ছোঁয়া লেগে শরীর ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হচ্ছে আর ওদিকে মগজে হুশ হুশ করে থিয়োরির পর থিয়োরি গড়ে উঠছে; নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি এতই গভীর শ্রদ্ধা হল যে, 'সাধু, সাধু' বলে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াতে গিয়ে হাতটা মচকে গেল। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শয়তান, ডেভিল, বিয়ালজিবাব, লুসিফার সবাই আগুনের তৈরি; তাঁরা আগুনের রাজা। নরকের আবহাওয়া আগুন দিয়ে ঠাসা, এঁদের শরীর আগুনে গড়া না হলে এঁরা সেখানে থাকবেন কী প্রকারে?

হায়, হায়, আমার বহুমূল্যবান থিয়োরিখানা শয়তানের পাল্লায় পড়ে নরকের আগুনে পুড়ে ছাই

হয়ে গেল!

কোথায় লাগে নরগিস, রজনীগন্ধাকে বাখানিয়া কবিতা লেখে কোন মূর্খ! বিরিয়ানি—কোর্মা—কাবাব—মুসল্লম থেকে যে খুশবাই বেরোয় তার কাছে সব ফুল হার তো মানেই, প্রিয়ার চিকুরসুবাসও তার কাছে নস্যি।

চোখ মেলে দেখি, আবদুর রহমান বেনকুয়েট সাজিয়েছে। মৌলানা ফপরদালালি করছেন আর আমার বেড়াল দুটো একমাস অজ্ঞাতবাস করে ফের খানাকামরায় এসে উন্নাসিক হয়ে মাইডিয়ার মাইডিয়ার আওয়াজ বের করছে।

আবদুর রহমান আমাদের পরিচয়ের পয়লা রাত্তিরে যে ডিনার ছেড়েছিল এ ডিনার সে মালেরই সিল্কে বাঁধানো, প্রিয়জনের উপহারোপযোগী, পুজোর বাজারের রাজ-সংস্করণ। জানটা তর হয়ে গেল। মৌলানা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন,

'জিন্দাবাদ গাজী আবদুর রহমান খান!'

আমি গলা এক পর্দা চড়িয়ে দোস্ত মুহম্মদী কায়দায় বললুম,

'কমরৎ ব্ শিকনদ্, খুদা তোরা কোর সাজদ্, ব্ পুন্দী, ব্ তরকী' (তোর কোমর ভেঙে দু' টুকরো হোক, খুদা তোর দু' চোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো হয়ে ফেটে যা)।

মৌলানা বজ্রাহত। গুণীলোক, এসব কটু-কাটব্যের সন্ধান তিনি পাবেন কী করে? কিন্তু বালাই দূর করবার এই জনপদপন্থা আবদুর রহমান বিলক্ষণ জানে।* অদৃশ্য সাবানে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'হাত ধুয়ে নিন সায়েব, গরম জল আছে।'

কী বললে? গরম জল! আ-হা-হা। কতদিন বাদে গরম জলের সুখস্পর্শ পাব। কোথায় লাগে তার কাছে নববর্ষণে স্তনান্ধয়া বসন্তসেনার জলাভিষেক, কোথায় লাগে তার কাছে মুগ্ধ চারুদত্তের বিহ্বল প্রশস্তি। বললুম, 'বরাদর আবদুর রহমান, এই গরম জল দিয়ে তুমি যেন তোমার ডিনারখানা সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিলে।'

আবদুর রহমানের খুশির অন্ত নেই। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আর বেশি প্রশংসা করলে শুধু বলে, 'অল্‌হম্‌দুলিল্লা।' অর্থাৎ 'খুদাতালাকে ধন্যবাদ।' যতক্ষণ এটা-ওটা গুছোচ্ছিল আমার বার বার নজর পড়ছিল তার হাত দু'খানা কী রকম শুকিয়ে গিয়েছে, আর বাসন-বর্তন নাড়াচাড়া করার সময় অল্প অল্প কাঁপছে।

মৌলানা আমাকে সাবধান করে দিলেন,প্রতি গ্রাস যেন বত্রিশবার চিবিয়ে খাই। কাজের বেলা দেখা গেল, ডাকগাড়ি থেকে নেমে গোরারা যে-রকম রিফ্রেশমেণ্টরুমে খানা খায় আমরা সেই তালেই খাচ্ছি। পেটের এক কোণ ভর্তি হতেই আমি আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললুম, 'এরকম রান্না পেলে আমি আরো কিছুদিন কাবুলে থাকতে রাজি আছি।' সে-দুর্দিনে এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কী করা যায়?

কিন্তু মৌলানা প্রোষিত-ভার্য। পেট খানিকটা ভরে যাওয়ায় তাঁর বিরহ যন্ত্রণাটা যেন মাথা খাড়া করে দাঁড়াল। বললেন, 'না'—

সনগে ওতন্ অজ্ তখতে সুলেমান বেশতর,
খারে ওতন্ অজ্ গুলে রেহান বেহতর,
ইউসুফ কি দর মিস্‌র্ পাদশাহী মীকরদ
মীগুফ্‌ৎ 'গদা বুদনে কিনান খুশতর।'

*উনবিংশ অধ্যায় পশ্য

দেশের পাথর সুলেমান শা'র
তখ্‌তের চেয়ে সেরা,
বিদেশের ফুল হার মেনে যায়
দিশী কাঁটা প্রাণকাড়া।
মিশর দেশের সিংহাসনেতে
বসিয়া ইসুফ রাজা
কহিত, 'হায়রে, এর চেয়ে ভালো
কিনানে ভিখারি সাজা।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম,

ইউসুফে গুম্ গশ্ তে বাজ্ আয়দ ব্ কনান,
গম্ ম্ খুর্।
কুলবয়ে ইহজান্ শওদ কজি গুলিস্তান,
গম্ ম্ খুর্।
দুঃখ করো না হারানো ইসুফ
কিনানে আবার আসিবে ফিরে
দলিত শুষ্ক এ মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

(কাজী নজরুল ইসলাম)

কিন্তু বয়েত-বাজী বা কবির লড়াই বেশিক্ষণ চলল না। সাঁতারের সময় পয়লা দম ফুরিয়ে যাবার খানিকক্ষণ পরে মানুষ যে রকম দুসরা দম পায়, আমরা ঠিক সেই রকম খানিকক্ষণ ক্ষান্ত দিয়ে আবার মাথায় গামছা বেঁধে খেতে লেগেছি। এদিকে দেখি সব কিছু ফুরিয়ে আসছে—প্রথম পরিবেশনে কম মেকদারে দেওয়ার তালিম আবদুর রহমান আমার কাছ থেকেই পেয়েছে—কিন্তু আর কিছু আনছে না। থাকতে না পেরে বললুম, 'আরো নিয়ে এস।'

আবদুর রহমান চুপ। আমি বললুম, 'আরো নিয়ে এস।' তখন বলে কি না সব কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। মৌলানা আর আমি তখন যেন রক্তের স্বাদ পেয়ে হন্যে হয়ে উঠেছি। আমি ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বললুম, 'তোমার উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। যাও, তোমার নিজের জন্য যা রেখেছ তাই নিয়ে এস।' আবদুর রহমান যায় না। শেষটায় বলল, সে সব কিছুই পরিবেশন করে দিয়েছে, নিজে রুটি পনির খাবে।

আমি তার কঞ্জুসি দেখে ক্ষিপ্ত প্রায়। উন্মাদ, মূর্খ, হস্তী হেন শব্দ নেই যা আমি গালাগালে ব্যবহার করিনি। মৌলানা শান্ত প্রকৃতির লোক, কড়া কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না। তিনি পর্যন্ত আপন বিরক্তি সুস্পষ্ট ফার্সী ভাষায় জানিয়ে দিলেন; আবদুর রহমান চুপ করে সব কিছু শুনল। হাসল না সত্যি, কিন্তু কই, মুখখানা একটু মলিনও হল না। আমি আরো চটে গিয়ে বললুম, 'তোমাকে চাকর রাখার ঝকমারিটা বোঝাবার এই কি মোকা? এর চেয়ে তো শুকনো রুটি আর নুনই ভালো ছিল।' কথা যতই বলছি, চটে যাচ্ছি ততই বেশি। শেষটায় বললুম, 'আমি মরে গেলে আচ্ছা করে খানা রেঁধে—আর প্রচুর পরিমাণে, বুঝলে তো?—মসজিদে নিয়ে গিয়ে আমার ফাতেহা বিলিয়ো।' অর্থাৎ আমার পিণ্ডি চটকিয়ো।

তখন মৌলানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দু'লহমা সবুর করুন, পেট আপনা থেকেই ভরে যাবে।' মৌলানা পর্যন্ত রেগে টং। পুরুষ্টু পাঁঠার মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পাদ্রী সায়েবরা গাঁয়ে ঢুকে ক্ষুধাতুর

চাষাকে এই রকম উপদেশ দেয় বটে। 'স্বর্গরাজ্য ফর্গরাজ্য' কী সব বলে। কিন্তু আবদুর রহমান খালি পেটে উপদেশটা দিয়েছে বলে মৌলানা দাড়িতে হাত রেখে অভিসম্পাত দিতে দিতে থেমে গেলেন। আমি বললুম, 'বিদ্রোহে কতলোক গুলি খেয়ে মরল তোমার জন্য—'

ততক্ষণে আবদুর রহমান বেরিয়ে গিয়েছে। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! যে আবদুর রহমানকে পাঁচ মিনিট আগে সুলেমানের তখ্‌তে বসাবার জন্য লাজারুসে সিংহাসন অর্ডার দেব দেব করছিলুম, সেই আবদুর রহমানকে তখন জাহান্নামে পাঠাবার জন্য টিকিট কাটবার বন্দোবস্ত করছি।

আবদুর রহমান নিশ্চয়ই ফলিত জ্যোতিষ জানে। দু'মিনিটের ভিতর ক্ষুধা গেল। পাঁচ মিনিট পরে পেটের ভিতর মহারানীর রাজত্ব —বিলকুল ঠাণ্ডা। কিন্তু তারপর আরম্ভ হল বিপ্লব। সে কী অসম্ভব হাঁচড়-পাঁচড় আর আইঢাই! খাটে শুয়ে পড়েছি, অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করছি আর গরমের চোটে কপাল দিয়ে ঘাম বেরচ্ছে। মৌলানারও একই অবস্থা। তিনিও প্রথম বললেন, 'বড্ড বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

প্রাণ যায় আর কী। আর বেশি খেলে দেখতে হত না। 'ও আবদুর রহমান, এদিকে আয় বাবা।'

আবদুর রহমান এসে বলল, 'আমার কাছে সুলেমানী নুন আছে, তারই খানিকটা দেব?'

এরকম গুণীর চন্নামেত্যো খেতে হয়, এর হাতের হজমি ডাঙ্গস হয়ে আমার পেটের বিপ্লব নিশ্চয়ই কাবু করে নিয়ে আসবে। বললুম, 'তাই দে, বাবা।' কিন্তু গিলতে গিয়ে দেখি, শ্রাদ্ধ-ভোজনের পর আমাদের ব্রাহ্মণের গুলি গিলতে গিয়ে যে অবস্থা হয়েছিল আমারও তাই। শুনেছি অত্যধিক সংযম করে মুনি-ঋষিরা উর্ধ্বরেতা হন, আমি অত্যধিক ভোজন করে উর্ধ্বভোজা হয়ে গিয়েছি।

নুন খেয়ে আরাম বোধ করলুম। আবদুর রহমানকে আশীর্বাদ করে বললুম, 'বাবা তুমি দারোগা হও।' ইচ্ছে করেই 'রাজা হও' বললুম না—কাবুলে রাজা হওয়ার কী সুখ সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম।

উত্তেজনার শেষ নেই। আবদুর রহমানের পিছনে ঢুকল উর্দি পরা এক মূর্তি। ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের পিয়ন। দেখেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। মৌলানাকে বললুম, 'তদারক করো তো ব্যাপারটা কী?'

একখানা চিরকুট। তার মর্ম আগামী কল্য দশটার সময় যে প্লেন ভারতবর্ষ যাবে তাতে মৌলানা ও আমার জন্য দুটি সীট আছে। আনন্দের আতিশয্যে মৌলানা সোফার উপর শুয়ে পড়লেন। আমাদের এমনই দুরবস্থা যে পিয়নকে বখশিশ দেবার কড়ি আমাদের গ্যাটে নেই।

'ফেবার' না 'রাইট' হিসেবে জায়গা পেলুম তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হল না। আবদুর রহমান ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে—চুপ করে চলে গেল। মৌলানার আনন্দ ধরে না। বিবি সম্বন্ধে তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই তিনি তাঁকে কাবুল নিয়ে এসেছিলেন বলে নতুন বউ বাড়ির আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাননি। এখন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি কী করে দিন কাটাচ্ছেন সে কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক দাড়ি পাকিয়ে ফেলেছিলেন।

আমিও কম খুশি হইনি। মা বাবা নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। বাবা আবার 'দি স্টেটসম্যান' থেকে আরম্ভ করে 'প্রিন্টেড এণ্ড পাবলিশ্‌ড্‌ বাই' পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়েন। এ্যারোপ্লেনে করে ব্রিটিশ লিগেশনের জন্য ভারতীয় খবরের কাগজ আসত। তারই একখানা মৌলানা কী করে যোগাড় করেছিলেন এবং তাতে আফগান রাষ্ট্রবিপ্লব ও কাবুলের বর্ণনা পড়ে বুঝলুম, খবরের কাগজের রিপোর্টারের কল্পনাশক্তি সত্যকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। গাছে আর মাছে বানানো গল্প, পেশাওয়ারের বোতলের পাশে বসে লেখা। এ বর্ণনাটি বাবা পড়লেই হয়েছে আর কী! আমার খবরের

আশায় ডাকঘরে থানা গাড়বেন।

মৌলানা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। মানুষ যখন ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন দেখে তখন কথা কয় কম।

ওদিকে এখনো কান্না থামেনি। পাশের বাড়ির দরজা খুললে এখনো মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ আসে। আবদুর রহমান বলেছে, কর্নেলের বুড়ী মা কিছুতেই শান্ত হতে পারছেন না। ঐ তাঁর একমাত্র ছেলে ছিলেন।

মায়ে মায়ে তফাত নেই। বীরের মা যে রকম ডুকরে কাঁদছে ঠিক সেই রকমই শুনেছি দেশে, চাষা মরলে।

ঘুমিয়ে পডব পড়ব এমন সময় দেখি খাটের বাজুতে হাত রেখে নীচে বসে আবদুর রহমান। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী বাচ্চা?'

আবদুর রহমান বলল, 'আমাকে সঙ্গে করে আপনার দেশে নিয়ে চলুন।'

'পাগল নাকি? তুই কোথায় বিদেশে যাবি? তোর বাপ, মা, বউ?' কোনো কথা শোনে না, কোনো যুক্তি মানে না। 'এ্যারোপ্লেনে তোকে নেবে কেন? আর তারা রাজি হলেও বাচ্চার কড়া হুকুম রয়েছে কোনো আফগান যেন দেশত্যাগ না করে। তোকে নিলে বাচ্চা ইংরেজের গলা কেটে ফেলবে না? ওরে পাগল, আজ কাবুলের অনেক লোক রাজি আছে প্লেনে একটা সীটের জন্য লক্ষ টাকা দিতে।'

নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বলে, আমি রাজি হলে সে সকলের হাতে পায়ে ধরে এক কোণে একটু জায়গা করে নেবে।

কী মুশকিল! বললুম, 'তুই মৌলানাকে ডাক। তিনি তোকে সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন।' আবদুর রহমান যায় না। শেষটায় বলল, 'উনি আমার কে?'

তারপর ফের অনুনয়বিনয় করে। তবে কি তার খেদমতে বজ্ঞ বেশি ক্রটি-গলদ, না আমার বাপ মা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে চটে যাবেন? আমার বিয়ের 'শাদীয়ানাতে' বন্দুক ছুঁড়বে কে?

আবদুর রহমান পানশির আর বরফ এই দুই বস্তু ছাড়া আর কোনো জিনিস গুছিয়ে বলতে পারে না। তার উপর সে আমার কাছ থেকে কোনো দিন কোনো জিনিস, কোনো অনুগ্রহ চায়নি। আজ চাইতে গিয়ে সে যেসব অনুনয়বিনয়, কাকুতিমিনতি করল সেগুলো গুছিয়ে বললে তো ঠিকঠিক বলা হবে না। ওদিকে তার এক একটা কথা, এক একটা অভিমান আমার মনের উপর এমনি দাগ কেটে যাচ্ছিল যে, আমিও আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আর বলবই বা কী ছাই! সমস্ত জিনিসটা এমনি অসম্ভব, এমনি অবিশ্বাস্য যে, তার বিরুদ্ধে আমি যুক্তি চালাবো কোথায়? ভূতকে কি পিস্তলের গুলী দিয়ে মারা যায়?

আমি দুঃখে বেদনায় ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেলে আবদুর রহমান ভাবে সে বুঝি আমাকে শায়েস্তা করে এনেছে। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে আরও আবোল তাবোল বকে। কথার খেই হারিয়ে ফেলে এক কথা পঞ্চাশ বার বলে। আমার মা বাপকে এমনি খেদমত করবে যে, তাঁরা তাকে গ্রহণ না করে থাকতে পারবেন না। আমি যদি তখন বলতুম যে, আমার মা গরিব কাবলিওয়ালাকেও দোর থেকে ফেরান না, তা হলে আর রক্ষে ছিল না।

আমারই বরাত। কী কুক্ষণে তাকে একদিন গুরুদেবের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটা ফার্সীতে তর্জমা করে শুনিয়েছিলুম, সে আজ সেই গল্প থেকে নজির তুলতে আরম্ভ করল। মিনি যখন অচেনা কাবুলিওয়ালাকে ভালবাসতে পারল, তখন আমার ভাইপো ভাইঝিরাই তাকে ভালবাসবে না কেন?

'সব হবে, কিন্তু তুমি যাবে কী করে?'

'সে আমি দেখে নেব।'

ছোট্ট শিশু মায়ের কাছে যে রকম অসম্ভব জিনিস চায়, কোনো কথা শুনতে চায় না, কোনো

ওজর আপত্তিতে কান দেয় না।

এত দীর্ঘকাল ধরে আবদুর রহমান আমার সঙ্গে কখনো কথা কাটাকাটি করেনি। আমি শেষটায় নিরুপায় হয়ে বললুম, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কী রকম কষ্ট হচ্ছে তুমি জানো, তুমি সেটা আর বাড়িয়ো না। তোমাকে আমার শেষ আদেশ, তুমি এখানে থাকবে এবং যে মুহূর্তে পানশির যাবার সুযোগ পাবে, সেই মুহূর্তেই বাড়ি চলে যাবে।'

আবদুর রহমান চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কি হুজুর আর কাবুল ফিরে আসবেন না?'

আমি কী উত্তর দিয়েছিলুম, সে কথা দয়া করে আর শুধোবেন না। '

বিয়াল্লিশ

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল, আবদুর রহমান। সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ঘরে ঢুকল। রুটি, মমলেট, পনির, চা। অন্যদিন খাবার দিয়ে চলে যেত, আজ সামনে দাঁড়িয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল। কী মুশকিল!

মৌলানা এসে বললেন, 'চিরকুটে লেখা আছে, মাথাপিছু দশ পাউন্ড লগেজ নিয়ে যেতে দেবে। কী রাখি, কী নিয়ে যাই?'

আমি বললুম, 'যা রেখে যাবে তা কোনোদিন ফিরে পাবে না। আমি আবদুর রহমানকে বলেছি পানশির চলে যেতে। বাড়ি পাহারা দেবার জন্য কেউ থাকবে না, কাজেই সবকিছু লুট হবে।'

'কারো বাড়িতে সব কিছু সমঝিয়ে দিয়ে গেলে হয় না?'

আমি বললুম, 'এ পরিস্থিতিটা একদিন হতে পারে জেনে আমি ভিতরে ভিতরে খবর নিয়েছিলুম। শুনলুম, যখন চতুর্দিকে লুট-তরাজের ভয়, তখন কাউকে মালের জিম্মাদারি নিতে অনুরোধ করা এদেশের রেওয়াজ নয়। কারণ কেউ যদি জিম্মাদারি নিতে রাজিও হয়, তখন তার বাড়িতে ডবল মালের আশায় লুটের ডবল সম্ভাবনা। মালপত্র যখন সদর রাস্তা দিয়ে যাবে, তখন ডাকাতেরা বেশ করে চিনে নেবে মালগুলো কোন বাড়িতে গিয়ে উঠল।'

বলে তো দিলুম মৌলানাকে সব কিছু প্রাঞ্জল ভাষায়, কিন্তু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন চারিদিকে তাকালুম, তখন মনে যে প্রশ্ন উঠল তার কোনো উত্তর নেই। নিয়ে যাব কী, আর রেখে যাব কী?

ঐ তো আমার দু'ভল্যুম রাশান অভিধান। এরা এসেছে মস্কো থেকে ট্রেনে করে তাশকন্দ, সেখান থেকে মোটরে করে আমুদরিয়া, তারপর খেয়া পেরিয়ে, খচ্চরের পিঠে চেপে সমস্ত উত্তর আফগানিস্তান পিছনে ফেলে, হিন্দুকুশের চড়াই-ওতরাই ভেঙে এসে পৌঁচেছে কাবুল। ওজন পাউন্ড ছয়েক হবে।

আমি সাহিত্য সৃষ্টি করি না, কাজেই পাণ্ডুলিপির বালাই নেই—মৌলানার থেকে সেদিক দিয়ে আমার কপাল ভালো—কিন্তু শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের ক্লাশে বলাকা, গোরা, শেলি, কীটস সম্বন্ধে যে গাদা গাদা নোট নিয়েছিলুম এবং মূর্খের মত এখানে নিয়ে এসেছিলুম, বরফ বর্ষণের দীর্ঘ অবসরে সেগুলোকে যদি কোনো কাজে লাগানো যায়, সেই ভরসায়, তার কী হবে? ওজন তো কিছু কম নয়।

আর সব অভিধান, ব্যাকরণ, মিনুদির দেওয়া 'পূরবী', বিনোদের দেওয়া ছবি, বন্ধু-বান্ধবের ফটোগ্রাফ, আর এক বন্ধুর জন্য কাবুলে কেনা দু'খানা বোখারা কার্পেট? ওজন তিন লাশ।

কাপড়চোপড়? দেরেশি-পাগল কাবুলের লৌকিকতা রক্ষার জন্য স্মোকিঙ, টেল, মর্নিংস্যুট (কাবুলের সরকারি ভাষায় 'বঁ জুর দেরেশি')—এগুলোর জন্য আমার সিকি পয়সার দরদ নেই, কিন্তু যদি জর্মনি যাবার সুযোগ ঘটে, তবে আবার নতুন করে বানাবার পয়সা পাব কোথায়?

ভুলেই গিয়েছিলুম। এক জোড়া চীনা 'ভাজ'। পাতিনেবুর মত রঙ আর চোখ বন্ধ করে হাত বুলোলে মনে হয় যেন পাতিনেবুরই গায়ে হাত বুলোচ্ছি, একটু জোরে চাপ দিলে বুঝি নখ ভিতরে ঢুকে যাবে।

কত ছোটোখাটো টুকিটাকি। পৃথিবীর আর কারো কাছে এদের কোনো দাম নেই, কিন্তু আমার কাছে এদের প্রত্যেকটি আলাদীনের প্রদীপ।

সোক্রাতেসকে একদিন তাঁর শিষ্যের পাল শহরের সবচেয়ে সেরা দোকান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। সে দোকানে দুনিয়ার যত সব দামী দামী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস, অদ্ভুত অদ্ভুত বিলাস-সম্ভার, মিশর বাবিলনের কলা-নিদর্শন, পাপিরসের বাণ্ডিল, আলকেমির সরঞ্জাম সব কিছুই ছিল। সোক্রাতেসের চোখের পলক পড়ে না। এটা দেখছেন, সেটা নাড়ছেন আর চোখ দুটো ছানাবড়ার সাইজ পেরিয়ে শেষটায় সসারের আকার ধারণ করেছে। শিষ্যেরা মহাখুশি—গুরু যে এত কৃচ্ছ্র-সাধন আর ত্যাগের উপদেশ কপচান সে শুধু কোনো সত্যিকার ভালো জিনিস দেখেননি বলে—এইবার দেখা যাক, গুরু কী বলেন। স্বয়ং প্লাতো গুরুর বিহ্বল ভাব দেখে অস্বস্তি অনুভব করছেন।

দেখা শেষ হলে সোক্রাতেস করুণকণ্ঠে বললেন, 'হায়, হায়, দুনিয়া কত চিত্রবিচিত্র জিনিসে ভর্তি যার একটারও আমার প্রয়োজন নেই।'

আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, সোক্রাতেসে-আমাতে মাত্র একটি সামান্য তফাত—এ ঘরের, প্রত্যেকটি জিনিসেরই আমার প্রয়োজন। ব্যস—ঐ একটি মাত্র পার্থক্য। ডার্বি জিতেছে ৫৩৭৮৬ নম্বরের টিকিট। আমি কিনেছিলুম ৫৩৭৮৫ নম্বরের টিকিট। তফাতটা এমন কী হল?

মুসলমানের ছেলে, নিমতলা যাব না, যাবো একদিন গোবরা—অবশ্য যদি এই কাবুলি-গর্দিশ কাটিয়ে উঠতে পারি। সেদিন কিছু সঙ্গে নিয়ে যাব না, সেকথাও জানি; কিন্তু তারই জন্য কি আজ সব কিছু কাবুলে ফেলে দেশে যেতে হবে? মস্কো করলে সব জিনিসই রপ্ত হয়, এই কি খুদাতালার মতলব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুষ্টিয়ার লালন ফকির বলেছেন—

'মরার আগে ম'লে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়,
জানগে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয়।'

আবার আরো কে একজন, দাদূ না কী, তিনিও তো বলেছেন—

'দাদূ, মেরা বৈরী মৈঁ মুওয়া মুঝে ন
মারে কোই।'

('হে দাদূ, আমার বৈরী 'আমি' মরে গিয়েছে, আমাকে কেউ মারতে পারে না।')

কী মুশকিল! সব গুণীরই এক রা। শেয়ালকে কেন বৃথা দোষ দেওয়া? কবীরও তো বলেছেন,

'তজ অভিমানা সীখো জ্ঞানা
সতগুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈঁ কবীর কোই বিরল হংসো
জীবত হী জো মরতা হৈ।'

('অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, জীবনে মৃত্যুকে লাভ করেছেন সে রকম হংস—সাধক বিরল')

কিন্তু কবীরের বচনে বাঁচাওতা রয়ে গিয়েছে। গোবরার গোরস্থানে যাবার পূর্বেই মৃতের ন্যায় সবকিছুর মায়া কাটাতে পারেন এমন পরমহংস যখন 'বিরল' তখন সে কস্ত করার দায় তো আমার

উপর নয়।

ডোম শেষ পর্যন্ত কোন বাঁশ বেছে নিয়েছিল আমাদের প্রবাদে তার হদিস মেলে না। বিবেচনা করি, সেটা নিতান্ত কাঁচা এবং গিঁটে ভর্তি—না হলে প্রবাদটার কোনো মানে হয় না। এ ডোম তাই শেষ পর্যন্ত কী দিয়ে দশ পাউন্ডের পুঁটুলি বেঁধেছিল, সেকথা ফাঁস করে দিয়ে আপন আহাম্মুখির শেষ প্রমাণ আপনাদের হাতে তুলে দেব না।

কিন্তু সেটা পুরোনো ধুতিতে বাঁধা বেনের পুঁটুলিই ছিল—'লগেজ' বা সুটকেসের ভিতরে গোছানো মাল অন্য জিনিস—কারণ দশ পাউন্ড মালের জন্য পাঁচ পাউন্ডী সুটকেস ব্যবহার করলে মালের পাঁচ পাউন্ড গিয়ে রইবে হাতে সুটকেসটা। সুকুমার রায়ের কাক যে রকম হিসেব করত 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেন্সিল।'

অবশ্য জামা-কাপড় পরে নিলুম একগাদা—একপ্রস্থ না। কর্তারাও উপদেশ পাঠিয়েছিলেন যে, প্রচুর পরিমাণে গরম জামা-কাপড় না পরা থাকলে উপরে গিয়ে শীতে কষ্ট পাব এবং মৌলানার বউয়ের পা খড় দিয়ে কী রকম পেঁচিয়ে বিলিতি সিরকার বোতল বানানো হয়েছিল, আবদুর রহমানের সেই বর্ণনাও মনে ছিল।

মৌলানা তাঁর এক পাঞ্জাবী বন্ধুর সঙ্গে আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন।

আবদুর রহমান বসবার ঘরে প্রাণভরে আগুন জ্বালিয়েছে। আমি একটা চেয়ারে বসে। আবদুর রহমান আমার পায়ের কাছে।

আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, তোমার উপর অনেকবার খামকা রাগ করেছি, মাফ করে দিয়ো।'

আবদুর রহমান আমার দু'হাত তুলে নিয়ে আপন চোখের উপর চেপে ধরল। ভেজা।

আমি বললুম, 'ছিঃ আবদুর রহমান, এ কী করছ? আর শোনো, যা রইল সব কিছু তোমার।'

আমি জানি আমার পাঠক মাত্রই অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন, কিন্তু তবু আমি জোর করে বলব, আবদুর রহমান আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যে, তার চোখে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম লেখা রয়েছে—যেনাহম্ নামৃতাস্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্যাম্?

রাস্তা দিয়ে চলেছি। পিছনে পুঁটুলি-হাতে আবদুর রহমান।

দু-একবার তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলুম। দেখলুম সে চুপ করে থাকাটাই পছন্দ করছে।

প্রথমেই ডানদিকে পড়ল রুশ রাজদূতাবাস। দেমিদফ পরিবারকে কখনো ভুলব না। বলশফের আত্মাকে নমস্কার জানালুম।

তারপর কাবুল নদী পেরিয়ে লব-ই-দরিয়া হয়ে আর্কের দিকে চললুম। বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ—তবু দূর থেকেই দেখতে পেলুম পাঞ্জাবীর দোকান খোলা। দোকানদার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলুম, 'দেশে যাবেন না?' মাথা নাড়িয়ে নীরবে জানালো, 'না'। তারপর বিদায়ের সালাম জানিয়ে মাথা নিচু করে দোকানের ভিতরে চলে গেল। আমি জানতুম, কারবার ফেলে এদের কাবুল ছাড়ার উপায় নেই, সব কিছু তৎক্ষণাৎ লুট হয়ে যাবে। অথচ এর চিত্ত এমনি বিকল হয়ে গিয়েছে যে, শেষ মুহূর্তে আমার সঙ্গে দুটি কথা বলবার মত মনের জোর এর আর নেই।

বিশ কদম পরে বাঁ দিকে দোস্ত মুহম্মদের বাসা। অবস্থা দেখে বুঝতে বেগ পেতে হল না যে, বাসা লুট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁর কণামাত্র শোক হওয়ার কথা নয়। এ বাবদে তিনি সোক্রাতেসের ন্যায়— সোক্রাতেস যেমন তত্ত্বচিন্তায় বুঁদ হয়ে অন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন অনুভব করতেন না, দোস্ত মুহম্মদ ঠিক তেমনি রসের সন্ধানে, অদ্ভুতের খোঁজে, গ্রোটেস্কের (উদ্ভটের) পিছনে এমনি লেগে থাকতেন যে, অন্য কোনো বস্তুর অভাব তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে পারত না। পতঞ্জলিও

ঠিক এই কথাই বলেছেন; চিত্তবৃত্তিনিরোধের পন্থা বাৎলাতে গিয়ে তিনি ঈশ্বর, এবং বীতরাগ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু সর্বশেষে বলেছেন, 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা', 'যা খুশি তাই দিয়ে চিত্তচাঞ্চল্য ঠেকাবে।' অর্থাৎ ধ্যানটাই মুখ্য, ধ্যানের বিষয়বস্তু গৌণ। দোস্ত মুহম্মদের সাধনা রসের সাধনা।

আরো খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে মেয়েদের ইস্কুল। বাচ্চার আক্রমণের কয়েকদিন পূর্বে এখানে কর্নেলের বউ তাঁর স্বামীর কথা ভেবে ডুকরে কেঁদেছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা কে জানে। আমার পাশের বাড়ীর কর্নেলের মায়ের কান্না, ইস্কুলের কর্নেল-বউয়ের কান্না, আরো কত কান্না মিশে গিয়ে অহরহ খুদাতালার তখ্‌তের দিকে চলেছে। কিন্তু কেন? কবি বলেছেন,

For men must work
And women must weep

অর্থাৎ কোনো তর্ক নেই, যুক্তি নেই, ন্যায় অন্যায় নেই, মেয়েদের কর্ম হচ্ছে পুরুষের আকাট মূর্খতার জন্য চোখের জল ফেলে খেসারতি দেওয়া। কিন্তু আশ্চর্য, এ বেদনাটা প্রকাশও করে আসছে পুরুষই, কবিরূপে। শুনেছি পাঁচ হাজার বৎসরের পুরোনো বাবিলনের প্রস্তরগাত্রে কবিতা পাওয়া গিয়েছে—কবি মা-জননীদের চোখের জলের উল্লেখ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ইস্কুলের পরেই একখানা ছোটো বসতবাড়ি। আমান উল্লার বোনের বিয়ের সময় লক্ষ্ণৌ থেকে যেসব গানেওয়ালী নাচনেওয়ালীদের আনানো হয়েছিল তারা উঠেছিল এই বাড়িতে। তাদের তত্ত্বতালাশ করার জন্য আমরা কয়েকজন ভারতীয় তাদের কাছে গিয়েছিলুম। আমাদের সঙ্গে কথা কইতে পেয়ে সেই অনাত্মীয় নির্বাসনে তারা কী খুশিটাই না হয়েছিল! জানত, কাবুলে পান পাওয়া যায় না—আর পান না হলে মজলিস জমবে কী করে, ঠুংরি হয়ে যাবে ভজন—তাই তারা সঙ্গে এনেছিল বাস বোঝাই পান। আমাদের সেই পান দিয়েছিল অকৃপণ হস্তে, দরাজ দিলে। লক্ষ্ণৌয়ের পান, কাশীর জর্দা, সোঁদ্ধ-ছাঁকা খয়ের, তিনে মিলে আমার মুখের জড়তা এমনি কেটে দিয়েছিল যে, আমি তখন উর্দু ছেড়েছিলুম একদম লখ্‌নওয়ী কায়দায়— বিস্তর, 'মেহেরবানি', 'গরিব-পরওরি', 'বন্দা-নওয়াজি'র প্র-পঞ্চ-ফোঁড়ন দিয়ে।

কাবুলের নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নেই। ইরানের ঐতিহ্যও কাবুল স্বীকার করে না। কাবুলে যে দেড় জন কলাবৎ আছেন তাঁরা গান শিখেছেন যুক্তপ্রদেশে। বাঈজিদের মজলিসে তাই সম দেনেওয়ালার অভাব হতে পারে এই ভয়ে গানের মজলিসে উপস্থিত থাকার জন্য ভারতীয়দের সাড়ম্বর নিমন্ত্রণ ও সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছিল। আমরা সামনে বসে বিস্তর মাথা নেড়েছিলুম আর ঘন ঘন 'শাবাশ, শাবাশ' চিৎকারে মজলিস গরম করে তুলেছিলুম।

বাড়ি ফিরে আহারাদির পর যখন শেষ পানটা পকেট থেকে বের করে খেয়ে জানলা দিয়ে পিক্‌ ফেললুম তখন আবদুর রহমান ভয়ে ভিরমি যায় আর কী। কাবুলে পানের পিক্‌ অজানা, কিন্তু যক্ষ্মা অজানা বস্তু নয়।

তারপরই শিক্ষামন্ত্রীর দফতর। একসেলেন্সি ফয়েজ মুহম্মদ খানকে দোস্ত মুহম্মদ দু'চোখে দেখতে পারতেন না। আমার কিন্তু মন্দ লাগতো না। অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং বড়ই নিরীহ প্রকৃতির লোক। আর পাঁচজনের তুলনায় তিনি লেখাপড়া কিছু কম জানতেন না, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী হতে হলে যতটা দরকার ততটা হয়ত তাঁর ঠিক ছিল না। বাচ্চা রাজা হয়ে আর তাবৎ মন্ত্রীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে গুপ্তধন বের করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীকে নাকি, 'তুই যা, তুই তো কখনো ঘুষ খাসনি' বলে নিষ্কৃতি দিয়েছিল। অথচ শিক্ষাবিভাগে টু পাইস্‌ কামাবার যে উপায় ছিল না, তা নয়। কাবুলে নাকি ঢেউ গোনার কাজ পেলেও—অবশ্য সে কাজ সরকারি হওয়া চাই—দু'পয়সা

মারা যায়।

লোকটিকে আমার ভালো লাগতো নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে। এই বেলা সেটা বলে ফেলি, হাওয়াই জাহাজ কারো জন্য দাঁড়ায় না, উড়তে পারলেই বাঁচে।

চাকরিতে উন্নতি করে মানুষ হয় বুদ্ধির জোরে, নয় ভগবানের কৃপায়। বুদ্ধিমানকে ভগবানও যদি সাহায্য করেন তবে বোকাদের আর পৃথিবীতে বাঁচতে হত না। আমার প্রতি ভগবান সদয় ছিলেন বলেই বোধ করি শিক্ষামন্ত্রী প্রথম দিন থেকেই আমার দিকে নেকনজরে তাকিয়েছিলেন। তারপর এক বৎসর যেতে না যেতে অহেতুক এক-ধাক্কায় মাইনে একশ' টাকা বাড়িয়ে সর্ব ভারতীয় শিক্ষকদের উপর চড়িয়ে দিলেন।

পাঞ্জাবী শিক্ষকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ডেপুটেশন নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সৈয়দ মুজতবা আলীর ডিগ্রি বিশ্বভারতীর, এবং বিশ্বভারতী রেকগনাইজড্ য়ুনিভার্সিটি নয়।'

খাঁটি কথা। সদাশয় ভারতীয় সরকারের নেকনজরে আমার ডিগ্রি এখন ব্রাত্য। আপনারা কেউ আমাকে চাকরি দিলে বিপদগ্রস্ত হবেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলেছিলেন—আমি বয়ানটা শুনেছি অন্য লোকের কাছ থেকে—সেকথা তাঁর অজানা নয়।

পাঞ্জাবীদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, 'আপনাদের সনদ-সার্টিফিকেটে রয়েছে পাঞ্জাব গভর্নরের দস্তখত। আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্থানেও গভর্নরের অভাব নেই। কিন্তু আগা মুজতবা আলীর কাগজে দস্তখত রয়েছে মশহুর শাইর রবীন্দ্রনাথের। তিনি পৃথিবীর সামনে সমস্ত প্রাচ্যদেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন (চশ্‌ম্ রওশন্ করদে অন্দ্)।'

ভদ্রলোকের ভারি শখ ছিল গুরুদেবকে কাবুলে নিমন্ত্রণ করার। তাঁর শুধু ভয় ছিল যে, দুশ' মাইলের মোটর ঝাঁকুনি খেয়ে কবি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে বাধা পড়ে, তবে তাতে করে ক্ষতি হবে সমস্ত পৃথিবীর। কাবুল কবিকে দেখতে চায়, কিন্তু দুর্ঘটনার নিমিত্তের ভাগী হতে যাবে কেন? আমি সাহস দিয়ে বলতুম, 'কবি ছ'ফুট তিন ইঞ্চি উঁচু, তাঁর দেহ সুগঠিত এবং হাড়ও মজবুত।'

শেষটায় তিনি আল্লা বলে ঝুলে পড়েছিলেন কিন্তু আমান উল্লা বিলেত যাওয়ায় সে গ্রীষ্মে কবিকে আর নিমন্ত্রণ করা গেল না। শীতে বাচ্চা এসে উপস্থিত।

যাক্‌গে এসব কথা।

বাঁদিকে মুইন-উস্-সুলতানের বাড়ি, খানিকটে এগিয়ে গিয়ে তাঁর টেনিস কোর্ট। আজ মুইন-উস্-সুলতানের ভাগ্যের হাতে টেনিস বল। কান্দাহার, কাবুল তাঁকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

এই তো মকতব-ই-হবীবিয়া। বাচ্চা আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় মকতবটা দখল করে টেবিল চেয়ার, বই ম্যাপ পুড়িয়ে ফেলেছিল। এ শিক্ষায়তন আবার কখন খুলবে কে জানে? এখানেই আমি পড়িয়েছি। শীতে পুকুর জমে গেলে ছেলেদের সঙ্গে তার উপর স্কেটিং করেছি। গাছতলায় বসে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আঙুর কিনে খেয়েছি। মির আসলমের কাছ থেকে কত তত্ত্বকথা শুনেছি।

রাহুকবলিত কাবুল ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। মকতব-ই-হবীবিয়ার বন্ধদ্বার যেন সমস্ত আফগানিস্থানের প্রতীক। শিক্ষাদীক্ষা, শান্তিশৃঙ্খলা, সভ্যতাসংস্কৃতি বর্জন করে আফগানিস্থান তার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে।

শহর ছাড়িয়ে মাঠে নামলুম। হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি আর বেশি দূর নয়। পিছন ফিরে আর একবার কাবুলের দিকে তাকালুম। এই নিরস নিরানন্দ বিপদসঙ্কুল পুরী ত্যাগ করতে কোনো সুস্থ মানুষের মনে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, কিন্তু বোধহয় এই সব কারণেই যে কয়টি লোকের সঙ্গে আমার

হৃদ্যতা জন্মেছিল তাঁদের প্রত্যেককেই অসাধারণ আত্মজন বলে মনে হতে লাগল। এঁদের প্রত্যেকেই আমার হৃদয় এতটা দখল করে বসে আছেন যে, এঁদের সকলকে একসঙ্গে ত্যাগ করতে গিয়ে মনে হল আমার সত্তাকে যেন কেউ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। ফরাসীতে বলে 'পার্তির, সে তুজুর তাঁ প্য ম্যুরীর'—প্রত্যেক বিদায় গ্রহণে রয়েছে খণ্ড মৃত্যু।

হাওয়াই জাহাজ এল। আমাদের বুঁচকিগুলো সাড়ম্বর ওজন করা হল। কারো পোঁটলা দশ পাউন্ডের বেশি হয়ে যাওয়ায় তাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। অনেক ভেবেচিন্তে যে কয়টি সামান্য জিনিস নিয়ে মানুষ দেশত্যাগী হচ্ছে তার থেকে ফের জিনিস কমানো যে কত কঠিন সেটা সামনে দাঁড়িয়ে না দেখলে অনুমান করা অসম্ভব। একজন তো হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

ডোম যে কানা হয় তার শেষ প্রমাণও বিমান-ঘাঁটিতে পেলুম। এইটুকু ওজনের ভিতর আবার এক গুণী একখানা আয়না এনেছেন! লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, কই তেমন কিছু খাপসুরৎ অ্যাপলো তো নন। ঘরে আগুন লাগলে মানুষ নাকি ছুটে বেরবার সময় ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়েছে, এ কথা তাহলে মিথ্যা নয়।

ওরে আবদুর রহমান, তুই এটা এনেছিস কেন? দশ পাউন্ডের পুঁটুলিটা এনেছে ঠিক কিন্তু বাঁ হাতে আমার টেনিস র‍্যাকেটখানা কেন? আবদুর রহমান কী একটা বিড়বিড় করল। বুঝলুম, সে ঐ র‍্যাকেটখানাকেই আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছিল, তার কারণ ও জিনিসটা আমি তাকে কখনো ছুঁতে দিতুম না। আবদুর রহমান আমাদের দেশের ড্রাইভারদের মত। তার বিশ্বাস স্ক্রু মাত্রই এমনভাবে টাইট করতে হয় যে, সেটা যেন আর কখনো খোলা না যায়। 'অপটিমাম' শব্দটা আমি আবদুর রহমানকে বোঝাতে না পেরে শেষটায় কড়া হুকুম দিয়েছিলুম, র‍্যাকেটটা প্রেসে বাঁধা দূরে থাক, সে যেন ওটার ছায়াও না মাড়ায়।

আবদুর রহমান তাই ভেবেছে, সায়েব নিশ্চয়ই এটা সঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্থান যাবে।

দেখি স্যার ফ্রান্সিস। নিতান্ত সামনে, বয়সে বড়, তাই একটা ছোটাসে ছোটা নড্ করলুম। সায়েব এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'গুড মর্নিং, আই উইশ য়ু এ গুড জর্নি।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

সায়েব বললেন, 'ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। প্রয়োজন হলে, আশা করি, ভারতবর্ষে সে কথাটি আপনি বলবেন।'

আমি বললুম, 'আমি নিশ্চয়ই সব কথা বলবো।'

সায়েব ভোঁতা, না ঘড়েল ডিপ্লোমেট ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বিদায় নেবার সময় আফগানিস্থানে যে চলে যাচ্ছে সে বলে, 'ব্ আমানে খুদা'—'তোমাকে খোদার আমানতে রাখলুম'। যে যাচ্ছে না সে, 'ব্ খুদা সপূর্দমৎ'—'তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলুম।'

আবদুর রহমান আমার হাতে চুমো খেল। আমি বললুম, 'ব্ আমানে খুদা, আবদুর রহমান': আবদুর রহমান মন্ত্রোচ্চারণের মত একটানা বলে যেতে লাগল, 'ব্ খুদা সপূর্দমৎ, সায়েব, ব্ খুদা সপূর্দমৎ, সায়েব।'

হঠাৎ শুনি স্যার ফ্রান্সিস বলছেন, 'এ-দুর্দিনে যে টেনিস র‍্যাকেট সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় সে নিশ্চয়ই পাকা স্পোর্টসম্যান।'

লিগেশনের এক কর্মচারী বললেন, 'ওটা দশ পাউন্ডের বাইরে পড়েছে বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

সায়েব বললেন, 'ওটা প্লেনে তুলে দাও।'

ঐ একটা গুণ না থাকলে ইংরেজকে কাক-চিলে তুলে নিয়ে যেত।

আবদুর রহমান এবার চেঁচিয়ে বলছে, 'ব্ খুদা সপূর্দমৎ, সায়েব, ব্ খুদা সপূর্দমৎ।' প্রপেলার ভীষণ

শব্দ করছে।

আবদুর রহমানের তারস্বরে চিৎকার প্লেনের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছি। হাওয়াই জাহাজ জিনিসটাকে আবদুর রহমান বড্ড ডরায়। তাই খোদাতালার কাছে সে বার বার নিবেদন করছে যে, আমাকে সে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছে।

প্লেন চলতে আরম্ভ করেছে। শেষ শব্দ শুনতে পেলুম, 'সপুর্দমৎ'। আফগানিস্থানে আমার প্রথম পরিচয়ের আফগান আবদুর রহমান; শেষ দিনে সেই আবদুর রহমান আমায় বিদায় দিল।

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং এই শেষ বিদায়কে যদি শ্মশান বলি তবে আবদুর রহমান শ্মশানেও আমাকে কাঁধ দিল। স্বয়ং চাণক্য যে ক'টা পরীক্ষার উল্লেখ করে আপন নির্ঘণ্ট শেষ করেছেন আবদুর রহমান সব ক'টাই উত্তীর্ণ হল। তাকে বান্ধব বলব না তো কাকে বান্ধব বলব?

বন্ধু আবদুর রহমান, জগদ্বন্ধু তোমার কল্যাণ করুন।

মৌলানা বললেন, 'জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও,' বলে আপন সীটটা আমায় ছেড়ে দিলেন।

তাকিয়ে দেখি দিকদিগন্ত বিস্তৃত শুভ্র বরফ। আর এ্যারফিল্ডের মাঝখানে, আবদুর রহমানই হবে, তার পাগড়ির ন্যাজ মাথার উপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হল চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।

পরিশিষ্ট

আমান উল্লা হৃতসিংহাসন উদ্ধার না করতে পেরে আফগানিস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতালির রাজা তাঁকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দেন। মুইন-উস্-সুলতানে ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আমান উল্লার হয়ে যে সেনাপতি ইংরেজের সঙ্গে আফগান স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন, তাঁর নাম নাদির শাহ্। তিনি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে ছিলেন। পরে পেশাওয়ার এসে সেখানকার ভারতীয় বণিকদের অর্থ সাহায্যে এবং আপন শৌর্যবীর্য দ্বারা কাবুল দখল করে বাদশা হন। বাচ্চাকে সঙ্গীন দিয়ে মারা হয়—পরে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়।

এ সব আমি খবরের কাগজে পড়েছি।

দেশে এসে জানতে পেলুম, আমার আত্মীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মরহুম মৌলবি আবদুল মতিন চৌধুরীর উদ্যোগ দর্শনে ভারত সরকার স্যার ফ্রান্সিসকে আদেশ (বা অনুরোধ) করেন আমাকে দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য।

আমি কাবুল ছাড়ার কয়েক দিন পরেই ব্রিটিশ লিগেশন বহু অসহায় ভারতীয়কে কাবুলে ফেলে ভারতবর্ষে চলে আসেন।

এই 'বীরত্বের' জন্য ফ্রান্সিস অল্পদিন পরেই খেতাব ও প্রমোশন পেয়ে ইরাকে বদলি হন।

মৌলানা জিয়াউদ্দিন ভারতবর্ষে ফিরে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের কর্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন (ফার্সীতে লেখা ব্রজভাষার একখানা প্রাচীন ব্যাকরণ প্রকাশ তার অন্যতম) এবং গুরুদেবের অনেক কবিতা উত্তম ফার্সীতে অনুবাদ করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি অল্প বয়সে মারা যান। তাঁর অকালমৃত্যু উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনের শোকসভায় গুরুদেব আচার্যরূপে যা বলেন তার অনুলিপিটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্বিংশ খণ্ডে অনুলিপিটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গুরুদেব রচিত 'মৌলানা জিয়াউদ্দিন' কবিতাটি এখানে বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুসারে ছাপানোটা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম—

মৌলানা জিয়াউদ্দিন

কখনো কখনো কোনো অবসরে
নিকটে দাঁড়াতে এসে;
'এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে
'বোসো' বলিতাম হেসে।
দু-চারটে হত সামান্য কথা
ঘরের প্রশ্ন কিছু,
গভীর হৃদয় নীরবে রহিত
হাসিতামাসার পিছু।
কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড়
অকথিত কত বাণী,
চিরকাল-তরে গিয়েছ যখন
আজিকে সে-কথা জানি।
প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে
সামান্য যাওয়া আসা,
সেটুকু হারালে কতখানি যায়
খুঁজে নাহি পাই ভাষা।
তব জীবনের বহু সাধনার
সে পণ্য ভার ভরি
মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে
তোমার নবীন তরী,
যেমনি তা হোক মনে জানি তার
এতটা মূল্য নাই
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
আপন নিত্য ঠাঁই—
সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ধিক্কার প্রাণে—
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনো খানে।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।
কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্ সহায়,
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে

মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।
ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
আনন্দ মহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি
ধূলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারিপাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভ নিঃশ্বাসে।
(নবজাতক)

তামাম শুদ